কুষাণ সম্রাট

কণিষ্ক

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

আনন্দ প্রকাশন

১৩৮/৭, বি. সি. রোড (বেহালা), কলকাতা : ৭০০ ০৩৪
ফোন ঃ ২৪০৪৩৩৭৩, ৬৪৫১১৩২২, মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৯৫৪৫৮৭

Kushan Samrat Kanishka
By
Amarjyoti Mukhopadhyay
Published by Ananda Prakashan
Rs. 125/-

প্রকাশক :
কৃষ্ণা মণ্ডল

প্রথম প্রকাশ :
কলকাতা বইমেলা, ২০১০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
সুব্রত মাজি

অক্ষর বিন্যাস :
অর্ক গ্রাফিক্স
২৪বি, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ :
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টার্স
৩০, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : একশ পঁচিশ টাকা মাত্র

সুবলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

ও

নদীয়া জেলার

ধর্মদা সেবাব্রতী সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পাঠকবৃন্দকে

লেখকের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস

অজাতশত্রু

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

দেবানংপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক

মৌর্য রাত্রি

নর্তকী দেবপ্রিয়া

রত্নমালা (যন্ত্রস্থ)

প্রতাপাদিত্য (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা—

কালস্রোতে ভেসে গেছেন কত রাজা-মহারাজা-সম্রাট। তবু তাঁদের মধ্যে মাথা উঁচু করে লুব্ধক নক্ষত্রের মতোই জ্বলজ্বল করছেন ভারতবর্ষের দু'জন সম্রাট—মৌর্য অশোক ও কুষাণ কণিষ্ক! ইতিহাসের পাতায় রয়েছেন রক্তলোলুপ হুণরাজ এটিলা এবং তাঁরই সমগোত্রীয় আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস খাঁ প্রভৃতি অনেকেই। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, তলোয়ারের শক্তি এবং নৃশংসতার কাছে মানুষ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে না। মাথা সেখানেই আপনা থেকে নত হয়ে আসে যেখানে রাজা-মহারাজা-সম্রাটেরা মানবকুলের অগ্রগতির জন্য—উত্তরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

সম্রাট কণিষ্ক হয়ত সম্রাট অশোকের মতো গভীর মননের অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু বর্বর ইউ-চি তথা কুষাণ রক্ত সমৃদ্ধ এই সম্রাটের যে রূপান্তর ঘটেছিল তা বিস্ময়কর! তাঁর তরবারি বহন করা হাত বুদ্ধের প্রতি প্রণাম জানাবার জন্য জোড়বদ্ধ হয়েছিল। সম্রাট অশোকের মতোই তিনি তাঁর বিশাল স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন বুদ্ধের ধর্ম এবং বাণীকে সার্বজনীন করে তোলার গুরুদায়িত্ব। তাঁরই প্রচেষ্টায় রূপ পেয়েছে বুদ্ধের মূর্তি। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বাইরে, দেশ-দেশান্তরে ছুটে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ-শ্রমণেরা। চিন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে তাদের অশ্রুতপূর্ব বুদ্ধের ললিত বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল—যা আজও বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর অন্ত:স্থল জুড়ে বিরাজ করছে। শুধু এইটুকুই নয়। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন দু'টি শিল্পকলার—গান্ধার ও মথুরা শিল্প। তিনি বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মিমাংসা করিয়ে মহাযানী মতকে প্রতিষ্ঠিত করান। গান্ধার শিল্পীরা সৃষ্টি করেন প্রথম বুদ্ধমূর্তি!

পুরুষপুরে (অধুনা পেশোয়ার) কণিষ্ক নির্মিত সুউচ্চ স্তুপের (প্রায় সাতশ ফুট) শুধুমাত্র ভিত্তিটুকুরই অবশিষ্ট আছে। আর পাওয়া গেছে গান্ধার শিল্পীদের নির্মিত ক্ষুদ্র পেটিকাটি যার মধ্যে ছিল বুদ্ধের কিছু জাগতিক স্মৃতিচিহ্ন।

পেটিকাটির গায়ে খচিত ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র মূর্তি এবং অ্যাপেলোর আকারে প্রথম অসিদ্ধ-বুদ্ধমূর্তি! পেটিকাটি স্তুপের মধ্যে প্রোথিত করা হয়েছিল। তাঁর অনন্য কীর্তি—ভারত ও বর্হিভারত মিলিয়ে এক সাম্রাজ্য যা কিনা মোটামুটি পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদী, খোরাশান থেকে পূর্বে মথুরা, উত্তরে খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ থেকে দক্ষিণে কংকন উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত!

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন যুগে যে সমস্ত জাতি ভারতে প্রবেশ করে এই দেশের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিল তাদের ইতিহাসও ধূসরাচ্ছন্ন। পণ্ডিতেরা নিরলস পরিশ্রম করে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করে সাজিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও রয়ে গেছে বহু বিতর্কিত বিষয়। তাই এই উপন্যাস লেখার সময় আমাকে স্বীকৃত মূল তথ্যগুলিকে আশ্রয় করে যুক্তিযুক্তভাবে কল্পনাকে ব্যবহার করে কাহিনিটিকে বিধৃত করতে হয়েছে। আমার কখনই বিস্মৃত হবার সুযোগ ছিল না যে আমি ইতিহাসকার নই—এক উপন্যাসকার মাত্র! পাঠকেরা ইতিহাসের সৌরভ পছন্দ করবেন—আবিলতা নয়।

এই উপন্যাস রচনায় আমি বন্ধুবর ভাস্কর রাহা (ভাস্করদা), অনীশ দেব, অশোক রায়, ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের কাছে সাহায্য-ঋদ্ধ!

পরিশেষে আমাকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় লেখক শ্রী রাহুল দাশগুপ্ত ও দিশা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অনিন্দ্য রায়কে। তাঁরা তাঁদের শারদীয় দিশা পত্রিকায় (১৪১৬ বঙ্গাব্দ) আমার এই উপন্যাসটি প্রকাশ করে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

৪, কার্তিক, ১৪১৬
কলকাতা।

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

কুষাণ রাজধানী পুরুষপুর।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী। সময় আনুমানিক আটাত্তর খ্রিস্টাব্দ। ঊষাকাল।

পূবদিগন্তে লাল রঙা সূর্যের প্রকাশ আসন্ন। বয়ে যাওয়া কুবা নদীর জলে তারই ছোঁয়াচ। নগর তোরণের দ্বার খোলা হচ্ছে সশব্দে। মৃদু কোলাহল। তোরণ-শীর্ষে প্রহরীরা তখনও কর্তব্যরত। তবে রাত্রি জাগরণে শ্লথ, ক্লান্ত।

সাথী প্রহরীদের সঙ্গে তোরণ শীর্ষে দাঁড়িয়েছিল যুবা প্রহরী ভট্টরাই। তার কোমরে ঝোলান অসি। হাতে শার্ঙ্গধনু। বাঁ-কাঁধে শরপূর্ণ তূণ। সারারাত সে সজাগ হয়ে তাকিয়েছিল তোরণদ্বার থেকে পশ্চিমের দিকে ছুটে যাওয়া আদিগন্ত পথটির দিকে। অন্ধকারে ঢেকে তা হারিয়ে গিয়েছিল দৃষ্টির সীমানা থেকে। ভোরের আলোয় তা আবার স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। চোখ তার ব্যাথায় কাতর। পা ভারী। তবু সে অন্যান্যদের থেকে যথেষ্ট সতেজ। কোন আক্রমণকারী এলে তাকে এই পশ্চিমের পথ বেয়েই আসতে হবে। কিন্তু আক্রমণকারীর কথা এখন স্বপ্নকথা। ইউক্রেটিশ, বল্খ থেকে সৌরাষ্ট্র, কংকন—পূর্বে মথুরা—এই বিশাল সাম্রাজ্যে এখন এমন কেউ নেই যে ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিমের পথ বেয়ে পুরুষপুরে হানা দেবে। তবু লক্ষ রাখতে হয়। আক্রমণকারীরা না হোক দস্যু-তস্করেরাও তো রাতের অন্ধকারে নগরে ঢোকবার চেষ্টা করতে পারে। যাহোক, কর্তব্য-কর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার এখনও কিছুটা দেরি আছে। পরিবর্ত দল এলেই তবে মুক্তি। শয্যার আহ্বানে সাড়া দেওয়া। আহার। নিদ্রা। আবার রাতের কর্তব্য কর্মে ফিরে আসা। এই রকমই চলছে আজ দিন দশেক।

এক প্রাক্তন সৈনিকের পুত্র যে। অভাবী। একটি ভাই রয়েছে। সে কাজ করে বাণিজ্য বিভাগে। দুজনের আয়ে চলে যায় সংসার। বিবাহের কথা সে চিন্তা করতে পারে না। তা তার কাছে দূরের ব্যাপার। তাছাড়া সৈনিক জীবনে অবিবাহিত থাকাই ভাল—তার বিচারে, এখানে জীবন-মৃত্যুর নিত্য সংগ্রাম।

ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ বিদ্যায় তার আকর্ষণ। বাবার কাছে শিক্ষা নিয়েছে অস্ত্র চালাবার। এখনও নিত্য অভ্যাস বজায় রেখেছে। তার আশা, সামান্য

সৈনিক থেকে সে আরও উচ্চতরপদে উঠবে একদিন। সে জন্য চাই নিষ্ঠা। তাই সে কর্তব্য-কর্মে একনিষ্ঠ।

নীচের তোরণদ্বার খুলে গেছে। সুতরাং এখন একটু কম সজাগ থাকা যায়। তাই সব প্রহরীরা পশ্চিম থেকে মুখ ঘুরিয়ে পূবের দিকে তাকিয়েছিল। দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বড় লাল থালার মতো সূর্য মাথা তুলছে। পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গলের কালিমা কেটে গিয়ে তাদের পাতার সবুজ রঙগুলি ফিরে আসছে। রাত্রি-কর্তব্যের শেষে প্রতিদিনই তারা এই দৃশ্য দেখে। প্রতিদিনই তার নতুন বলে মনে হয়। মনে হয়, সম্রাট কণিষ্কের মহাস্তুপের মাথাটিই যেন আরও একটু উঁচু হয়ে উঠেছে। বিশাল এক উচ্চাতায় শেষ হবে এই স্তুপ। মুগ্ধকর সেই দৃশ্য। কিন্তু ভট্টরাইয়ের সেই মুগ্ধতা ক্ষণস্থায়ী হল আজ নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকারে। পেছনে একাধিক ধাবমান উটের পদশব্দ এবং এক নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ—বাঁচাও!

পলকের মধ্যে শার্ঙ্গধনুতে শর যোজনা করে পেছনে ঘুরে দাঁড়াল ভট্টরাই। এক অদ্ভুত দৃশ্য! এক সুন্দরী নারীর উটকে তাড়া করে বিভিন্ন ব্যবধানে ছুটে আসছে তিনটি সশস্ত্র উটারোহী। অনুসরণকারীরা ভুলে গেছে—এখন প্রভাত কাল। তোরণদ্বার খুলে গেছে। কী দুঃসাহস!

চকিতে দূর থেকেই চোখাচোখি হল ভট্টরাই আর যুবতীটির। তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখে মৃত্যুর আতঙ্ক। ভট্টরাই অনুসরণকারীদের সতর্ক করার জন্য চিৎকার করে উঠল, সাবধান! কিন্তু তার আগেই প্রথম অনুসরণকারীর একটি নিক্ষিপ্ত তির ছুটে এসে যুবতীটির বামবাহু বিদ্ধ করল। আর্তনাদ করে উটের পিঠে উপুড় হয়ে তোরণ লক্ষ করে সে তার উটের গতি অব্যাহতই রাখল। ভট্টরাই দেখল প্রথমজন আবার শর যোজনা করছে—দ্বিতীয়জনও। না। আর অপেক্ষা নয়। নিমেষে ভট্টরাইয়ের শার্ঙ্গধনু থেকে পরপর দুটি শর ছুটে গিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানল। তারা তাদের উটের পিঠেই লুটিয়ে পড়ল। ভট্টরাই তৃতীয় শরটির লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে দেখল, বৃথা! ব্যবধানে থাকা তৃতীয়জন তাঁর উটের মুখ ঘুরিয়ে ইতিমধ্যেই আরও ব্যবধান রচনা করেছে। শরসন্ধান করা যাবে না। তোরণ দ্বারের প্রহরীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পর মুহূর্তেই ছুটে আসা তিনটে উটকেই বল্গা ধরে দাঁড় করাল। তোরণ শীর্ষ থেকে হৈ হৈ করে ভট্টরাই আর তার সাথীরা নেমে এল।

উটের পিঠ থেকে এক এক করে তিনজনকে নামাতেই দেখা গেল পুরুষ অনুসরণকারীরা মৃত। অপূর্ব সুন্দরী নারীটির বামবাহুতে একটি তির বিদ্ধ হয়ে

রয়েছে। কিন্তু সেও নিষ্পন্দ। যুবতীটির কণ্ঠে হীরকখচিত এক দুর্মূল্য হার। অঙ্গে নানান রত্ন খচিত আভরণ যা সূর্যের নবীন আলোকে ঝলমল করছিল। তার পরিচয় জানার জন্য সকলে কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এল। তোরণ রক্ষী-প্রধান বিষ্ক এগিয়ে এসে তার শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করে হতাশ হলেন। মৃত নয়, তবে জ্ঞান নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

যারা ইতিমধ্যেই মৃত—তারা তো মৃতই। কিন্তু এই মৃত্যুমুখি যুবতীটিকে তো বাঁচাতেই হবে। নিঃসন্দেহে এ এক অভিজাত ঘরের। তার রূপ—তার অলঙ্কার এই কথাই প্রকাশ করছিল। কে জানে এখানকার কোন অভিজাত ঘরের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ রয়েছে কিনা, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে তাদেরই নানান প্রশ্নের সামনাসামনি হতে হবে—বিশেষ করে এই নারীর দেহে যখন বহুমূল্য রত্নাভরণ রয়ে গেছে।

বিষ্ক বাহুমূলে বিদ্ধ তিরটি দু-একবার সাবধানে বার করার চেষ্টা করে নিরত হলেন।—না! এ কোনও বৈদ্যেরই কর্ম। আমরা বার করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

ভট্টরাই একমনে যুবতীটিকে দেখছিল। একটু আগেই তার সঙ্গে এর চোখাচোখি হয়েছিল। তার মুখে তখন ছিল আর্তের আবেদন। সরাসরি তাকে দেখতে পেয়েই নারীটি বোধহয় ভেবেছিল—এই তার রক্ষাকর্তা। কিন্তু সে রক্ষাকর্তা কোথায় হতে পারল? এর যদি জ্ঞান না ফেরে! যদি কৃতজ্ঞতার হাসিটুকু সে উপহার দেবার সুযোগ না পায়! তবে রক্ষাকর্তা সে হবে কী করে?

ভট্টরাইয়ের দিকে চোখ পড়তেই উত্তেজিত বিষ্ক বলে উঠলেন, সকাল বেলাতেই এ কী বিপদ! এখন আহতকে কোন বৈদ্যের কাছে না নিয়ে যেতে পারলে তো এর প্রাণসংশয় নিশ্চিত! ভট্ট—তুমি আমাদের শকটটিতে অশ্ব জোত। এস আমরা একে সামনের কোনও বৈদ্যের আরোগ্যশালায় নিয়ে যাই। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে এর মৃত্যু সুনিশ্চিত! বিষ্ক একটু থেমে জনান্তিকে বললেন, দস্যুগুলোর কী দুঃসাহস! তোরণ পর্যন্ত অলঙ্কারের লোভে ছুটে এসেছে! ধরতে পারলে পালিয়ে যাওয়া তৃতীয়জনের মুণ্ডুটা নিয়ে আমি খেলা করতাম।

উত্তেজিত বিষ্ককে লক্ষ করে ভট্টরাই বলল, বৃথা চেষ্টা প্রধান। একে বাঁচানোর কোনও পথই আমি দেখছি না। কোনও বৈদ্যই একে দেখবে না নগরাধ্যক্ষের ভয়ে। নিয়ম তো জানেন, প্রথমেই তার কার্যালয়ে ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হবে —তারপর বৈদ্য! এরকম দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এই তার নিয়ম। অর্থাৎ

তার অসুবিধা ঘটিয়ে যেন কেউ বেঁচে না থাকে। সুতরাং, আসুন, আমরা কয়েকজন শকটে করে একে নগরাধ্যক্ষ জাষ্কের কার্যালয়ে নিয়ে যাই। তারপর বাঁচা-মরাটা যুবতীর ভাগ্য।

বিষ্ক বুঝলেন ভট্টরাই হতাশা থেকে এইসব কথাগুলি বলছে। তাই তিনি বললেন, ছাড় তো জাষ্কের আদেশ। রোগী তো আগে বাঁচুক। যাও। ওকে নিয়ে যাও কোনও বৈদ্যের কাছে। পরে আমি জাষ্কের সঙ্গে বুঝে নোব। পাপীটার মুখ দেখলেও আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

এক দুঃখময় স্বরে ভট্টরাই বলল, আপনি আদেশ করছেন, আমি নিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু তার আগে চট করে যুবতীটির অঙ্গের অলঙ্কারগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিন। পরে প্রশ্ন উঠতে পারে—বিশেষ করে নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক তো করবেনই।

বিষ্ক বললেন, তুমি আর সময় নষ্ট কোর না। কষ্ট করে একটু যাও তো দেখি। অলঙ্কার—ওসবও আমি বুঝে নোব। তোমাকে সবাই চেনে।

ভট্টরাই আর তার দু-তিন সাথী অচেতন যুবতীটিকে সবে শকটে তোলার আয়োজন করতেই থেমে গেল। দেখা গেল একটি অশ্বশকটে শ্বেতশুভ্র দাড়ি হাওয়ায় ভাসিয়ে কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে আচার্য চরক এগিয়ে আসছেন তোরণের দিকে। তারা সকলে জানে, আচার্য প্রায়ই নগরীর উত্তরকোলের পাহাড়ি জঙ্গলে ঔষধী লতা-গুল্ম খুঁজতে বার হন। স্বভাবতই জটলা দেখে শকট থামিয়ে আচার্য চরক নেমে এলেন—কী ব্যাপার? তারপর অচেতন যুবতীটির দিকে চোখ পড়তেই তিনি, 'আরে!' বলে যুবতীটির পাশে বসে পড়ে নাড়ি দেখতে শুরু করে দিলেন। নাড়ি দেখা হয়ে গেলে তিনি তিরবিদ্ধ স্থানটি পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন।

বিষ্ক ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী দেখলেন, আচার্য?

নাড়িতে এখনও মৃত্যুর পদধ্বনি অতি ক্ষীণ। কিন্তু চিকিৎসার যত দেরি হবে ততই সেই পদধ্বনি ধ্বনিময় হয়ে উঠবে! শল্য চিকিৎসা করে তিরটি অবিলম্বে বার করা প্রয়োজন। নচেৎ ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে যাবে। যাও, একে অবিলম্বে কোনও বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাও। আমি মৃত পুরুষ দুটিকেও একবার দেখে নিই।

ওরা মৃত, আচার্য। ভোর বেলায় ওরা যুবতীটিকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। ভট্টরাই দুটিকে হত্যা করেছে। তৃতীয় জন পালিয়েছে, এখন আপনি বলুন, কোন বৈদ্য নগরাধ্যক্ষের অনুমতি বিনা যুবতীটির চিকিৎসা করতে সাহসী

হবে? নগরাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ মেটাতে মেটাতে রোগিণীটি নিশ্চয় মারা যাবে!

চিন্তিতভাবে চরক বললেন, হুঁ! তারপরই তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ করলেন, তোমরা বনভূমিতে চলে যাও। আমি যুবতীটিকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি। বিষ্ক তোমাদের শকটে তোল আহতকে। চল। চল। আর দেরি নয়। ভট্টরাই আর কয়েকজন মিলে যুবতীটিকে তোরণে-ব্যবহৃত শকটটিতে তুলল। আচার্য শকটে ওঠার আগে বললেন, বিষ্ক, অলঙ্কারের তালিকা প্রস্তুত করেছ তো?

আচার্য! এ আপনি কী বলছেন!

আচার্য বললেন, বলছি কি আর সাধে! জাষ্ককে তো চেন!

ভট্টরাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শকটটিতে উঠতে যাচ্ছিল, বিষ্ক নিষেধ করলেন।—না ভট্ট। তুমি নও। অন্য কেউ যাক। তোমার এখন অনেক কাজ।

আচার্য বললেন, একজন হলেই হবে। আর জাষ্ক বললে বলবে আমি আমার দায়িত্বে রোগীকে নিয়ে গেছি।

বিষ্কের নির্দেশমতো প্রভাতে কর্তব্যে আসা একটি প্রহরী শকটে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চালক ছুটিয়ে দিল শকটটিকে।

ভট্টরাই কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল। তার সারা শরীরে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নেমে এল। বিষ্কের কথার উদ্দেশ্য বুঝতে তার দেরি হল না। তাকে এখন যেতে হবে নগর প্রধানের কার্য্যালয়ে ঘটনা লিপিবদ্ধ করাতে আর এই দু'টি শবদেহ সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে! ভট্টরাই ভেঙ্গে পড়ল প্রধানত দু'টি কারণে। এক, দশটি রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তার শরীরে। এই অবস্থায় কার্যালয়ে গিয়ে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে জাষ্কের খুশি মতো। তারপর শুরু হবে ক্লান্তিকর প্রশ্নাবলী। হয়ত জাষ্ক তাকে প্রশ্ন করে বসবে, শর নিক্ষেপ করার আগে সে নগরাধ্যক্ষের অনুমতি নিয়েছিল কিনা! দ্বিতীয়ত, সে যেহেতু বিষ্কের অধীনে কর্মরত—সেহেতু জাষ্ক প্রতিটি তোরণ রক্ষীকে বিষ নজরে দেখেন। আবার যেহেতু বিষ্ক ইউ-চি দের অন্যতম শাখা হিউ-মি গোষ্ঠীভুক্ত সেহেতু কুই-সাং গোষ্ঠীর জাষ্ক শক্তি প্রতিযোগীতার জন্য বিষ্কের ওপর বিরূপ। বিষ্ক জাষ্কের কোনও অন্যায় আবদার সহ্য করেন না। রাত্রি বেলায় জাষ্কের কোন অতিথি নগরে প্রবেশ করবে—আর সেজন্য বিষ্ককে তোরণ দুয়ারের ছোট দ্বার খুলে দিতে হবে—এসব আদেশ বা অনুরোধ তিনি গ্রাহ্য করেন না।

ভট্টরাইয়ের দিকে তাকিয়েই বিষ্ক তার মনের কথা বুঝতে পারলেন। ভট্টরাই এখন যেতে চায় না। স্বাভাবিক। যাওয়ার পরিণামও তিনি জানেন।

বিষ্ক এই তরুণ কর্মঠ যুবকটির প্রতি একটু স্নেহশীল। তাই তিনি বললেন, ঠিক আছে। তুমি রাত্রি-কর্তব্য করেছ আজ দশদিন ধরে। তুমি ঘরে যাও। স্নানাদি করে বিশ্রাম নাও। রাত্রে কিন্তু কর্তব্য-কর্মে যোগ দিতে হবে। আমি প্রভাতের দল থেকে কারোকে ঘটনা লিপিবদ্ধ করাতে পাঠাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ল ভট্টরাই।—আপনার অসীম বিবেচনা। ভারমুক্ত হয়ে ভট্টরাই তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়ায় চড়ে ঘরের পথ ধরল। আশ্চর্যজনক ভাবে, অচেতন যুবতীটির মুখটি তাকে সারাটা পথ আচ্ছন্ন করে রাখল।—কে এই ধনবতী কন্যা? দস্যুরা কেন তার পিছু নিয়েছিল? দস্যুদের কী করে নগর তোরণে আসার সাহস হয়?

এক সময় নিজেকে সংযত করল ভট্টরাই। যুবতীটির কথা অযথা চিন্তা করা তার উচিত নয়। সামনে তার খড়ে ছাওয়া কুটীর দেখে সে নিজের মনকে বলল, যুবতীটির থেকে শতহস্ত ব্যবধানে থাকা উচিত। এই খড়-ছাওয়া কুটীর দেখলে সে ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নেবে।

ভট্টরাই দেখল মা কুটীর-দ্বারে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল।

মা ব্যাগ্র ভাবে প্রশ্ন করল, আজ এত দেরি হল?

হাসিমুখে ভট্টরাই বলল, সে অনেক ব্যাপার মা। চল। চল, পরে সব বলব। এখন ভীষণ ক্ষিদে। দাদা কাজে গেছে। বাবা?

হ্যাঁ। তিনি কোথায়ও গেছেন। নে। স্নান করে নে। আমি খাবার বাড়ছি।

ভট্টরাই ঘরের ভেতরে পোষাক ছেড়ে দ্রুত কুয়োতলায় চলে গেল। মাথায় জল ঢালার মুহূর্তে তার মনে হল, যুবতীটি কেমন আছে?

মনের মধ্যে অদ্ভুত এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে ভোর বেলায় জেগে উঠলেন সম্রাট কণিষ্ক। বিশাল কক্ষে শূন্য শয্যায় নিজেকে বড় একাকী বলে মনে হল তাঁর। কক্ষের কপাট ভেজানো। বাইরে রক্ষিণীরা পাহারায় রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঘর শূন্য। শয্যায় একাকী-নিঃসঙ্গ। সম্রাজ্ঞী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর হল। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট আর সংসার জীবনে ফিরে যেতে চাননি। নারী-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রজারা সম্রাটের

ভাবান্তরের দুটি কারণ নির্দেশ করে। এক, সাম্রাজ্ঞীর প্রতি ভালবাসা সম্রাটকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি আরও জোরাল। বেশ কিছু বছর হল, সম্রাট বুদ্ধের শরণাগত হয়েছেন। বুদ্ধতেই মনপ্রাণ নিবেদন করেছেন। বুদ্ধের মহিমা প্রচারের জন্য এক সুউচ্চ স্তুপ আর তার সঙ্গে লাগোয়া এক মহাবিহার নির্মাণে হাত দিয়েছেন। সম্রাটের ইচ্ছা, এই স্তুপ আর মহাবিহার যুগযুগ ধরে মানুষকে সত্যের পথ দেখাক, সত্যের পথে পরিচালিত করুক। এই বুদ্ধপ্রীতিই সম্ভবত তাকে আবার সংসার জীবনে প্রবেশ করা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই দ্বিতীয় কারণটিই সম্ভবত একমাত্র সত্য। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের প্রমাণ কোথাও তিনি রাখেন নি!

সম্রাটের অবসর কালীন সাহচর্যে আসেন বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, সংঘরক্ষিত আদি বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা।

মথুরা বিজয় সম্পন্ন করে তিনি পাটলিপুত্রের ওপর চাপ দিয়েছিলেন যাতে তারা অশ্বঘোষকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে। অশ্বঘোষ তখনও এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। পাটলিপুত্রের চাপে এবং সম্রাটের বিনীত অনুরোধে অশ্বঘোষ শেষ পর্যন্ত কণিষ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরম সমাদরে সম্রাট তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন পুরুষপুরে। তাঁরই কাছে দীক্ষিত হন বৌদ্ধধর্মে। সেই থেকে অশ্বঘোষ পুরুষপুরেরই অধিবাসী। এই বৌদ্ধ সংসর্গ ক্রমশই সম্রাটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কামনাহীন এক জগতে। ক্রমেই তিনি প্রবল থেকে প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছিলেন সংঘের সঙ্গে। প্রজারা কিন্তু সম্রাটের এই আচরণ ঠিক পছন্দ করেনি। তারা সিংহাসনে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে চায়নি। বুদ্ধেরও তো গৃহীশিষ্য ছিল। সম্রাট অশোকও গৃহী ছিলেন। তবে অসুবিধা কোথায়?

এই রাজপ্রাসাদ এবং সম্রাট সংক্রান্ত বিষয়ক মন্ত্রী হচ্ছেন অকৃতদার মহামিশ্র। সম্রাটকে তিনি ছায়ার মত অনুসরণ করেন এবং সম্রাটের পরম বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়তম মন্ত্রী। যদিও একমাত্র তিনিই জানতেন সম্রাটের নারী-বিরাগের প্রকৃত সত্যটি—তবু তিনিও সম্রাটের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিলেন দ্বিতীয় বিবাহের জন্য।

সম্রাট বলেছিলেন, বিবাহযোগ্যা নারী কোথায়?

মহামিশ্র বলেছিলেন, ঠিক আছে। আমি একটি ব্যবস্থা করছি। আমি সমাজের অভিজাতদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি—যদি তাঁদের কোনও রূপবতী কন্যা থাকে তবে তারা এই প্রাসাদে প্রাসাদ-রমণী হিসাবে কিছুকাল বসবাস করে সম্রাটের নানান সেবার কাজে লাগুক। ভবিষ্যতে সম্রাটের নারীপ্রিয়তা যদি

ফিরে আসে তবে সম্রাট তাদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞীকে বেছে নেবেন। অন্যরা উপপত্নী হিসাবে ভবিষ্যতে প্রাসাদে থেকে যেতেও পারে। অথবা আপন আপন গৃহে অক্ষত-যোনী হিসাবে ফিরে যেতেও পারে। সম্রাজ্ঞী বা সম্রাটের উপপত্নী হওয়াটা শ্লাঘার বিষয়। আশাকরি কোনও অভিজাত কন্যাই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হবে না—তাদের অভিভাবকরাও।

সম্রাট তাঁর প্রিয় মহামিশ্রকে নিরাশ করতে চাননি। অশ্বঘোষ প্রমুখদের কাছে নির্দেশ চেয়েছিলেন। তাঁরাও সম্মত হয়েছিলেন সাম্রাজ্যের স্বার্থে। অতঃপর মহামিশ্র বারোজন সুন্দরীকে প্রাসাদ রমণী হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। তারা সম্রাটের কক্ষে যাওয়ার অলিন্দ পথের দুধারের কক্ষগুলিতে বাস করে। সম্রাটের জন্য রন্ধন, ভোজন, সম্রাটের কক্ষসজ্জা, পরিধেয় সব কিছুর ওপর দৃষ্টি রাখে। সম্রাটের ভোজনের সময় তারা সারবদ্ধ ভাবে অবস্থান করে। দাসীরা তাদের আদেশে সম্রাটের পরিচর্যা করে। কিন্তু সম্রাট কারোর প্রতি এখনও পর্যন্ত কোনও কৌতূহল প্রকাশ করেননি। কাউকে উৎসাহিতও করেননি। রাত্রে কোনও কাজে কাউকে তাঁর কক্ষে আহ্বানও জানাননি। তবু সম্রাটের দৃষ্টির সামনে আসার জন্য প্রাসাদ-রমণীদের মধ্যে চলে তীব্র প্রতিযোগীতা। সম্রাটের শয্যার শূন্যস্থান পূরণ করার বাসনায় তারা প্রায় সকলেই উদগ্র!

সম্রাট কণিষ্ক আপন মনেই শয্যার ওপর উঠে বসলেন। চোখ বন্ধ করে অমিতাভ বুদ্ধকে প্রণাম জানালেন। তারপর শয্যা থেকে নেমে ধীর পায়ে বাতায়নের কপাট খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনেই রাজকীয় উদ্যান। আরও পেছনে কুবা নদী ছুটে চলেছে সিন্ধুনদের উদ্দেশ্যে।

সম্রাটের হঠাৎ মনে হল, কিছু বছর আগে তাঁর ধর্ম কী ছিল? তাঁর দেবতাই বা কে ছিল? কেউ না—কেউ না। তাঁর বা তাদের ধর্ম বলে কোনও বোধই ছিল না। এক বর্বর যাযাবর জাতির ধর্মবোধ কী হতে পারে? তাঁর আদি পুরুষরা বাস করতেন চৈনিক সাম্রাজ্যের কান-সু ও নিং-শিয়া প্রদেশে। স্থানটি মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত তৃণাঞ্চল। অন্যান্য কয়েকটি যাযাবর জাতিও সেখানে সহাবস্থানে ছিল। জাতিগত পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন ইউ-চি। বাস করতেন পশুচর্মের তাঁবুতে। পরিধেয় ছিল পশুচর্ম। ঘোড়ার পিঠেই তাদের দিন কাটত। ঘোড়ার পিঠে বসেই খাওয়া-দাওয়া! কিন্তু শান্তি ছিল না। প্রতি নিয়ত সংঘর্ষ হত অন্যান্য যাযাবর গোষ্ঠীর সঙ্গে এলাকা নিয়ে। কে কত বেশি এলাকা নিজেদের কুক্ষিগত করবে! তলোয়ারের শক্তির ওপর নির্ভর করে তাদের বেঁচে থাকতে হত।

কুবার বুক থেকে ভোরের শীতল বাতাস ছুটে আসছিল হু-হু করে। স্নিগ্ধ-মনোরম। আশ্চর্যজনক ভাবে সম্রাটের মনে পড়ে গেল দুটি নদীর কথা শিরদরিয়া আর আমুদরিয়া বা অক্ষু নদী। । চোখের সামনে ভেসে উঠল বিস্তীর্ণ সেই তৃণাঞ্চল। সম্রাটের মস্তিষ্কে জেগে উঠল ইউ-চি তথা কুষাণ জাতির ইতিহাস!

সেবার অঞ্চল দখলের লড়াইতে এগিয়ে এল হিউং-নু বা হুণ নামে এক যাযাবর গোষ্ঠী। তারা ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ আর ইউ-চিদের তুলনায় আরও শক্তিশালী। ঘোরতর সংগ্রাম আর রক্তপাতের পর ইউ-চিদের নিরাপদ স্থানের জন্য পিছু হটতে হল। ইউ-চি সমাজে সেই সময়কার এক কিংবদন্তী আজও জীবিত রয়েছে। হুণ আক্রমণে ইউ-চি দলপতি নিহত হয়। হুণ গোষ্ঠীপতি নিহত ইউ-চি নেতার মাথার খুলি দিয়ে তার পানপাত্র তৈরি করে! নৃশংসতায় অবশ্য কোনও যাযাবর গোষ্ঠীই কম ছিল না। মানুষের জীবন তাদের কাছে কীট-পতংগের মতোই ছিল। একে অন্যকে হত্যা করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হোত না।

হুণ শক্তির কাছে তারা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে আরও পশ্চিমে আশ্রয়ের খোঁজে এগোলেও দুর্ভাগ্য তাদের পিছু ছাড়ল না। তারা তখন তাকলামাকান বা গোবি মরুভূমির উত্তরে চলে এসেছে। পথিমধ্যে উ-সুং নামে আর এক যাযাবর গোষ্ঠী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইউ-চিরা তখন মরিয়া। তারা মরণ কামড় দিল। ঘোরতর যুদ্ধের পর উ-সুংরা পিছু হটল। তাদের রাজা মারা গেল। এরপর তারা ইসিকুল হ্রদের তীরে উপস্থিত হয়। তবু অঞ্চলটি নিরাপদ নয় মনে করে ইউ-চিরা পশ্চিমের দিকে তাদের গতি অব্যাহত রাখল। ইউ-চিদের বৃহত্তর অংশটি ইসিকুল হ্রদ ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে এগোতে থাকল। অন্যেরা দক্ষিণে নেমে এসে তিব্বতের কাছে স্থিতু হল। ইতিহাসে এরাই ছোট ইউ-চি গোষ্ঠী। ক্রমে বড় অংশটি শিরদরিয়া নদীর উপত্যকায় এসে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। সেই অঞ্চলে বাস করছিল 'শক' নামে আরও একটি দুর্ধর্ষ গোষ্ঠী। পশু থেকে মানুষ কেউই তার অধিকৃত অঞ্চল ছাড়তে চায় না। ফলে আবার তীব্র সংঘাত। রক্তপাত। মৃত্যু। তবে আশ্চর্যজনক হলেও 'শক'রা সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। ইউ-চিরা অধিকার করল শিরদরিয়া উপত্যকা। শকেরা ঢুকে পড়ল ভারত তথা আফগানিস্তানের কপিশা-লমপাক-গান্ধার অঞ্চলে।

শিরদরিয়ার নদী মাতৃক প্রভাব দীর্ঘ কুড়ি বছরে ইউ-চিদের যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল, উপরন্তু তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে কুড়ি বছর আগে

পরাজিত উ-সুংরা তাদের প্রতিশোধের আগুন বুকে চেপে রেখে শক্তিবৃদ্ধি করেছে এবং তারা হুণদের নিয়ে আবার হানা দেবে। রক্তে শিরদরিয়ার জল লাল হয়ে উঠল—তবু ইউ-চিদের পিছু হটতে হল। কিন্তু এবার কোন নতুন ঠিকানায়? নদীমাতৃকতা তাদের রক্তে কুড়ি বছরে অনেক ছাপ ফেলেছে। তারা শুষ্ক তৃণাঞ্চল ছেড়ে কোনও শ্যামল অঞ্চলে নতুন বাসস্থান গড়ে তুলতে চায়—যেখানে পাওয়া যাবে শান্তি—গড়ে উঠবে সমৃদ্ধি। কিন্তু কোন সেই অঞ্চল? কোথায় নদীর আকারে বয়ে চলেছে বিপুল জলধারা! পিছু হটতে হটতে একদিন তারা পৌঁছে গেল অক্ষুনদীর বা আমুদরিয়া নদীর উপত্যকায়। শিরদরিয়ার স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ফিরে এল তাদের মধ্যে। অক্ষু উপত্যকাতেই তারা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল এক স্থায়ী ঠিকানা। এখানে বাস করত তা-হিয়া নামে এক জাতি। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে যতটা দক্ষ ছিল—যুদ্ধবিদ্যায় ততটা নয়। ফলে ইউ-চিরা সহজেই তাদের পরাজিত করে সামন্তে রূপান্তরিত করল এবং অক্ষু নদীর উত্তরে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করল সোগাদনিয়ায় (বুখারা)। নদীর পরশে তারা পরিবর্তিত হতে থাকল। সুখ শান্তিতে মোটামুটি প্রায় একশ বছর কেটে গেল অক্ষু উপত্যকায়। যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে তারা কৃষি সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে ততদিনে। অন্যদিকে যুদ্ধ—হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবার পর তাদের বহুগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা বিবর্ধিত হতে হতে পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল, হিউ-মি, কুই-সাং, হি-থুম, চুং-মো এবং কাউ-ফু অর্থাৎ কুষাণ। শক্তিশালী ছিল এই কুষাণেরা। তাদের দলপতি ওয়াং বা রাজা উপাধি নিয়ে ইউ-চিদের অন্য চারটি গোষ্ঠীকে একই পতাকাতলে নিয়ে এসে এক প্রবল শক্তি গড়ে তুললেন। ইউ-চিরা তখন বর্বর যাযাবর নয়। একশ বছরের স্থিতু শান্তিময় জীবন তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে—-তাদের জীবন যাত্রায় এবং চিন্তার ক্ষেত্রে। রাজ্য গড়ে তোলার এক আকাঙ্ক্ষা তাদের পেয়ে বসল।

কারোর পায়ের শব্দে কণিষ্কের চিন্তা বাধা পেল। সম্রাট মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, পুত্র বাসিষ্ক ঘরে ঢুকছে। বাতায়ন ছেড়ে তিনি ঘরে ঢুকে পুত্রকে বললেন, এস। বস।

বাসিষ্ক একটি আসনে বসে প্রশ্ন করল, রাতে সুনিদ্রা হয়েছিল কী? বাতায়নে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? কিছু ভাবছিলেন?

কণিষ্ক হেসে বললেন, তেমন কিছু নয়। একটু অপেক্ষা কর। শৌচাগার থেকে ফিরে এসে বলছি। কক্ষ সংলগ্ন শৌচাগারে ঢুকে গেলেন সম্রাট। সামান্য পরে ফিরে এসে পুত্রের মুখোমুখি বসলেন। বললেন, হ্যাঁ। হঠাৎ জানি না

কেন আমার আমাদের জাতির উত্থানের ইতিবৃত্ত মনে পড়ে গেল। নিজেদের ইতিহাস না জানলে, তার থেকে শিক্ষা না নিলে কোনও জাতিই বড় হয়ে উঠতে পারে না।

বাসিষ্ক বিনয়ের সঙ্গে বলল, সে তো সত্য কথা।

তুমি পাঠ করেছ কি আমাদের জাতির ইতিবৃত্ত? যদিও আমরা এখন অংশত ভারতীয়। তবু পূর্বকথা ভুললে তো চলবে না। বিশেষত তোমরা এখন নবীন। তোমাদের বিশেষ করে জানতে হবে। আচ্ছা বলত, আমাদের জাতির প্রথম প্রাণপুরুষ কে?

কেন। সম্রাট প্রথম কুজুল কদফিস!

ঠিক। কী আশ্চর্য ক্ষমতা, অপ্রতিরোধ্য আকঙ্ক্ষা ছিল মানুষটির মধ্যে! তিনি অন্য গোষ্ঠীগুলিকে নিজের অধিকারে এনে পার্থিয়ার পহ্লবদের পরাজিত করলেন। এরপর তার অধিকারে এল কাবুল উপত্যকা। কাবুল উপত্যকায় ছিল যবনদের রাজত্ব। পহ্লবেরা কাবুল অধিকার করে নেবার পরেই কদফিস পহ্লবদের হাত থেকে ঐ উপত্যকা কেড়ে নেন এবং পহ্লবদের দূর করেন। আশি বছরের পর তিনি মারা গেলে পুত্র দ্বিতীয় কদফিস ওয়াং বা রাজা হলেন। তক্ষশিলা জয় করলেন। পরে পহ্লবদের ও শকদের পরাজিত করে সিন্ধুদেশ জয় করে ভারত ও বর্হিভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পারস্যের সীমান্ত থেকে সিন্ধু ও বিতস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তক্ষশিলাও তার সাম্রাজ্যের ভিতর ছিল।

বাসিষ্ক বললেন, বাবা, আপনার কৃতিত্বও তো কম নয়। আপনি পামির আর তিব্বতের মাঝে খোটান থেকে ভারতে ঢুকে কশ্যপপুরা (কাশ্মীর) থেকে বারাণসী পর্যন্ত এক সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় কদফিসের মৃত্যু হলে ছোট ইউ-চিদের ছোট কুষাণ শাখার প্রতিনিধি হিসাবে সমগ্র কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেন। অক্ষু নদীর উত্তরে রাজধানী তা-হিয়ায় আপনার প্রতিনিধিই রাজ্যশাসন করছে। আপনিই এই বিস্তৃত ভূভাগের সম্রাট।

কণিষ্ক হেসে বললেন, পুত্র! এই বিশাল সাম্রাজ্য ভবিষ্যতে তোমাকেই পরিচালনা করতে হবে। তাই, আমার ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ যদিও শাসন করছে মহাক্ষত্রপ খারপল্লান এবং ক্ষত্রপ বনস্পর। তবুও আমি তোমাকে তাদের মাথার ওপর রেখেছি। কারণ, তুমি নবীন। তোমার শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এমনিতেই মথুরা ইত্যাদি স্থানে পরাজিত শক ও নাগবংশীয়দের নিয়ে অশান্তি রয়েছে। পাটলিপুত্রের অবশিষ্ট শুঙ্গরাও যথেষ্ট বিপজ্জনক। সুতরাং, সম্রাটের হয়ে তোমাকে সেখানে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখতে হবে।

বাসিস্ক বলল, তা আমি রাখছি। আমি গুপ্তচর বিভাগকে নতুন করে গড়ে তুলেছি। পূর্বাঞ্চলের সামাজিক ও সংস্কৃতির জগতেও আমি জড়িয়ে পড়েছি। সেখানে অর্থাৎ মথুরাকে কেন্দ্র করে এক নতুন শিল্পকলাকেও প্রোৎসাহিত করছি। মথুরার নতুন কলার শিল্পীরা আপনার একটি মূর্তি তৈরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূতপূর্ব সম্রাটেরও একটি পূর্ণায়ব তৈরি হচ্ছে।

সম্রাট বললেন, সাম্রাজ্যের দুই প্রান্তে গড়ে উঠুক দুই শিল্পকলা, গ্রীক-রোমক-ভারতীয় মিলে গান্ধারে গান্ধার শিল্প, আর মথুরায় মৌর্য-শুঙ্গ ও আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা মিলে বেড়ে উঠুক মথুরার শিল্পকলা।

বাসিস্ক বলল, দু'টি ক্ষেত্রেই আপনাকে পৃষ্ঠপোষক বলে ইতিহাস স্বীকার করবে।

কণিষ্ক বললেন, থাক ওসব কথা। বল,. সকালেই কেন তুমি দেখা করতে এসেছো? কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

বাসিস্ক বলল, গতকাল বিকালে আমি আপনার মহাবিহারের নির্মাণ কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। এতো বিশাল আয়োজন! সারা ভারতভূমিতে এমন সুউচ্চ স্তুপ আছে বলে তো মনে হয় না। মহাবিহারও মহা-ই! যবন এজিসিলাওস অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সব কিছু নির্মাণ করেছে। মুগ্ধ হলাম গান্ধার শিল্পকলার নমুনা দেখে। গান্ধার শিল্পীরা বিহার এবং চৈত্যের গায়ে জাতকের উপাখ্যান কোথাও অঙ্কন করেছে—কোথাও বা খোদাই করেছে! অপূর্ব!

আরও অনেক কিছু নির্মাণ বাকি আছে। যেমন বুদ্ধের পবিত্র চিহ্নগুলি যে পেটিকায় ভরে স্তুপে প্রোথিত করা হবে সেটির নির্মাণ এখনও বাকি।

বাবা!

বল।

যত কাজই থাকুক না কেন—আর দু'মাস! অজস্র শিল্পী-শ্রমিক যেখানে কাজে ব্যস্ত।

তা থাকুক। কিন্তু তুমি কি চাইছ?

আমি মহাবিহারের উদ্বোধন পর্যন্ত এখানে থেকে যেতে চাই।

এখানে.....থাকবে বলছ? চিন্তান্বিত দেখাল কণিষ্ককে।—কিন্তু! কণিষ্কের কথা শেষ হল না। দেখা গেল দ্বারদেশে থেকে মহামিশ্র বলছেন— সম্রাটের জয় হোক!

মহামিশ্র! তুমিও এই প্রভাতে!

সম্রাট! একটি গুরুতর সংবাদ রয়েছে। তাই—।

কী সেই সংবাদ?

মহামিশ্র কাছে এগিয়ে এসে বললেন, কুমারও রয়েছেন। ভালই হল। গুপ্তচর প্রধান নীলাকার একটি গুরুতর সংবাদ জানিয়েছেন। মথুরায় শক আর নাগেরা মিলে একটি অশান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ খুঁজছে। কুমারের উচিত হবে অবিলম্বে ফিরে যাওয়া।

সম্রাট হেসে বললেন, কুমার যে উদ্বোধনের দিন পর্যন্ত এখানে থাকতে চাইছিল।

শুষ্ক হয়ে গেল বাসিষ্কের মুখ।—আমার কপালে নেই। বুদ্ধ হয়ত চান না, আমি উদ্বোধনে উপস্থিত থাকি।

কণিষ্ক বললেন, সেটা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। আমি আমার সক্ষম পুত্র থাকতে মহাক্ষত্রপ খারপল্লান আর ক্ষত্রপ বনস্পরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারিনা।

বাসিস্ক বলল, সম্রাটের আদেশ মান্য করা হবে। তবে আমাকে আগামীকাল প্রাতে যাত্রা করার অনুমতি দিন। পুরুষপুর আমার জন্মভূমি। মায়ের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর আমি এখানে এলাম। মায়ের স্মৃতি! আজ আমি সারা পুরুষপুর, পুরুষপুরের বাইরের অঞ্চল দেখে বেড়াব। অনেক পুরোন দিনের কথা সেখানে জড়িয়ে আছে।

মৃত স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠতেই সম্রাট একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, সে তোমার ইচ্ছা। আমি অনুমোদন করলাম। কাল প্রাতেই তুমি যাত্রা কর। কোন অসুবিধে আছে কি, মহামিশ্র?

মহামিশ্র বললেন, না। কুমার স্বচ্ছন্দে কালই যাত্রা করুন।

বাসিস্ক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবে আজ্ঞা দিন, আমি আমার কাজে যাই।

এস!

বাসিষ্ক চলে যেতে কণিষ্ক মহামিশ্রকে বললেন, কেমন দেখছ বাসিষ্ককে? আমার দায়িত্ব সে নিতে পারবে তো?

মহামিশ্র হেসে বললেন, নিশ্চয় পারবে। তবে অনেক দূরের ব্যাপার। ততদিনে কুমার আরও পরিপক্ক হয়ে উঠবেন। আপনি তো মাত্র মধ্য চল্লিশ। মনে করুন, সম্রাট প্রথম কুজল কদফিস কতদিন বেঁচে ছিলেন!

সম্রাট হঠাৎই বললেন, তা অবশ্য। তবে অত আয়ু আমার হবে না। যতদিন বাঁচব—ততদিনই ব্যাধি এবং নানা রকমের যন্ত্রণা সহ্য করা। বুদ্ধ তার অনেক আগেই আমাকে নির্বাণের পথে নিয়ে যাবেন। সম্রাট করজোড়ে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকালেন।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আমি কামনা করি, আপনি বহুকাল জীবিত থাকুন। এই ভারতবর্ষ এক সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠুক।

সম্রাট বললেন, ঠিক আছে। তোমার কামনা তুমি কর, এখন বল আজ রাজসভায় বিশেষ বিশেষ কাজ কী কী আছে?

মহামিশ্র বললেন, রোম সম্রাট ট্রোজানের দূত এসেছে। তারা মূলত রোম, খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ হয়ে চিন পর্যন্ত যে রেশম পথ রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। যেখানে শুল্ক বিষয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে নিম্ন-সিন্ধুর বন্দরগুলি থেকে যেসব পণ্য অর্থাৎ মসলিন, মশলা, নানান ধাতু প্রভৃতি রোমের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়—সেখানেও অধীনস্ত শক-পহ্লবেরা কিছু সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। কাথিয়াবাড়, সৌরাষ্ট্রেও এই সমস্যা। সেখানকার প্রতিনিধরাও এসেছেন।

সম্রাট বললেন, কুষাণ সাম্রাজ্যের ধনলক্ষ্মী এসব স্থানে জড়িয়ে আছেন। আজ রপ্তানীর জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর স্বর্ণ এদেশে ঢুকছে। রেশমপথের অধিকারের ফলেও কুষাণ সাম্রাজ্য আজ ধনাঢ্য। সুতরাং এগুলি গুরুতর বিষয়। মহামিশ্র তুমি আমার প্রাতরাশের আয়োজন কর। দাসীদের বল, আমার স্নানঘর প্রস্তুত করতে। তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। সভায় যাবার সময় হয়ে এল।

মহামিশ্র বললেন, যথা আজ্ঞা, সম্রাট। আমি সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনার প্রাতরাশ নিয়ে প্রাসাদ-রমণীরা প্রস্তুত। আপনি স্নান সেরে পোষাক পরিবর্তন করে নিলেই তারা উপস্থিত হবে।

সম্রাট যেন একটু বিরক্ত হয়ে অনুযোগ করলেন, মহামিশ্র! তুমি কেন এই প্রাসাদ-রমণীদের আবর্তে আমায় ফেললে! অপেক্ষা করতে করতে ওদের যৌবন একদিন শেষ হয়ে যাবে। সংসার-জীবনে আমি আর ফিরব না।

মহামিশ্র বললেন, প্রজাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি প্রার্থনা করছি—এ সুযোগ আমাকে দিন, সম্রাট! আমরা কোনও প্রাসাদ-রমণীকে বন্দী করে রাখিনি। স্বইচ্ছায়—স্বজ্ঞানে তারা এসেছে। প্রয়োজন হলে তারা চলে যেতেও পারে। কেউ তাদের বাধা দেবে না।

সম্রাট বললেন, বেশ। নিজেদের কর্মফল তারা ভোগ করুক, আমার কী!

কক্ষ ত্যাগ করতে করতে মহামিশ্র মনে মনে বললেন, তাঁর সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কটা অনেকটা গভীর বন্ধুত্বের পর্যায়ে। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। ফলত, তিনি যেমন সম্রাটের কাছে স্বচ্ছন্দ—এ সাম্রাজ্যে অন্য তেমন কেউ নেঁই। সম্রাট জানেন, মহামিশ্র নির্লোভ। নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি ঐকান্তিক এবং প্রগাঢ় সম্রাটসেবী। সম্রাট বৌদ্ধ—তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মী। তবু বিবাদ কোথাও নেই।

কয়েকজন রক্ষীর সাময়িক অনুপস্থিতির জন্য ভট্টরাইয়ের বিশ্রাম বিলম্বিত হয়েছে। আজ সে বিশ্রাম পেয়েছে এবং যথারীতি জাষ্কের আদেশে তাকে তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিতি দিতে হবে। সেদিন বিষ্কের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেলেও—জাষ্ক আদেশ করেছিলেন ভট্টরাইকে আসতে হবে ঘটনার খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করার জন্য। আচার্য চরক যুবতীটিকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে গেছেন শুনে সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করেননি। কারণ, তিনি জানেন, আচার্য চরক পুরুষপুর কেন—গোটা সাম্রাজ্যে এক সন্মানিত ব্যক্তি। লোকে তাঁকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলে। তাছাড়া সম্রাটের সঙ্গে তাঁর রয়েছে গভীর সখ্যতা। এ হেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু করে সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়ার মতো মুর্খ তিনি নন। তবু তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ তিনি ভট্টরাইয়ের ওপর উগড়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন।

ভট্টরাই বুদ্ধিমান। সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল জাষ্ক কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে সকাল সকাল উপস্থিত হলেও—সারাদিন তাকে বসিয়ে রেখে শেষ বেলায় ডেকে পাঠাবেন—তর্জন-গর্জন করবেন। ভট্টরাই ওসবে ভয় পায় না। সে জানে, সে জাষ্কের কর্মচারি নয়—বিষ্কের। আর বিষ্কের ওপর খবরদারি করা জাষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, গোষ্ঠীগত দিক দিয়ে সম্রাট এবং প্রশাসনের অন্যান্য অংশে তাঁরও সহজ প্রবেশ আছে। বিষ্ক কখনই জাষ্কের হাতে তাঁর কোনও কর্মচারিকে নিগৃহীত হতে দেবেন না।

কার্যালয়ে পৌঁছে ভট্টরাই দেখল তার অনুমানই সঠিক। ভট্টরাইয়ের উপস্থিতির কথা জেনেও তাকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি নিগ্রহ কক্ষে প্রবেশ করে কোনও বন্দীর ওপর অত্যাচার করা শুরু করলেন। বন্দীর আর্তনাদে সারা

কার্যালয় সচকিত হয়ে উঠল। বিরক্ত বোধ করলেও ভট্টরাইয়ের করণীয় কিছু ছিল না। সে জানে না বন্দীটি প্রকৃতপক্ষে দোষী না নির্দোষ। জানলেই বা কী হবে? এ এক পৃথক কার্যালয়। জাষ্কই এখানকার সর্বেসর্বা। শেষ পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে ভট্টরাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক প্রহরীকে বলল, আমি কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে—ঐ গাছের তলায় বসছি। আমার ঘুম পাচ্ছে। নগরাধ্যক্ষের সময় হলে যেন ডেকে নেন। কার্যালয় থেকে বেরিয়ে সত্যই ভট্টরাই গাছের তলায় শুয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমোনটা আশ্চর্যজনক নয়। দীর্ঘ পনেরদিন সে রাত্রি জাগরণ করেছে। রাত্রি জাগরণ যারা করে বা করেছে তারাই বুঝবে বিষয়টি।

বেলা শেষে পড়ন্ত সূর্যের আলো মুখে-চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল ভট্টরাইয়ের। ধড়মড় করে উঠে সে তাকাল কার্যালয়ের সিঁড়ির দিকে। তার অনেক পরের একজন বেরিয়ে আসছে। ভট্টরাই জিজ্ঞেস করল, আর কেউ কি নগরাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে রয়েছে?

লোকটি বলল, না, সেই শেষজন।

আমাকে খোঁজ করেছিল?

না বলেই তো মনে হয়। লোকটি চলে গেল।

মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভট্টরাই। তারপরের মানুষ চলে গেল অথচ তার ডাক পড়ল না। না! একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। যদি না ডাকে তো সে ফিরে যাবে। তারপর যা হবার তা হবে। ভট্টরাই উঠে পড়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। সেই মুহূর্তে একজন রক্ষী হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল।

কোথায় যে থাক!

কেন জানো না? আমি তো বলেই গেলাম।

তা জাষ্কের সঙ্গে দেখা করতে এসে তোমার ঘুম পায়!

আমি কেন নগরাধ্যক্ষকে মিছিমিছি ভয় পাব? আমার মাথার ওপর কেউ নেই নাকি?

যাকগে বাপু। চল। তোমার ডাক পড়েছে।

ভট্টরাই সিঁড়ির ধারে মাটির কলসিতে রাখা জলে মুখচোখ ধুয়ে নিয়ে জাষ্কের কক্ষে প্রবেশ করল।

চিৎকার করে উঠলেন জাষ্ক, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

আপনার ডাকের অপেক্ষা করছিলাম। জানি তো—আগে এলেও শেষ

বেলায় ডাকবেন। তাই একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। তা আপনি কি আগে আমাকে ডেকেছিলেন? প্রহরীরা তো জানতই আমি কোথায়?

সক্রোধে জাষ্ক বললেন, তুমি খুব দুর্বিনীত। ভেবেছ বিষ্ক তোমায় বাঁচাবে?

কেন? আমি চোর না ডাকাত? বাঁচাবার কী আছে?

তুমি হত্যাকারী। দুজন নিরীহ লোককে হত্যা করেছ!

বিনয়ের সঙ্গে ভট্টরাই বলল, মার্জনা করবেন। আপনি কি সংবাদ নিয়েছেন যে ঐ অস্ত্রধারী দুজন নিরীহ মানুষ? তারা খেলা করার ছলে যুবতীটিকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসছিল? আমি আমার কর্তব্য করেছি। যুবতীটিকে রক্ষা করেছি। আপনিই খুঁজে বার করুন—আমি হত্যাকারী কি না। আমার প্রধান সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জাষ্ক যেন একটু দমে গেলেন ভট্টরাইয়ের নির্ভীকতা দেখে। এ যাবৎ তাঁকে দেখে সবাই ভয় পায়। এ তো তাঁর গর্জনকেও গ্রাহ্য করছে না! মনে মনে গর্জে উঠলেন জাষ্ক, বিষ্ক—বিষ্কই এর মাথাটা খেয়েছে! যা হোক, যুবতীটির কথা শুনলেই সব বোঝা যাবে।—সে এখন কোথায়?

কেন? তা তো আপনার জানার কথা। আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আচার্য চরক নিজ দায়িত্বে তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেছেন। এই পর্যন্ত আমি জানি।

জাষ্ক বুঝলেন, এই যুবকটি যথেষ্ট সাহসী এবং স্পষ্ট-বক্তা। অযথা তর্জন-গর্জন করে কোনও লাভ নেই। কিছু তথ্য তার কাছ থেকে নিতে হবে। হঠাৎ তিনি সদয় হয়ে বললেন, ঐ আসনটিতে বস। আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

আসনে বসে পড়ে ভট্টরাই বলল, প্রশ্ন করুন।

জাষ্ক বললেন, শুরু থেকে ঘটনাটি তুমি বল।

ভট্টরাই আনুপুর্বিক ঘটনার বিবরণ দিল।

জাষ্ক প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, কেন ঐ দুজন যুবতীটিকে আক্রমণ করেছিল?

ভট্টরাই বলল, আমি তো বলেইছি—আচার-আচরণ আর অবয়বে ওরা দু'জন দস্যু শ্রেণির। মনে হয় যুবতীটির বহুমূল্যের অলংকার ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বহুমূল্যের অলংকার! কই আগে তো কেউ বলেনি। কী অলংকার?

ভট্টরাই বলল, রূপ আর আভরণ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে যুবতীটি ধনাঢ্য। তার কণ্ঠে মূল্যবান হীরক হার। সারা অঙ্গে আরও সব নানান রত্নখচিত অলংকার। ঐসব অলংকারের যে মূল্য হবে তাতে যে কোন সাধারণ মানুষ চতুর্দশ পুরুষ বসে খেতে পারবে।

জাষ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আশ্চর্য! বিষ্কের প্রতিনিধি সেদিন এসব কথা আমাকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি! এখন সেসব অলংকার কোথায়?

কেন তার গায়েই রয়েছে।

আশ্চর্য! তার জ্ঞানহীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে কেউ তো খুলে নিয়ে থাকতে পারে। তুমি বলছ, চতুর্দশ পুরুষ বসে খেতে পারে এত অলংকার। জাষ্কের চোখে যেন লোভের ছায়া! নীরবে তা লক্ষ করল ভট্টরাই।

আশ্চর্য! চরক যখন তাকে নিয়ে গেলেন—অলংকারগুলির কোন হিসাব কি রাখা হয়েছিল?

আচার্য বলেছিলেন। বিষ্ক আচার্যকে অপমান করতে চান নি।

নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে জাষ্ক বললেন, আরে! আচার্যের কথা আসছে কেন? তাঁর আশ্রম তো বারো ভূতের জায়গা। কেউ যদি খুলে নেয়?

খুলে নিয়ে থাকলে নিয়েছে। সেই যুবতীটি যতক্ষণ অভিযোগ না করছে, ততক্ষণ বলার কী আছে?

ঠিক—ঠিক। আমি এত বোকা। অনেক আগেই আমার আশ্রমে গিয়ে যুবতীটির অবস্থা দেখে আসা উচিত ছিল। ছিঃ! নিজেকে দুষলেন জাষ্ক।—এখন যদি সে মারা গিয়ে থাকে!

ভট্টরাইয়ের বুক যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল।—অমন কথা বলবেন না। আচার্য সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!

জাষ্ক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—না, না। এ কথার কথা। জীবন-মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে? ধর, যদি মারাই গিয়ে থাকে তাহলে ঐ অতুল ঐশ্বর্য...। না—না। চল। যুবতীটিকে এখনই একবার দেখা উচিত। কে জানে, পুরুষপুরের কোনও ক্ষমতাশালীর আত্মীয়া কি না। আশ্চর্য! রাত দুপুরেও এত অলংকার গায়ে চাপিয়ে আসার কী দরকার ছিল? সম্রাট কণিষ্কের শাসন। সুশাসন আছে নিশ্চয়। কিন্তু চোর-দস্যুরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? ওরা নিঃশেষ হয় না। লুকিয়ে বসে থাকে, চল—চল। তা তুমি কিসে যাবে? শকটটা বার করতে বলব কি?

না না, আমার অশ্ব রয়েছে। ভট্টরাইয়েরও মনে প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল সেই অপরূপাকে একবার দেখবার। তার খোঁজ নেওয়ার। এটা তার মানবিক কর্তব্য ছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সুযোগ পায়নি সে। এতদিন সে যে তার কথা ভাবে নি তা নয়। সুস্থ হবার পর এই অপরিচিত নগরে মেয়েটি কী করবে? কোথায় আশ্রয় নেবে? আচার্য চরক অবশ্য হৃদয়বান মানুষ। তিনি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। তবু ভট্টরাইয়ের মন যেন বলছিল, ব্যবস্থাটা সে নিজে করতে পারলে বেশি খুশি হত।

ভট্টরাইকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে বিরক্ত হয়ে জাষ্ক বললেন, তোমার আবার কী হল? চল।

না। ভাবছি আমার যাওয়ার কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে?

আরে? তোমাকেই তো প্রয়োজন! তার গহনার বিবরণ আর কে দেবে? চল—চল। আমার প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে এদিকে। ভট্টরাই অনুসরণ করল নগরাধ্যক্ষকে।

বিশাল অঞ্চল জুড়ে আচার্য চরকের আশ্রম। সেই ভূমির কেন্দ্রস্থলে দক্ষিণ দিক খোলা রেখে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে সার সার খড়ে ছাওয়া কুটির। মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল প্রাঙ্গণ। গোবরজলে নিষিক্ত। পূর্বের কুটিরগুলোয় আচার্যের পরিবারের বসবাস। পশ্চিমে থাকে শিষ্যরা। উত্তরের কুটিরে তাঁর আরোগ্য নিকেতন। জনা তিরিশ রোগী সেখানে নিত্য রয়ে যায়। বাকি অঞ্চলে নানান চাষ। যে ঔষধীর লতাগুল্মগুলি তিনি এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন না—তা সংগ্রহ করেন পাহাড়ের বুকের বনভূমি থেকে।

বিদায়ী সূর্যের আলো তখন পশ্চিমের কুটীরে লুটিয়ে পড়েছে। জাষ্ক আর ভট্টরাই প্রবেশদ্বারের কাছে একটা গাছের গায়ে তাদের অশ্ব দুটিকে বেঁধে রেখে এগিয়ে গেল। চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলার জন্য তারা সহজেই আবিষ্কার করল যে পূবের কুটীরের দাওয়ায় আচার্য একটি যুবতীর পরিচর্যায় ব্যস্ত। ভট্টরাইয়ের চিনতে কোন ভুল হল না, এই সেই সুন্দরী যুবতী।

আচার্য চরক অলংকার শোভিতা সুন্দরীকে আরোগ্যশালায় রাখাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন নি; তাই তিনি তাকে নিজের পরিবারিক কুটীরে রেখে দিয়েছেন।

আচার্য সেইদিন আশ্রমে উপস্থিত শিষ্যদের সহযোগীতায় শল্য ব্যবহার করে যুবতীর বাহু থেকে তিরটি বার করে স্থানটি সেলাই করে দেন। তারপর আহত স্থানটিকে বিশেষ কর্পূর জলে ধুয়ে রক্তচন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য ঔষধি তো ছিলই। আজও তিনি যুবতীটির ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরের ভেতর থেকে রোগীকে বাইরের দাওয়ায় খোলা বাতাসে নিয়ে এসেছিলেন। রোগী এখন যথেষ্ট সুস্থ। জাষ্ক আর ভট্টরাইকে এগিয়ে আসতে দেখে চরক বললেন, জাষ্কের কুশল তো? তা কী মনে করে? অসুস্থ?

না—হেঁ-হেঁ করে বিগলিত ভাবে হেসে জাষ্ক বললেন, যুবতীটিকে দেখতে এলাম। কেমন আছে। এই অবস্থার কারণ কি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভট্টরাই আড়চোখে দেখল, জাষ্কের দৃষ্টি যুবতীটির হীরকখচিত কণ্ঠহারের ওপর স্থির হয়ে আছে। যুবতীটি অস্বস্তি বোধ করে গায়ের কাপড় ভাল করে জড়িয়ে নিল।

আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গের যুবকটিকে তো চেনা চেনা লাগছে। এ কে? কোথায় যেন দেখেছি!

জাষ্ক বললেন, সেদিন নগর তোরণে দেখেছেন। এই তো সেই যুবক যে দস্যুদুটিকে হত্যা করে আপনার রোগিণীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল!

ভট্টরাইয়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলল যুবতীটির কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি। কেমন যেন শিহরিত হল ভট্টরাই। সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

জাষ্ক হঠাৎ শ্লেষের সঙ্গে বলল, আপনি সেদিন যুবতীটিকে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন—আমায় কিছু জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। এখনও পর্যন্ত আমি এর পরিচয়ের কিছুই জানি না!

একটু রুঢ় স্বরে চরক বললেন, জানাটা তোমার কাজ। তোমার জানা উচিত ছিল বিষ্কের প্রতিনিধির কথা শোনা মাত্রই—এই যুবকটি সম্ভবত তোমায় ঘটনার প্রতিবেদন জানিয়েছিল।

ভট্টরাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, না, আমি নই, অন্য একজন গিয়েছিল।

চরক বললেন, সে যেই হোক। একজন জানিয়েছিল। জাষ্ক নিশ্চয় আশা করেন না যে আমি গিয়ে জানিয়ে আসব। রোগীকে বাঁচানো আমার কাজ। অনুসন্ধান করা তোমার কাজ। যদি কোন অভিযোগ থাকে তবে রাজদ্বারে তা করতে পার।

জাষ্ক জানে, নগরের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য নির্বাহ করতে হলে সম্রাটের প্রত্যক্ষ অনুমোদন চাই। ঐ রক্ষা কবচের মধ্যে রয়েছেন

আচার্য চরকও। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! এ কী বলছেন, আচার্য! যাহোক অযথা বিতর্কের প্রয়োজন নেই, আমি স্বীকার করছি—আগে আসাই উচিত ছিল। সময়াভাবে তা পারিনি। যুবতীটির সম্পর্কে কোনও তথ্য কি আপনি উদ্ধার করতে পেরেছেন?

আচার্য বিরক্ত হলেন। আরোগ্যশালায় কয়েকজন রোগী তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাই তিনি চুপ করে থেকে যুবতীটির ক্ষতে কার্পাস বস্ত্রের বাঁধনটি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন, দেখ, জাষ্ক! মানুষের জীবনই আমার লক্ষ্য। তার ইতিবৃত্তে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। এ পর্যন্ত আমি যা জেনেছি তা হচ্ছে, যুবতীটির নাম কমলিকা। এখন রোগী যথেষ্ট সুস্থ। আশাকরি সে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তার কাছ থেকেই সব জেনে বুঝে নাও। আমার কাজ রয়েছে। আমি আসছি। চরক আরোগ্যশালার দিকে চলে গেলেন।

দাসীরা দুটি কাষ্ঠাসন এনে দিয়েছিল। জাষ্ক তার একটিতে বসে পড়ল। ভট্টরাই আসনে না বসে দাওয়ার ওপর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল।

জাষ্ক প্রশ্ন করলেন, কী তোমার পরিচয়? পুরো ঘটনাটিই বা কী—আমায় বল।

নির্লিপ্ত ভট্টরাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে কমলিকা বলা শুরু করল : আমি চন্দ্রভাগার তীরে বর্ধিষ্ণু অজাতনগরের মণিকার মণিভদ্রের একমাত্র কন্যা। এবার বর্ষায় হঠাৎ অজাতনগরের বাঁধ ভেঙে গিয়ে সারা নগর ও পাশের গ্রামগুলি জলে তলিয়ে যায়। জায়গাটি একটু নিচু হওয়ার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। প্রচুর মানুষ আর গবাদিপশুও মারা যায়। আমাদের বাড়িটা একটি উঁচু টিলার ওপর হওয়াতে আমরা বেঁচে যাই। দুর্ভাগ্যবশত বেশ কয়েকদিন ধরে কোনও ত্রাণ বা উদ্ধারকারীর দল না আসাতে পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। মৃতদেহগুলি পচে মহামারীর সৃষ্টি করে। কারণ, পানীয় জল দূষিত হয়ে গিয়েছিল। চারদিকের অবস্থা লক্ষ্য করে বাবা স্থির করেন, এই নগর পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে বেশ কয়েকবছর সময় নেবে। প্রায় জনমানবহীন এই মৃত্যুপুরীতে অপেক্ষা করে লাভ নেই। দাসদাসীরাও নিজেদের জলমগ্ন গ্রামে পরিবার পরিজনদের দেখতে গিয়ে আর কেউ ফিরে আসেনি। সুতরাং, এই স্থানের মায়া কাটিয়ে পুরুষপুরে নতুন করে ভাগ্যান্বেষণ করাই ভাল।

আমি আর মা প্রশ্ন করেছিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বিশাল নগরে গিয়ে এ বয়সে তুমি কী করতে পারবে? কাউকে জানো না, চেনো না!

বাবা বলেছিলেন, রাজকাজে মহামিশ্র বলে তাঁর এক নিকট আত্মীয় আছে। সে নিশ্চয় সাহায্য করবে। এক সময় সে আমার অন্নেই প্রতিপালিত।

আমরা ভরসা করতে পারিনি। কারণ, উপকারের কথা মানুষ খুব কমই মনে রাখে। যাহোক, বাবাকে আমরা নিরাশ করিনি। কারণ, আমাদের যা সম্পদ আছে তাতে পুরুষপুরে ছোটখাট একটা গৃহ নির্মাণ করে বা ভাড়া দিয়েও কাটিয়ে দিতে পারব।

জাষ্ক প্রশ্ন করলেন, কোন মহামিশ্র?

কমলিকা বলল, আমি জানি না। রাজকাজে একাধিক মহামিশ্র থাকতে পারে। আমি জীবনে তাঁকে দেখিনি। ঐ প্রথমবারই তাঁর কথা শুনলাম।

জাষ্ক বললেন, নগরাধ্যক্ষ হিসাবে আমি বলতে পারি এই নগরে ঐ নামে একটিমাত্র মানুষ রয়েছেন—তিনি সম্রাটের প্রাসাদ মন্ত্রী।

কমলিকা নিরুৎসাহের ভঙ্গীতে বলল, হতে পারে। তবে তো তাঁর পক্ষে আমাকে চেনা আরও কঠিন হয়ে পড়বে! যাহোক, জল একটু নামতে আমরা আমাদের উটবাহী শকটটিতে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিজেরাই বোঝাই করে বেরিয়ে পড়লাম। বাবাই চালক হলেন। তবে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য—তা জানি না, পথে এক সার্থবাহী দলের দেখা পেলাম। দলপতিকে খুবই সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে হল। তিনি বললেন, তাঁর সার্থ পুরুষপুর যাবে না ঠিকই। তাঁরা পুষ্কলাবতী যাবেন। পুরুষপুরের কাছাকাছি তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন। দলপতির এক রক্ষীকে আমার বড় গায়ে পড়া বলে মনে হল। যাহোক, তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আমরা সার্থবাহী দলের সঙ্গে নিরাপদে এগিয়ে চললাম।

বাবা সরল মানুষ। এখানেই তিনি একটা ভুল করে বসলেন। দলপতির কাছে ঐ রক্ষীটির উপস্থিতিতে সুখদুঃখের কথা বলতে বলতে তিনি বলে ফেললেন যে তাঁর সঙ্গে একটি রত্নপূর্ণ পেটিকা রয়েছে। কাজ চালাবার মতো কিছু কার্যাপণ, তাম্র ও স্বর্ণমুদ্রাও রয়েছে। সুতরাং ব্যবসা না করলেও তাঁর চলে যাবে। রত্ন পেটিকায় তাঁর পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত মহামূল্য সব রত্ন রয়েছে। পুরুষপুরের বিকিকিনির হাটে রত্নের কয়েকটিকে বিক্রি করলেই তাঁর জীবন কেটে যাবে।

আমরা বাবাকে যথেষ্ট বকাবকি করলাম এই নির্বুদ্ধিতার জন্য।

বাবা বললেন, দূর! কী হবে? দলপতি আমার মতো কয়েকজনকে কিনে রাখতে পারেন। আমার রত্নপেটিকা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথার কিছু নেই।

আমরা বললাম, তা হয়ত ঠিক। কিন্তু ঐ তৃতীয় জন? দলপতির বংশবদ রক্ষীটি? ওকে আমার ভাল লাগে না।

বাবা বললেন, তাই তো! তা যাকগে। ও! সার্থবাহদের দলের সঙ্গেই চলে যাবে। চিন্তার কী আছে?

সন্ধ্যার সময় আমরা পুরুষপুর আর পুষ্কলাবতীর পথের মিলন স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। দলপতি ভল্লাটক আমাদের অভয় দিয়ে বললেন, আজ রাতটুকু এখানে শিবির ফেলে বিশ্রাম নিন। প্রভাতে যাত্রা করবেন পুরুষপুরের পথে। দন্ড পাঁচেক সময় লাগবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। সম্রাট কণিষ্কের শাসনকাল। দস্যুরা সব গর্তে ঢুকে গেছে!

কথাটায় আমরাও বিশ্বাস করতাম। কোনরকমে শিবির ফেলে, শুকনো খাবার খেয়ে আমরা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লাম। রাত গভীর হল। প্রায় শেষ রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আমি জলের একটা ধাতব পাত্র নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ঢুকলাম। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। ম্লান আলোক রয়েছে। হঠাৎ দেখলাম, তিনজন সশস্ত্র উটারোহী আমাদের শিবিরের সামনে এসে থামল। দু'জন ভেতরে ঢুকে গেল। তৃতীয়জন আমাদের পড়ে থাকা শকটটির ওপর বসে শিবিরের দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তের মধ্যে শিবিরের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। বাবার বয়স হলেও শারীরিক শক্তি ছিল। তিনি দু'জন দস্যুকে রত্নপেটিকাটি দিয়ে প্রহার করে বাইরে এসে চেঁচালেন, কমলি! পালিয়ে যা!

কমলিকার নাম শুনে তৃতীয় দস্যুটি আবার বসে পড়ল। আমার চিনতে ভুল হল না যে ঐ দস্যুটি রক্ষী বাকাটকি। মুহূর্তের মধ্যে আমি পরিস্থিতি বুঝে গেলাম। বাবা-মা আর রত্নপেটিকার জন্য অপেক্ষা করা বৃথা। তাহলে আমাকেও মরতে হবে। শুধু মরণ নয়। তার আগে নিশ্চয় ধর্ষিতা হব তিনজনের দ্বারা। মৃত্যু আর ধর্ষণের ভয়ে আশ্চর্য ভাবে আমার শিথিল স্নায়ুগুলো দৃঢ় হয়ে উঠল। আমি বুকে হেঁটে তৃতীয়জনের অলক্ষে তার পেছনে পৌঁছে ধাতব জলপাত্রটি দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করলাম। চাপা আর্তনাদ করে সে পড়ে গেল। ওদিকের চিৎকার চেঁচামিচিতে দুই দস্যু তৃতীয়জনের আর্তনাদ খেয়াল করল না। অতঃপর আমি আমাদের শকটটিকে দস্যুদের দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি উটের দিকে প্রাণপণে ঠেলে দিলাম। ধাক্কা খেয়ে উটগুলি বিপরীত রাস্তায় ছুটল। সেই অবকাশে আমি বিদ্যুৎবেগে আমার উটটির পিঠে চড়ে বসে তাকে পুরুষপুরের দিকে চালনা করলাম। উটটি আমার অতি প্রিয়। শিশুকাল থেকেই

ওকে আমি লালন-পালন করে আসছি। তাই সেও যেন আমার বিপদের কথা বুঝতে পেরে দুরন্ত বেগে ছুটে চলল। কিছুদূর যাবার পর আমি ভাবলাম, বিপদ বোধহয় এড়াতে পেরেছি। একটু শ্লথ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ঠিক তখনই দেখলাম, দস্যু তিনজন বিভিন্ন ব্যবধানে ছুটে আসছে। আমার অলংকারগুলি বোধহয় তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়েছিল। নচেৎ কেমন করে তারা ভুলে গেল যে তারা তোরণদ্বারের কাছে এসে গেছে। দ্বার তখন সবে খুলছে! তোরণ শীর্ষের দিকে আমার চোখ গেল। দেখলাম ভট্টরাইকে। চিৎকার করলাম, বাঁচাও। আর তখনই একটি তির এসে আমার বাম বাহুমূল বিদ্ধ করল, আমি জ্ঞান হারালাম। তারপরের ইতিবৃত্ত তো আপনাদের জানা! বাবা-মায়ের পরিণতির কথা তো আমি বুঝতে পারছি। জগৎ সংসারে আমি একা হয়ে গেলাম! কমলিকার চোখে জল।

কমলিকার দুঃখে ভট্টরাইও যেন আবিল হয়ে গেল।

জাষ্ক হঠাৎ বললেন, তুমি এমন মহামূল্য রত্নালংকার কি সব সময়ে পরে থাক?

বিরক্ত হয়ে কমলিকা বলল, হ্যাঁ। রত্নালংকারে আমি সব সময় সেজে থাকতে ভালবাসি। এটা আমার শখ বা নেশা।

তোমার পুরুষানুক্রমিক ভাবে সঞ্চিত ঐ রত্নপেটিকাটির জন্য কোনও দুঃখ হচ্ছে না?

বাঁকাভাবে কমলিকা বলল, আমার বাবা-মায়ের দেহ উদ্ধার করে তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া এখনও হল না—আর আমি দুঃখ করতে বসব ঐ রত্নপেটিকার জন্য! আশ্চর্য মানুষ তো আপনি!

জাষ্ক নিজেকে সামলিয়ে বলল, তা নয়। তুমি যখন স্থান নির্দেশ করেছ —তখন কাল সকালেই আমার অনুসন্ধানী দল ওখানে যাবে। মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার হলে গলিত বা শ্বাপদ দ্রংষ্ট যাই হোক না কেন, ওদের অন্তেষ্টিক্রিয়া ওখানেই করা হবে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যত বলে তো একটা কথা আছে— তাই রত্নপেটিকার কথা বলছিলাম। ভবিষ্যতে ওটাই তো তোমাকে বাঁচাবে! শোক দূর হয়ে যায়। কিন্তু রূঢ় বাস্তব পড়ে থাকে। অবশ্য তোমার গায়ে যা অলংকার আছে—তাতে সুখে-আনন্দে জীবন কেটে যাবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখেছ তো—কিছু খোয়া যায়নি?

না-না। মেয়েরা তাদের অলংকার গুণে রাখে। আমার কোনও কিছু খোয়া যায়নি।

জাষ্ক বলল, আমার ভাগ্য ভাল। তুমি আচার্য চরকের আশ্রয়ে এসে পড়েছিলে। নইলে, আমার আবার খাটুনি বাড়ত।

ভট্টরাই জাষ্কের মনোগত ইচ্ছা বুঝতে পারল। জাষ্ক আচার্যকে জড়াতে পারলে খুশি হতেন।

জাষ্কের মনে এখন নতুন ভাবনা। তৃতীয় দস্যুটিকে ধরে রত্নপেটিকাটি হস্তগত করতে হবে। মণিকার পুত্রীর যে এ সম্বন্ধে কোনও মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। এটা তাঁর পক্ষে ভাল। উঠে দাঁড়ালেন জাষ্ক।—আমি আসি। প্রচুর কাজ। তৃতীয় দস্যুটিকে ধরতে হবে।

ভট্টরাই ফিরবে কিনা তা না জেনেই বড় বড় পা ফেলে জাষ্ক প্রবেশ দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল। ভট্টরাই তাঁকে অনুসরণ করতে উদ্যত হতেই বাধা পেল।—না আপনি একটু বসে যান।

ভট্টরাই একদিক দিয়ে কমলিকার প্রতি যেমন এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করছিল, অন্যদিকে তার নিজের মনের এই লোলুপতা তাকে বিব্রত করছিল। কমলিকার আহ্বানে সে খুশি হলেও এক অস্বস্তি নিয়ে বসে পড়ল।—বলুন।

একদিনের জন্যও আসেন নি কেন? আমি প্রতিদিনই ভাবতাম...।

এলে তো আবার পরিচয় দিতে হত। সে বড় লজ্জার। তাই নয়?

না। তা কেন? পরিচয় দিতে হবে কেন? ছুটন্ত অবস্থায় যে মুখ একবার আমি দেখেছি—তা আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। আমি কোন মুখ ভুলি না।

সত্যিই লজ্জা পেল ভট্টরাই।—আমি সাধারণ মানুষ। কোন অজুহাতে নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম?

কেন? মানবিকতা! প্রাণটুকু বাঁচানোর পর সব কর্তব্য শেষ? এই অপরিচিত নগরে এক রূপবতী কন্যা কেমন করে বাঁচবে সে চিন্তা কি নেই?

ভট্টরাই বলল, বিশ্বাস করবেন? এতদিন আমি আপনার অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করেছি।

তবে আসেন নি কেন?

আজই তো রাত-কর্তব্য থেকে বিশ্রাম পেলাম। তাও নগরাধ্যক্ষের কার্যালয়ে প্রায় সারাটা দিন কেটে গেল। তিনি জোর করে নিজের স্বার্থের জন্য আমাকে ধরে না আনলে আজও আসা হত না।

তাহলে নগরাধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। যাহোক আপনি ধরা পড়ে গেছেন। হাসল কমলিকা।

ভট্টরাই ধরা পড়ার অর্থটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে সাধারণ অর্থেই বলল, ধরা তো আপনি আগে পড়ে গেছেন। আমার পথ দেখছিলেন না?

খিলখিল করে হেসে উঠল কমলিকা।— এ বাবা! আপনি মনে রেখেছেন।

আচার্য চরক এসে দাঁড়িয়ে পড়ে আশ্চর্য হলেন। রান্নাঘর থেকে চরক পত্নীও বেরিয়ে এলেন। কমলিকা হাসছে! এখানে আসার পর কমলিকাকে শোক ভুলে আজ প্রথম হাসতে দেখলেন তাঁরা।

চরক-পত্নীর এক দাসী একটি থালিতে কয়েকটি মিষ্টান্ন জাতীয় জিনিস আর পানপাত্র ভরা শীতল জল নিয়ে এল। তিনি বললেন, খাও বাবা। ক্ষিদে নিশ্চয় পেয়েছে।

নিশ্চয়। অস্বীকার করল না ভট্টরাই।—মায়েরাই এসব কথা বুঝতে পারে!

মায়ের প্রসঙ্গে বিষণ্ণ হয়ে গেল কমলিকা। চরক-পত্নী তা লক্ষ করে কমলিকাকে জড়িয়ে ধরলেন, আমি তোমার মা। দুঃখ কিসের? কমলিকা চরক পত্নীর বুকে মাথা রাখল।

আহার শেষ করে ভট্টরাই উঠে দাঁড়াল।—এবার আসি।

কমলিকার হয়ে চরকপত্নীই বললেন, আবার এস অবকাশের দিনে। তুমি এলে মেয়েটা একটু হাসে।

চরক ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। ভট্টরাই চেঁচিয়ে বলল, আচার্য! আমি এলাম।

ঘর থেকেই চরক বলল, এস বাবা!

কমলিকা বলল, সাবধানে যাবেন। আবার আসবেন।

ভট্টরাই জনান্তিকে বলল, নিশ্চয়!

শুক্লপক্ষের চাঁদ আকাশে উঠে পড়েছে। ভট্টরাইয়ের প্রাণে যেন অপার্থিব উল্লাস!

সেদিন প্রভাতে নির্মীয়মান মহাবিহার পরিদর্শন করতে এসেছিলেন বসুমিত্র

আর নাগার্জুন। তাঁরা যখন বিশাল স্তুপ এবং মহাবিহারের স্থাপত্য গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন—যবন স্থপতি এজিসিলাওসকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন অশ্বঘোষ।

এজিসিলাওস বসুমিত্র আর নাগার্জুনকে প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখছেন, আপনারা?

অপূর্ব! সম্রাট—যুবরাজও দেখে গেছেন। তোমার স্থাপত্য, গান্ধার শিল্পীদের অঙ্কন আর খোদাই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

অশ্বঘোষ বললেন, গান্ধারে যবন-রোমক আর ভারতীয় রীতি মিলে যে শিল্পের উদ্ভব হয়েছে—তা অতি সুন্দর।

সংঘরক্ষিত এসে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, একটা আশ্চর্য সুন্দর জিনিস আপনারা দেখেন নি। সেটা হচ্ছে বুদ্ধের ভস্মাধার পেটিকা। সেখানে অন্যান্য কয়েকটি মূর্তির সঙ্গে গান্ধার শিল্পীরা বুদ্ধের একটি কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করেছে। দেখতে অনেকটা যবন দেবতা অ্যাপেলোর মত।

অশ্বঘোষ বললেন, সম্রাটের শিল্পপ্রীতির প্রশংসা করতে হয়। গান্ধারে গান্ধার শিল্প আর মথুরায় মৌর্য-শুঙ্গ ও আধুনিক ভারতীয় কলা মিলিয়ে মথুরা শিল্প! সম্রাটের তরফে বাসিষ্ক এর উৎসাহদাতা।

সামনে বিহারের উদ্যান। সেখানে নানান ফুল, গাছ আর সরোবর। গাছগুলি এখনও যথেষ্ট বেড়ে ছায়াদানকারী হয়ে উঠতে পারেনি। তবে সেখানে ছাদ-দেওয়া বসার আসন ছিল। সকলে এমনি এক ঢাকা দেওয়া স্থানে গিয়ে বসলেন।

অশ্বঘোষ বসুমিত্রকে বললেন, দেখ, আমি এখন পুরুষপুরের অধিবাসী। বুদ্ধ তো সর্বত্রই আছেন। পুরুষপুরেও রয়েছেন। ফলে রয়েছে বহু বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্য। বিপরীতে রয়েছেন অন্যান্য ধর্মালম্বীরা। যেমন, সনাতন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মীরা, নির্গ্রন্থীরা। তবে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এখানে। এই স্তুপ আর মহাবিহার নির্মিত হলে শ্রীবৃদ্ধির মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যাবে। এই সুউচ্চ স্তুপ এদেশে আর কোথায় আছে?

সকলেই বললেন, সে তো নিশ্চয়। যুগযুগান্তর ধরে কণিষ্ক-মহাবিহার মাথা উঁচু করে থাকবে।

অশ্বঘোষ বললেন, কিন্তু একটা প্রশ্ন অনেকদিন ধরেই ভাবাচ্ছে। ভগবান বুদ্ধের কোনও মূর্তির প্রয়োজন আছে কি না? ভগবান বলেছিলেন, প্রতিটি

মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। তিনি তাদের ত্রিপিটক অর্থাৎ সুত্তপিটক, বিনয়পিটক আর অভিধর্মপিটক দিয়েছেন। সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে চর্চা করে অষ্টমার্গের পথে চললে নির্বাণলাভ সম্ভব হবে। তাঁর পূজা বা মূর্তির প্রয়োজন নেই। এইসব বলেই তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দকে বিমুখ করেছিলেন। ঘটনাটি প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বের। কালধর্ম—যুগধর্ম বলেও একটি বস্তু আছে। তা অনেক কিছুকেই পরিবর্তন করে যুগধর্মী করে তোলে। নিরাকারের সাধনা করা কষ্টসাধ্য। তাই দেখুন, ব্রাহ্মণ্যধর্মে নিরাকারের সাধক বা অদ্বৈতবাদীরা থাকলেও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তিরও অভাব নেই। মূর্তি তাদের পূজাপাঠ-ধ্যানকে সহজতর করে তোলে। সম্রাটও পরধর্ম সহিষ্ণু। তিনি সনাতনধর্মী মূর্তি পূজকদের দেবমূর্তিগুলিকে অসম্মান করেন নি। তাঁর মুদ্রাতে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দুঃখ, এ পর্যন্ত মুদ্রাতে বুদ্ধের কোনও মূর্তি নেই! কারণ, বুদ্ধের মূর্তিই নির্মিত হয়নি।

বসুমিত্র, সংঘরক্ষিতেরা প্রশ্ন করলেন, আচার্য আপনি কী বলতে চাইছেন? আপনার বক্তব্য একটু স্পষ্ট করুন।

অশ্বঘোষ বললেন, আমরা যদি বুদ্ধের এবং বোধিসত্ত্বের কোনও মূর্তি প্রচলন করি তা কি ধর্মের বিরুদ্ধে হবে?

সংঘরক্ষিত বললেন, তা না করে আমাদের উপায় কী? মানুষ নিজে থেকে বুদ্ধের মূর্তি রচনায় হাত দিয়েছে।

বসুমিত্র বললেন, কথাটা সত্যি, যেমন ভস্মধারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। কিন্তু এতে একটা অসুবিধা দেখা দেবে।। সার্বজনীন একটি মূর্তি না হলে প্রত্যেকে খুশিমত এক একটি বোধিসত্ত্ব আর বুদ্ধের মূর্তি গড়ে তুলবে।

সকলেই বসুমিত্রকে সমর্থন করলেন।—এই সমস্যার সমাধান আমাদের অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তারও আগে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচশ বছর পর বুদ্ধকে পদ্ম, হস্তি ইত্যাদি প্রতীক দিয়ে পূজা করা আর সম্ভব নয়। বুদ্ধের এক মূর্তির প্রয়োজন—যা মানুষ সনাতনপন্থীদের দেব-দেবীর মত চোখের সামনে দেখতে পাবে।

অশ্বঘোষ বললেন, প্রতিটি জন্মের জন্মকালীন রূপ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধের উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ না থাকায় বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁর মহানির্বাণের পর নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ফলে নানান জটিলতার সৃষ্টি হল। মাত্র একশত বছরের মধ্যেই নানান উপকথা এবং কিংবদন্তী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় ছিল সমস্ত

কিছুকে একটি কেন্দ্রীকতার মধ্যে নিয়ে আসা। বুদ্ধের মহানির্বাণের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম এক সংহতির আয়োজন করা হয়। এর একশ বছর পর বৈশালীতেও একটি সংহতি সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সংহতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেখানে মূলত দুটি ধারার আবির্ভাব ঘটে। এক, স্থবির বা থেরবাদী এবং অন্যটি মহাসংঘিক। থেরবাদীরা বুদ্ধের নিরাকার রূপের পুজারী। তাঁরা অহিংসা এবং ব্যক্তিগত নির্বাণ লাভ করার সাধনাকেই পরমধর্ম বলে মনে করেন। অন্যদিকে মহাসংঘিকরা নিজেদের পূজা বা নিরাকার সাধনার পক্ষপাতী নন। তাঁরা বুদ্ধকে মনুষ্য সমাজের ত্রাণকর্তা বলে মনে করেন। ইনারা বোধিসত্ত্বে বিশ্বাসী—মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। সম্রাট অশোকের সময়েও পাটলিপুত্রে তৃতীয় সংহতি সভা হয়। কিন্তু বৃথা!

বসুমিত্র বললেন, এতো জানা কথা। পাঁচশত বছর পরেও সেই দ্বন্দ্ব একই ভাবে রয়ে গেছে। এই সমস্যা সমাধানের একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্ম আজ যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পৃষ্ঠপোষকরূপে আমরা সম্রাট কণিষ্ককে পেয়েছি। সম্রাট অশোক দক্ষিণের দেশগুলিকে ছুঁতে পেরেছিলেন। আজ বর্হিভারতীয় কুষাণ সাম্রাজ্যের সুবিধাটুকু গ্রহণ করে আমরা উত্তরেও এগিয়ে যেতে পারি। এই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।

সংঘরক্ষিত বললেন, তাহলে আসুন, আমরা আর এক মহাসংহতির আয়োজন করে নানান বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাই।

অশ্বঘোষ বললেন, উত্তম প্রস্তাব। তাহলে মহাবিহারের উদ্বোধনের পরেই আমরা ঐ সংহতি সভা আহ্বান করব সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে। আপনারা প্রস্তুত?

সকলে বললেন, হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।

জাষ্কের প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক নিষ্ঠুরতা, রক্ত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। নগরাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি যে খুব দক্ষ তা নয়। তবে তাঁর এই নিষ্ঠুরতার জন্য অপরাধী-অনপরাধী সবাই শংকিত। তুচ্ছ কারণে বা কারণ ছাড়াই কে যে কখন তাঁর রোষানলে পড়বে তা বলা শক্ত। প্রথমত কারাগারে যে কোন বন্দী পরমভাবে সেবিত হবেই। পরে বিচারকের কাছে মুক্তি পেতেও পারে। তবে জাষ্ক যাদের বিচারকের সামনে উপস্থিত করেন তাদের

মধ্যে মুক্তি পাওয়ার মতো ভাগ্যবান খুব কমই আছে। অবশ্য অপরাধী-নিরাপরাধী গোপনে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভ করতেই পারে। কিন্তু সেরকমই বা ক'জন আছে যে জাষ্কের উচ্চমূল্য চোকাবে? প্রথম প্রথম জাষ্ক এতটা দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না। কিন্তু ক্রমেই তিনি উগ্রতার দিকে পৌঁছচ্ছেন। এর থেকে একটা সত্য বেরিয়ে আসছে : জাষ্ক অর্থলোলুপ হয়ে উঠেছেন। জাষ্কের এই বাঁধন ছাড়া ব্যবহারের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে প্রশাসনে তাঁকে সহায়তা করার মতো কয়েকজন শক্তিশালী মন্ত্রী রয়েছেন। তাঁরা বিষয়গুলি সম্রাট বা মহামিশ্র পর্যন্ত পৌঁছতে দেন না। সম্রাটও পুরুষপুরের এত তুচ্ছ প্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত হন না বা চিন্তা করেন না। তাঁর চিন্তার বিষয় অনেক উচ্চমার্গের। এটিকে সম্রাটের গুণ বলা যাবে না দোষ?

আজও জাষ্ক বন্ধনশালায় এক বন্দীকে যথেচ্ছ সেবা করে নিজের কক্ষে এসে বসে বসে চিন্তা করছিলেন কমলিকার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রত্নপেটিকার কথা। এহেন সম্পদ আয়ত্ব করার জন্য তিনি নিচেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। রত্ন কেনাবেচা হয় এমন সব নগরে আদেশ পাঠিয়েছিলেন যে সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহজনক রত্ন বিক্রি করতে দেখলে যেন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয় অথবা তাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়াও তিনি সার্থবাহকদের দলপতি বণিক ভল্লাটকের কাছ থেকে বাকাটকির বিবরণ লোক মাধ্যমে সংগ্রহ করে আশপাশের জনপদগুলিতে প্রচারও করেছিলেন। বাকাটকিকে তাঁর চাই-ই। এরমধ্যে তিনি আর একটি কাজ করেছিলেন। কমলিকার বক্তব্যের সত্যাসত্য আবিষ্কার করার জন্য তার নির্দেশিত স্থানে লোক প্রেরণ করেছিলেন। তারা কমলিকার বর্ণনা মতো শিবির, শকট ও গলিত দুটি শব উদ্ধার করেছিল। একটি পুরুষ—অপরটি স্ত্রী। সেই গলিত শব কমলিকাকে দেখতে নিষেধ করে অন্তেষ্টি করবেন কি না জানতে চেয়েছিলেন। আচার্য চরকের পরামর্শ মতো কমলিকা অন্তেষ্ঠির অনুমতি দিয়েছিল। জাষ্ক এখানেও ক্ষান্ত হননি। অজাত-নগরে মণিভদ্র সম্পর্কে খবরাখবর নেবার জন্যেও লোক পাঠিয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাই তিনি এখন রত্নপেটিকার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং তা ফেরত দেবার জন্য নয়—অধিকার করতে ভীষণ উদ্‌গ্রীব। আজ তিনি উদাস হয়ে অপেক্ষা করছেন তক্ষশিলা বা সোয়াত নদীর উপত্যকার নগরগুলি থেকে কী সংবাদ আসে তা শোনার জন্য! বাকাটকিকে হাতে না পাওয়ার ক্ষোভ তিনি বন্ধনাগারের বন্দীদের ওপর মেটাচ্ছিলেন।

কমলিকা এখন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু তার যাবার জায়গা কোথায়? এই রূপ-যৌবন নিয়ে সে একাকী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এ সংসারে নারী, বিশেষ করে রূপবতী নারীর একা বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। লোলুপ দৃষ্টি—শ্বাপদ নখদন্ত সবসময় প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবার জন্য। অথচ মনে মনে সে কুণ্ঠিত আচার্য চরকের গলগ্রহ হয়ে থাকাতে। সে যে গলগ্রহ এমন কথা আচার্য বা তাঁর পত্নী ঘূর্ণাক্ষরেও তাকে জানাননি। বরং তাঁরা বলেছেন, তুমি আমাদের কাছে সন্তান হিসাবে থেকে যাও। অবশ্য, আমি তোমার তথাকথিত আত্মীয় মহামিশ্রের কাছে একটা সংবাদ পাঠিয়েছি অনুমানের ওপর নির্ভর করেই। সৌভাগ্যক্রমে তিনিই তোমাদের সেই মহামিশ্র! তিনি স্বীকার করেছেন আত্মীয়তা। সুযোগ পেলেই তিনি একদিন স্বয়ং আসবেন বলেও জানিয়েছেন। এসব দিন দশেক আগেকার কথা। ব্যস্ত মানুষ। দেখা যাক, কবে আসেন।

অপরাহ্নে কমলিকা একাকী কুটীরের দাওয়ায় বসেছিল। সূর্য অস্তগামী। দাসীরা আশ্রমের দেওয়ালগিরিগুলি জ্বালাবার জন্য প্রস্তুত করছে। চরক-গৃহিণী রন্ধনশালা পরিদর্শনে ব্যস্ত। নিজের সংসার, পরিচারক, পরিচারিকা, শিষ্য এবং রোগীদের পথ্য—সে এক বিশাল ব্যাপার! দশ বারোজন পাচক এই কাজে সদা ব্যস্ত। আচার্য এখন রোগী পরিদর্শনে গিয়েছেন শিষ্যদের সঙ্গে। একমাত্র কর্মহীন—সে। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে কমলিকা তাই ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল। ভট্টরাইয়ের কথাও তার মনে পড়ছিল। প্রতিদিনই সে তার পথ চেয়ে বসে থাকে। কে জানে তার বিশ্রামের দিন কবে? সেই যে জাষ্কের সঙ্গে এসেছিল—তারপর থেকে তার আর কোনও সংবাদ নেই। কমলিকা ভাবতে বাধ্য হল, মহামিশ্র যদি সাহায্য না করেন, তবে সে কী করবে? সে কি আচার্যের প্রস্তাব মতো এই সংসারেই থেকে যাবে? কিন্তু চিরকাল তো সে এখানে থাকতে পারবে না। তার বিবাহের বয়স উপস্থিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আচার্যের পছন্দ মতন পাত্রকে বিবাহ করতে হবে। কারণ, তিনি হবেন অভিভাবক। বাবার কাছে যে স্বাধীনতাটুকু সে ভোগ করেছে—তা এখানে পাবার সম্ভাবনা কম। আচার্য উদার কিন্তু প্রাচীন রীতি-নীতিতে বিশ্বাস করেন। এছাড়াও আর একটা বিষয় রয়েছে। অন্য কোন পাত্রকে তো সে চেনেই না। সুতরাং, আচার্যের বিবেচনাই তাকে মানতে হবে। তাঁর বিবেচনার ওপরই নির্ভর করতে হবে। তবে, আচার্য নিশ্চয় চেষ্টা করবেন তার সমমূল্যের পাত্র জোগাড় করতে। ভট্টরাইকে পছন্দ করলেও তাকে তার পতি হিসাবে নিশ্চয় মানতে পারবেন না। শ্রেণিগত পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে সে যদি কারোর ওপর নির্ভর না করে কোনও সুরক্ষিত স্থানে কোনও কর্মের সন্ধান পায়—তাহলে পাত্র

নির্বাচনে তার স্বাধীনতা বজায় থাকবে। নিজের জীবনকে সে নিজেই গড়ে নিতে পারবে। অর্থাভাব খুব একটা বেশি হবে না। তার অলংকারের সামান্য কিছু অংশ বিক্রি করে দিতে পারলেই তার অর্থাভাব মিটে যাবে। ভট্টরাইকে সে ব্যবহার করতে পারে বন্ধুর মতো। মানুষটি সরল এবং বুদ্ধিমান। নিজের ওজন সম্পর্কে সে নিশ্চয় অবহিত। প্রথম আলাপে তো তাই মনে হয়েছে। তবে বিষয়টি যে কঠিন এতে তার কোনও সন্দেহ নেই। পুরুষ বন্ধু হিসাবে জীবনে এই প্রথম আলাপ তার একটি সুদর্শন, সাবলীল যুবকের সঙ্গে। সে তার স্তর হয়ত সহজে ভুলবে না। কিন্তু যৌবনের আকর্ষণে যদি সে নিজে থেকেই স্তর-ভ্রষ্ট হয়? ভট্টরাই যে আকর্ষণীয়—অন্তত তার দেখা যুবাদের মধ্যে তো নিশ্চয়। ভট্টরাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গেলে তাকেও তার স্থানে স্থির হয়ে অবস্থান করতে হবে এক্ষেত্রে। কিন্তু আশ্চর্য! মনের মধ্যে কোন দৃঢ়তা অনুভব করল না সে। একটি মাত্র উপায় যা তার মনে হল, যদি মহামিশ্র তাঁকে অন্য কোনও স্থানে টেনে তুলে নিয়ে যান—তবেই সে হয়ত ভট্টরাইয়ের অধ্যায় বন্ধ করতে পারে। সেক্ষেত্রেও যে একটি অসুবিধা রয়েছে তা ও সে দেখতে পেল। মহামিশ্র তার রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় নন। গ্রাম সম্পর্কিত। বাবার জোর ছিল যে তিনি এক সময়ে ওনাদের পরিবারকে দুঃসময়ে প্রতিপালন করেছিলেন মহামিশ্র কার্যক্ষম না হওয়া পর্যন্ত। জীবনে এই ঋণ কে মনে রাখে—একমাত্র মূর্খেরা ছাড়া? অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে এমনই সব ভূত-ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিল কমলিকা। তার মাথার ওপর থেকে বাবার ছাদ ভেঙে পড়েছে। এখন নিজের বুদ্ধি মতো—চিন্তা মতো নিজের ছাদ নিজেকেই গড়ে নিতে হবে। জীবনের নোঙ্গর নিজেকেই বুঝে শুনে ফেলতে হবে।

এর মধ্যে পড়ন্ত রোদ্দুর মেখে ভট্টরাই যে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল তা কমলিকার খেয়াল হয়নি। ভট্টরাইয়ের কথাতেই তার চমক ভাঙল।—মণিকার পুত্রী! কী ভাবছেন? যদিও জানি, এ জগতে ভাবনার অন্ত নেই।

তুমি! যেন বাঁধ ভাঙা উচ্ছল জলের মতো হয়ে উঠল কমলিকা!

তুমি! এটা কি ঠিক হল মণিকার পুত্রী! ভট্টরাই হাসল, 'আপনি'র ওজনটা কি একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কমলিকা। একটু সামলিয়ে বলল, তুমি ভারি ওজনের যোগ্য নও। তাই...! আমার তো মনে হয় তুমি যথেষ্ট দুর্বল। বৃথা কেন বোঝা বওয়া!

দুজনেই আবার সশব্দে হেসে উঠল। দূর থেকে আবার সবাই আশ্চর্য

হয়ে তাকাল তাদের দুজনের দিকে। এই মেয়েটার এত প্রাণ বিমর্ষতার মধ্যে আটকা পড়েছিল! বাবা-মার অন্ত্যেষ্টির পর থেকেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল সে। চরক আর চরক-পত্নী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও তা দূর করতে পারেননি। আজও ভট্টরাই বোধহয় বসন্ত-বাতাস সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সেই হাওয়ার পরশে দুজনেই কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

তবু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল ভট্টরাই। বলল, আমি সামান্য মানুষ। ভারবহন করেই আমাদের দিনে কাটে। বোঝা বওয়াটা আমাদের উত্তরাধিকার।

কমলিকা যেন ক্ষুদ্ধ হল। এমন কথা বলছ কেন, ভট্টরাই? তুমি যেমন তা তোমার কর্তব্য-স্থানে এবং বাড়িতে। আমার সঙ্গে শুধুমাত্র তো বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এখানে আমরা 'ওজন' নিয়ে কথা নাই বা বললাম। আমার স্পষ্ট কথা, তুমি আর আমি কেউই বোকা নই—অপরিণতও নই। তোমার সঙ্গে দেখা হলে, কথা বললে আমার ভাল লাগে। তাই তোমার পথ চেয়ে থাকি। তোমারও নিশ্চয় ভাল লাগে, নইলে বিশ্রামের দিনে এখানে ছুটে আসতে না। মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি।

অর্থাৎ আমরা আবার পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেছি। বেশ। তুমি আমায় বসতে বল। আমি বসি।

দাঁড়াও। কাষ্ঠাসন এনে দিই।

না। থাক। আমি দাওয়ার অপর তোমার মুখোমুখি বসে তোমার জীবনের কথা শুনতে বেশি পছন্দ করব। দাওয়ায় উঠে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ভট্টরাই কমলিকার মুখোমুখি বসল।—তোমার জীবনের কথা শুরু কর।

কমলিকা বলল, অতীত অতীতই। তা শুনে তোমার মনই কেবল ভারাক্রান্ত হবে—আমারও।

না। তুমি হাল্কা হয়ে যাবে। তোমাকে আমি চিনতে পারব। বুঝতে পারব। মনের দিক দিয়ে আমাদের কী মিল—কী অমিল তাও ধারণা করতে পারব।

কমলিকা হেসে বলল, তার মানে তুমি দেখে নিতে চাইছ—আমার দিকে ভট্টরাই কতটা ঝুঁকে পড়তে পারবে?

মোটেও না। বরং তুমিই ঝুঁকে পড়তে পার। রূপবতী বলে যদি তোমার দম্ভ থাকে—রূপবান বলে আমার দম্ভও কম নয়। তবে আরও একটা জিনিস আমার আছে—সেটা বাস্তববোধ। কল্পনাকে আমি উড়তেই দিই। মাটিতে নামিয়ে আনতে চাই না। তুমি আমার কল্প জগতের পরী, তুমি উড়তেই থাক। কক্ষনো মাটি ছোঁবার চেষ্টা কোরনা।

বিস্মিত ভাবে কমলিকা বলল, তুমি সুন্দর কথা বলত! বেশ, বল কী শুনতে চাও?

জানতে চাই অজাতনগরের মণিকার পুত্রীকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমলিকা বলল, সে আর কী জানবে? চন্দ্রভাগার কুলে এক প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপথ অজাতনগর। কয়েক পুরুষের বাস সেখানে। যদিও সেখান থেকে কিছু দূরে সংকটা ছিল আমাদের গ্রাম। যাতায়াত ছিল। কারণ সেখানে আমাদের বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল। অর্থাৎ ব্যবসা আর ভূসম্পত্তি মিলিয়ে আমরা ছিলাম এক ধনাঢ্য পরিবার। দাসদাসী...। কিছুরই অভাব ছিল না। পড়াশুনা, নৃত্যগীত সবই শিখলাম। নিজেকে সবসময়ে সাজিয়ে রাখার একটা অভ্যাস আমার গড়ে উঠেছিল। রত্নালংকারে নিজেকে সাজাতাম। মা বকাবকি করলেও বাবা প্রশ্রয় দিতেন। তিনি বলতেন, বিয়ে আমি রাজা-মাহারাজার ঘরে দোব। আমি আমার স্বপ্নের রাজপুত্রের পথ চেয়ে থাকতাম। দু একজন সামন্ত প্রভুর ঘরে কথা চালাচালি হচ্ছিল। আমার কিন্তু পছন্দ হচ্ছিল না। আমার প্রত্যাশা বোধহয় আরও বিশাল ছিল।

ভট্টরাই কমলিকার প্রত্যাশার এক গভীর অর্থ করল। তার মনে হল, কমলিকা বোধহয় সাবধান করার জন্যই কথাগুলি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। সে অবশ্য কথাগুলি গায়ে না মেখে স্বাভাবিক স্বরেই বলল, শেষ পর্যন্ত কী হল?

আমার পছন্দ হল না। তারা নারী সঙ্গে যতটা আসক্ত—বীরত্ব কর্মে নয়। পানপাত্রে তাদের যত আসক্তি—তলোয়ারে নয়। তাদের অবয়বে বীরত্ব ব্যঞ্জকতা কিছু নেই। নেই ব্যক্তিত্ব। তারা যেন কেমন পুতুল পুতুল খেলনা। আমি বেঁকে বসলাম। চলল, আমাকে বোঝানোর পালা। আর ঠিক সেই সময় চন্দ্রভাগার কুলে বাঁধ ছাপিয়েও প্রবল জলধারা স্মরণাতীত কালের এক ঘটনা হয়ে দৈত্যকারে ছুটে এল। ভাসিয়ে—ডুবিয়ে দিয়ে গেল সবকিছু! প্রয়োজনীয় মেরামতির অভাবে বিরাটাকার বাঁধটিই ভেঙে পড়েছিল। জল আর শুধু জল! আমরা বেঁচে গেলাম বাড়িটা উঁচু টিলার ওপর হওয়ার জন্য। দাসদাসীরা তাদের পরিবারদের বাঁচাবার জন্য নিজেদের গ্রামে চলে গেল। কিন্তু বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করার পরও আর কেউ ফিরে এল না। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমরা একা! তারপরের ইতিহাস তো তোমার জানা। কমলিকা থামল।

ভট্টরাই বলল, তোমার দুঃখ হয় না ছবির মতো সেই নগরের কথা ভেবে—বিশাল বাড়ি—বিশাল সম্পদ! সর্বোপরি বাবা-মা! তোমার কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়। রাজকন্যা এখন পথের ধুলোয়!

পথের ধুলোয় কেন হব? তুমি কি জানো না মেয়েরা কেন অলংকার সংগ্রহ করে? তা তো ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। দুর্দিন তো সবারই আসতে পারে। মানুষ তার জন্য সঞ্চয় করে। এই অলংকার তো আমাদের সঞ্চয়। কিছু তো রইল—না খেতে পেয়ে মারা যাব না।

মারা গেলেই হল আর কি! ভট্টরাইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় তবে হল কেন?

সন্দিগ্ধ ভাবে কমলিকা বলল, অর্থাৎ—এর মানে?

মানে আর কী? তোমার মহামিশ্র যদি কিছু না করেন তবে আমিই চেষ্টা করব তোমার জন্য। এই মহানগরীতে আমার পরিচিত মানুষের সংখ্যা কী কম? তোমার নিরাপত্তা, তোমার একটি কর্ম—সে আমি জীবন দিয়েও করে দোব। আমার পরীর গায়ে তো আমি দুঃখের ছোঁয়াচ লাগাতে পারি না। তখন হয়ত তোমারই আমার কথা মনে থাকবে না। ভুলে যাবে আমাকে। তা যেও। আমি রাগ করব না।

কমলিকা চোখ বড় বড় করে অপার বিস্ময় নিয়ে ভট্টরাইয়ের দিকে তাকাল।—তুমি আমার জন্য এত করবে? কিন্তু কেন? ক'দিনেরই বা আমাদের পরিচয়? এই তো মাত্র দ্বিতীয় দিন আমরা মুখোমুখি কথা বলছি।

যে আপন হয় সে এক লহমায় হয়। সেদিন প্রভাতে মুহূর্তের জন্য যে মুখ তুলে আমার কাছে বাঁচাবার জন্য আর্তি জানিয়েছিলে—সেই মুখটাই আমার মনে গেঁথে রয়েছে। চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই উট নিয়ে তুমি ছুটে আসছ ভয়ার্ত ভাবে। চোখে তোমার বাঁচবার আর্তি। সুতরাং জানি তোমাকে—বাঁচাবার দায়িত্ব আমারই।

আবার হো-হো করে হাসল কমলিকা।—আশ্চর্য মানুষ তো তুমি?

সত্যিই আশ্চর্য! তোমার সঙ্গে মুখোমুখি আজ দ্বিতীয় দিন কথা বলছি ঠিকই। কিন্তু মনে মনে কদিন বলছি, বলত?

কমলিকা গভীরভাবে তাকাল ভট্টরাইয়ের দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, আমিও!

কমলিকার দৃষ্টির সামনে যেন শিউরে উঠল ভট্টরাই। সে যেন তার সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করতে পারল। নিজেকে শাসন করল সে। ভট্টরাই উন্মাদ নয়। সে তার সামাজিক স্তর ভাল ভাবেই জানে। কমলিকা তার জগতের লোক নয়। সে ধরাছোঁয়ার বাইরে এক পরী। পরীকে কে না ভালবাসে? তাই তো সে ছুটে আসে—ভাবে—কল্পনা করে।

একটু নিস্তব্ধতা ঘনাল। সূর্য অস্ত গেল। দেওয়ালগিরিগুলি জ্বলে উঠল।

ভট্টরাই বলল, তোমার ভাগ্য ভাল। সেদিন আচার্য চরক দৈবাৎ উপস্থিত হয়েছিলেন। নচেৎ, কোনও অঘটন ঘটতে পারত তোমার ঐ অলংকারগুলির জন্য। কোনও লোভী বৈদ্য হয়ত...।

অলংকারগুলি সুন্দর? তোমার পছন্দ হয়?

নিশ্চয়! এই অলংকারের জন্যই তো তুমি আরও ঝলমল করে উঠেছো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়! ভট্টরাই হাসল।

হঠাৎ কমলিকা বলল, তোমার কথা তো কিছু বললে না ভট্টরাই!

কেন? আমি আগে নিশ্চয় বলেছি যে আমরা দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। বেঁচে থাকার দায়ে জীবন হাতে নিয়ে আমাদের জীবিকা অর্জন করতে হয়। আমার ভাই অবশ্য তলোয়ার ভালবাসে না। সে বাণিজ্য বিভাগের এক কর্মী। বাবা ছিলেন সেনা বিভাগের এক সৈনিক। নিম্নসিন্ধু অধিকার করার যুদ্ধে বাবা আহত হয়ে অবসর নেন। তবে আমার ছোটবেলা থেকে তলোয়ার আর ধনুকের নেশা ছিল। বাবার কাছেই শিখেছি। পড়াশোনাও করতাম। কিন্তু অর্থাভাবে শেষ করতে পারিনি—তার আগেই চাকুরির সন্ধানে বার হতে হয়। পেয়েও গেলাম। দায়িত্ব পেলাম তোরণ শীর্ষ পাহারা দেওয়া। আজ বছর দুই সেই কর্তব্যই পালন করে আসছি। তোমার সঙ্গে পরিচয় হবে বলেই এই রকম একটি চাকুরি আমি পেয়েছিলাম!

আর তোমার সঙ্গে এক বিশেষ পরিবেশে সাক্ষাৎ হবে বলেই বোধহয় অজাতনগরের সর্বস্ব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আবার তারা দুজনে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু তাদের হাসি মাঝপথেই থেমে গেল। দেখা গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঠেলে একটি রথ এগিয়ে আসছে। দুজনেই প্রশ্ন করল নিজেদের—কে?

আচার্য চরকের ভুল হল না। তিনি আরোগ্যশালা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এগিয়ে গেলেন।—স্বাগত, মহামিশ্র! আপনি আসবেন আমি জানতাম।

মহামিশ্র রথ থেকে নেমে এগিয়ে এলেন।—সময় পাচ্ছিলাম না। মণিভদ্রের কন্যা তো আমারও কন্যার মতো। কই সে?

আচার্য চরক বললেন, ঐ যে দাওয়ায় বসে আছে। চলুন।

সঙ্গের যুবকটি কে?

ঐ তো ভট্টরাই। ঐ যুবকটিই তো বাঁচিয়েছিল কমলিকাকে।

বা! বেশ চালাক চতুর আর সপ্রতিভ বলে মনে হচ্ছে।

কমলিকা আর ভট্টরাই—দুজনেই বুঝে গিয়েছিল রাজ-অতিথির পরিচয়। দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল অভিবাদন করে।

দাসীরা কাষ্ঠাসন বয়ে নিয়ে এল। আচার্য আর মহামিশ্র বসলেন। সামান্য নীরবতা। তারপরেই তিনি বললেন, তুমিই মণিভদ্রের পুত্রী? মণিভদ্র গ্রামের সুবাদে আমার বড় ভাই। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে প্রচন্ড ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে তোমরা ছিলে ধনী। আমরা দরিদ্র। তাতে অবশ্য সম্পর্কের কোন অবনতি হয়নি। আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন আমার বাবা। হঠাৎই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি মারা গেলেন। আমি তখন যথেষ্ট ছোট। পড়াশুনা করছি। চোখে অন্ধকার দেখলাম। সংবাদ পেয়ে তোমার বাবা ছুটে এলেন। আমাদের সাংসারিক পরিস্থিতি দেখার পর আমার মাকে দুটি প্রস্তাব দিলেন। এক, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে অজাতনগরে গিয়ে বসবাস করি। আমাকে তিনি তাঁর পুরুষানুক্রমিক মণিরত্নের ব্যবসায় নিয়ে নেবেন।

ঐ সব রত্ন-ব্যবসা আমার ভাল লাগে না। আমি চাইছিলাম, পড়াশুনা শেষ করে কোনও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হব। তাই আমি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম প্রস্তাব অস্বীকার করলাম। বললাম ওকাজ আমার মনোমত নয়।

মা বললেন, তাঁর স্বামীর ভিটে তিনি ত্যাগ করে যেতে পারবেন না। আমাদের কপালে দুঃখ থাকলে তুমি আর কী করবে বাবা?

তোমার বাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আর একটি প্রস্তাব রয়েছে কাকিমা।

কী প্রস্তাব, বাবা?

দেখুন, নগরের ব্যবসা ফেলে জমি-জমা দেখার জন্য আমাকে মাঝে মধ্যেই ছুটে আসতে হয়। আমি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছি।

অর্থাৎ? আমার মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

আজ থেকে আমার জমি-জমা মহামিশ্র নিজের মনে করেই ভোগ করুক। সে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে—তখন যেন তা আমাকে ফিরিয়ে দেয়। মাঝে মধ্যে জমির ফসল যদি সে কিছু দিতে চায়—দিতে পারে।

আমার মা হা-হা করে উঠেছিলেন।—এ কী করে হয়, মণি? এতো বিপুল সম্পত্তি!

হোক গে। কারোর কাজে লাগুক। আমার তো বিশাল ব্যবসা রয়েছে। মহামিশ্রকে আমি জানি। সে আমায় ঠকাবে না।

মহামিশ্র আচার্য চরকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ

করিনি। যেদিন আমি পুরুষপুরের প্রশাসনে নিযুক্ত হয়েছিলাম, তার পরের দিনই মণিভদ্রের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে আমি এই নগরে চলে আসি। সে আজ দীর্ঘদিনের ব্যাপার। কমলিকার জন্মও তখন হয়নি। মা বেঁচে থাকা অবধি কিছু যোগাযোগ ছিল। তারপরেই সব শূন্য। আমার ব্যস্ততা তো জানেন, আচার্য! সেদিন আপনার লোকের মুখে শুনলাম মণিভদ্রের কথা, তাঁর নির্মম মৃত্যুর কথা—তাঁর একমাত্র কন্যার অসহায়তার কথা! এখন কমলিকা বল, তোমার কী প্রার্থনা? জলে তুমি পড়ে নেই। আচার্য চরক আছেন। আমি আছি। আশা করি এই যুবকটিও তোমার পাশে আছে। রয়েছে তোমার এই বিপুল অলংকার আর সংকটা গ্রামে বিশাল জমি-জমা। জানি না। সেগুলোর কী অবস্থা। তবে আমার সব মুখস্থ। এক লহমায় আমি তা উদ্ধার করে দোব। এখন বল, তোমাকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দোব? তোমার বাবার উপকার আমি ভুলিনি। তোমার বিবাহের বয়সও হয়ে গেছে। দায়িত্ব নিশ্চয় আমার, তুমি রাজরানি হওয়ার যোগ্য।

একটু চিন্তা করে কমলিকা বলল, আমি নিজে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। আমাকে একটি সুরক্ষিত—নিরাপদ কর্মের সন্ধান করে দিলে বাধিত হব।

কারোরই বুঝতে অসুবিধা হল না যে কমলিকা স্বতন্ত্র থাকতে চায়।

মহামিশ্র বললেন, বেশ। বুঝলাম। কিন্তু তোমার জমির আয় থাকতে কেন তুমি কর্ম প্রত্যাশী হচ্ছ? জমি-জমাগুলো কি বারোভূতে ভোগ করবে?

তা কেন? আচার্যের আশ্রমে দিয়ে দিন। আমি জানি, তাঁর রুগ্ন-মানুষের সেবার জন্য বিপুল বিত্তের প্রয়োজন। কত রোগী স্থানাভাবে ফিরে যায়।

মুগ্ধ হল ভট্টরাই। চরক আপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, ধন্য, ধন্য কমলিকা!

মহামিশ্র উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, তোমাকে আমি যেটুকু বোঝবার তা বুঝেছি। তোমার প্রার্থনা মতো একটি কর্মের সন্ধান তোমায় আমি নিশ্চয় দোব। অবশ্য তুমি যদি তা পছন্দ কর।

তারপর চরককে বললেন, আচার্য, আমি শিঘ্র জমি-জমাগুলো আপনার আশ্রমের নামে পরিবর্তিত করার আদেশ দোব। আপনি নির্ভয়ে আপনার আরোগ্য নিকেতনের শয্যা বাড়ানোর কাজে হাত দিন। আর মহাবিহার উদ্বোধনের দিন কমলিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সুযোগ মতো সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

মহামিশ্র চলেই যাচ্ছিলেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন ভট্টরাইয়ের সামনে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সে চুপচাপই দাঁড়িয়েছিল উচ্চ প্রশাসনিক ব্যক্তিটির সামনে। মহামিশ্রকে এত কাছ থেকে দেখা তার মতো মানুষের সৌভাগ্য!

মহামিশ্র বললেন, তুমি ভট্টরাই?

আজ্ঞে। বিনয়াবনত হয়ে ভট্টরাই বলল।

হঠাৎ আশ্রমে?

আজ্ঞে কমলিকার সঙ্গে দেখা করতে। মণিকার পুত্রী আসতে বলেছিলেন।

কমলিকা বলল, হ্যাঁ, কাকা এখানে গল্পগুজব করার মতো তো কেউ নেই। তাই ওকে আসতে বলেছিলাম। এখানে অন্য সবাই ব্যস্ত!

ও! তা ওর কর্তব্য নেই?

আজ আমার বিশ্রামের দিন। কিছুটা ভীত হয়েই ভট্টরাই বলল। মহামিশ্রের ব্যক্তিত্বের কাছে সে যেন নুইয়ে পড়ছিল কিছুটা।

তুমিই দস্যুদুটিকে হত্যা করে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলে?

আজ্ঞে।

এই কাজে তুমি জীবনে কি উন্নতি করতে পারবে বলে ভাব?

কেন নয়? সোজা হল ভট্টরাই।—যদি কর্তব্যনিষ্ঠ এবং সৎ থাকি তবে একদিন না একদিন নিশ্চয় উন্নতি করব।

তোমার আত্মপ্রত্যয়ের প্রশংসা করি। যাহোক। তোমার একটি পুরস্কার পাওয়া উচিত। তুমি আমার ভাইঝির প্রাণ বাঁচিয়েছ। আচ্ছা আসি। মহামিশ্র রথের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পুরস্কার বলতে তিনি ঠিক কী বলে গেলেন তা কারোরই কোন বোধগম্য হল না।—অর্থ পুরস্কার?

রান্নাঘর থেকে চরক-গৃহিণী বললেন, ভট্টরাই। চলে যেও না।

চরক কক্ষে চলে গেলেন। তারপরেই চরক-গৃহিণী একটি থালিতে কয়েকটি দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন ও একটি পাত্রে পানীয় জল নিয়ে এসে ভট্টরাইকে দিলেন।

ভট্টরাইয়ের ক্ষুধা পেয়েছিল। তাই সে লোকলজ্জা না করে অচিরেই থালি খালি করে পাত্র থেকে জলপান করে নিয়ে কমলিকার দিকে তাকাল।—হাঁ করে কী দেখছ? ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। আচার্য-গৃহিণী সুবিবেচক।

কমলিকা বলল, তোমাকে পছন্দ করেন। তোমার কথা জিজ্ঞেসও করেন।

তোমার হিংসে হচ্ছে কি?

আবার সেই প্রাণখোলা হাসি। তবে নিচু মাত্রায়।

চাঁদ উঠেছিল। ম্লান আলোক ছড়িয়ে পড়েছিল আঙিনায়। কুবা নদীর দিক থেকে বাতাস বইছিল। কমলিকা এক সময়ে বলল, তোমাকে তো যেতে হবে অনেক দূর। কিন্তু যাবে কী করে?

আমার একটা ঘোড়া আছে জানো না? জোর গতিতে ছুটিয়ে যাব। পথঘাট এখন ফাঁকা।

বাঃ। বেশ আছ!

তা কেন? সেদিন তুমিও তো উট ছুটিয়েছিলে।

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কমলিকা।—জানো আমি জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু উষাকালের আলোকে তোমার মুখটা দেখতেই মনে হল, মৃত্যুভয় আর নেই।

আমার বুঝে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। তাইতো তোমায় তিরবিদ্ধ হতে হল।

সে আর কী করবে বল? কপাল! প্রাণে বেঁচে গেছি। তোমার মতো এক বন্ধু পেয়েছি এই নির্বান্ধব পুরীতে। এ কি কম ভাগ্য?

উঠে দাঁড়াল ভট্টরাই।— আসি। প্রভাতেই তোরণের কর্তব্য রয়েছে।

তবে এস। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলল কমলিকা—তবে মহাবিহার উদ্বোধনের দিনে কি দেখা হবে?

বলতে পারছি না। অবসর পেলে নিশ্চয় যাব। মহাবিহার না হোক এখানে তো দেখা পাব।

যাঃ। আবার আমি কি দেখার বস্তু?

ভট্টরাই বলল, পরীরা দেখার বস্তু নিশ্চয়। আমি ছোট বেলায় পরীদের গল্প শুনেছি। কিন্তু দেখিনি। এখন তোমায় দেখতে পাচ্ছি।

যাঃ! লজ্জা পেল কমলিকা।—সাবধানে যেও।

কমলিকার সঙ্গে ভট্টরাইয়ের চোখ মিলল। আবার সেই শিহরণ জাগল তার সারা শরীরে। কমলিকার প্রতিক্রিয়া কিছু ঘটল কি না—তা সে জানবার জন্য পিছু ফিরতে চাইল না। ঘোড়ার দিকে এগাতে এগোতে ভট্টরাই ভাবল, অজাতনগরে সে যদি এই কমলিকাকে তাদের প্রাসাদ বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত—তাহলে কি সে এমন রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারত? না। সময় আর

পরিস্থিতি স্তর ভেঙে মানুষকে কত কাছাকাছি এনে দেয়! তার মনে হল, সহজেই সে চাঁদরূপা কমলিকাকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে। পরক্ষণেই সে নিজেকে ছিঃ-ছিঃ করে উঠল।—এ পাপ! বিশ্বাসহন্তার পাপ!

রাতে শয্যায় শুয়েছিল কমলিকা। পাশের শয্যায় আচার্য চরকের স্ত্রী। ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। ঘুমিয়ে পড়ার কথা কমলিকার। কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। জীবনের বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত রোমন্থন করছিল সে। ভাবছিল চন্দ্রভাগার তীরে সেই সুন্দর নগরের কথা। সেখানকার মানুষজন—বাবা—মা—এক সুন্দর জীবনের কথা। গৃহে নৃত্য—গীত—অঙ্কনের চর্চা। চোখে যৌবনের স্বপ্ন। একজন পুরুষ চাই জীবনে। কিন্তু সে কেমন পুরুষ হবে? তার প্রিয় পুরুষের আকার—ব্যক্তিত্ব তখনও তার কাছে ঝাপসা। ছায়ার মত ভেসে উঠত এক বীরপুরুষের মূর্তি। তার বাবার পছন্দমত কোনও বণিক-সামন্ত সমাজের গোলগাল পাত্রকে তার পছন্দ হয়নি। নানা অছিলায় বাতিল করে দিচ্ছিল। বীরপুরুষের কথা চিন্তা করতে করতে ভট্টরাইয়ের মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দর যুবা। পাথর কঠিন অবয়ব। কোমরে তলোয়ার। হাতে শার্ঙ্গধনু। প্রভাতের অরুণ আলোয় চকিতে তাকে দেখেই যেন সে আশ্বস্ত বোধ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে তিরবিদ্ধ হতে হয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে আততায়ীদের হত্যা করে সে তাকে দ্বিতীয়বার তিরবিদ্ধ হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এখানেই ভট্টরাই তাকে আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। কিন্তু বিধাতার কী পরিহাস! তাদের দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান! মহামিশ্র বললেন, সে নাকি রাজরানি হওয়ার যোগ্য। তাই যদি হয় তবে ভট্টরাইয়ের কুঁড়ে ঘরে তার স্থান কেমন করে হবে? ভট্টরাই আজ নিয়ে দ্বিতীয় দিন তার সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রথম দিনের দেখার পরও সে তার কথা ক্রমাগত ভেবেছে। কেন ভেবেছে? কেনই বা দেখা করতে এল? তার অলংকারের লোভে? মনে হয় না। অন্যদিকে সেই বা কেন প্রতিদিন ভট্টরাইয়ের পথ দেখেছে? কমলিকা নিজেকে সাবধান করল। তার জীবনে ভট্টরাইকে মহামিশ্র নিশ্চয় মেনে নেবেন না। বলতে গেলে এই নগরে তিনিই তার অভিভাবক। অন্তত ক্ষমতার জোরে তাঁর অভিভাবক সেজে বসার বিরুদ্ধে কোন বাধা নেই। মহামিশ্র কণিষ্ক-সাম্রাজ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। সুতরাং, তার কি উচিত নয়

ভট্টরাইকে সাবধান করে দেওয়া? তাকে কামনা করে সে যেন নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে না ফেলে। কিন্তু নিষেধই বা সে করবে কী ভাবে? ভট্টরাইকে যথেষ্ট সংযমী বলে মনে হয়। সে এমন কিছু প্রকাশ করেনি যে তাকে সাবধান করতে হবে। তাছাড়া সে নিজে কী করে অস্বীকার করবে যে ভট্টরাইয়ের বীরমূর্তি তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে! তবু তাকেও কঠোর ভাবে নিজের শিথিলতা বর্জন করতে হবে। ভট্টরাইয়ের জীবন তার ছায়াপাতে নষ্ট হয়ে যাক এ সে চায় না। মনকে শাসন করার চেষ্টা করল কমলিকা। ভট্টরাইকে দেখা না করার জন্য সে বলে দেবে। এতে দুজনেরই কল্যাণ হবে। প্রাথমিক স্তরেই যদি বিষয়টি থেমে যায় তাহলে ভবিষ্যতে কেউ কষ্ট পাবে না।

শয্যায় শুয়ে কমলিকার ঘনঘন পাশ পরিবর্তন লক্ষ করছিলেন চরক-গৃহিণী। আজ ভট্টরাই চলে যাবার পর থেকেই কমলিকার ভাবান্তর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চরক-গৃহিণী আজ বৃদ্ধা সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনিও একদিন না একদিন যৌবনবতী নারী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি একদিন কামনা-বাসনার স্তর পার করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাই তিনি কমলিকাকে বুঝতে পারছিলেন। তিনি কোমল স্বরে বললেন, কমলিকা! ঘুম আসছে না? মন স্থির কর মা। জীবনে চলার পথ বড় নিঃসঙ্গ—কঠিন। এখানে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই চঞ্চল হলে চলে না। যাও। যাও, দাওয়ায় গিয়ে ঘাড়ে, কানে, মুখে জল দিয়ে এস। একটু ঠাণ্ডা হবে। ঘুম এসে যাবে।

কমলিকা বিতর্কে গেল না। উপদেশ মতো বাইরে গেল। নিদ্রা আসুক, সেও তা চাইছিল মনপ্রাণে।

বেশ কদিন গড়িয়ে গেল। ভট্টরাই আর এল না। প্রথমটায় ভাল হয়েছে ভাবলেও শেষের দিকে যেন একটু উতলা হয়ে পড়ল কমলিকা। তার অহংবোধে কোথায় যেন এক সূক্ষ্ম আঘাত লাগল। শেষপর্যন্ত সে ভট্টরাইয়ের ওপর মনে মনে রেগে উঠল। সে যে অবকাশ পায়নি একথাটা তো সে কোন রকমে জানিয়ে যেতেও পারত! উদ্বোধন উৎসবে আজ যোগ দেবে কিনা তাও জানা গেল না। এক প্রচ্ছন্ন অভিমান গ্রাস করল তাকে। উৎসবে যাওয়াটাই তার কাছে বিড়ম্বনাময় হয়ে উঠল। তবু তাকে যেতে হবে। আজই উদ্বোধন উৎসব। মহামিশ্র বলে গেছেন সেদিন—মহাবিহারের উদ্বোধনের সময় তিনি সম্রাটের সঙ্গে সুযোগ বুঝে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

আচার্য চরক তাড়া দিলেন, কই মা! হল!

সাধারণ ভাবেই সাজসজ্জা শেষ করে কমলিকা বেরিয়ে এল আঙিনায়। ঐ সাধারণ সজ্জাতেই—রত্নালংকারে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সে। আচার্যও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, না! মহামিশ্র যথার্থই বলেছেন, তুমি রাজরানি হওয়ার যোগ্য। চরক-গৃহিণী কমলিকার থুতনি ধরে আদর করে চুমু খেলেন। —যাও, মা। আশীর্বাদ করি তুমি তোমার অভিলাষে সফল হও।

আচার্য আর কমলিকা এগিয়ে গিয়ে আশ্রমের অশ্ব-শকটটিতে উঠলেন। চরক চালককে বললেন, চল।

আজ সারা নগর যেন মহাবিহার মুখি। দূর থেকেই সুউচ্চ স্তুপটি চোখে পড়ছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে কমলিকা বলল, ইস! কী বিশাল স্তুপ!

চরক বললেন যুগযুগান্তর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে সম্রাট কণিষ্কের এই মহাস্তুপ। ধন্য সম্রাট কণিষ্ক। একটু থেমে চরক বললেন, মহামিশ্র আজ তোমার সঙ্গে সম্রাটের পরিচয় করিয়ে দেবেন বলে বলেছেন। কিন্তু এই ব্যস্ততার দিনে —এই ভিড়ে তা কতদূর সম্ভব হবে কে জানে! তবে, মহামিশ্র কথার মানুষ। দেখ কী হয়। রাজপ্রাসাদে যদি সম্মানজনক কোন কাজ তিনি তোমাকে দিতে পারেন! রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তার মধ্যেই তোমার থাকাটা ভাল। বাইরে তোমার একাকী নির্ভয়ে বসবাস করাটা কঠিন। তাছাড়া তোমাকে রাজপ্রাসাদেই মানায়। রাজসিক সুখেই তুমি অভ্যস্ত।

কমলিকা বলতে চাইল কেন? আপনার আশ্রমে কি আমি মানিয়ে নিতে পারিনি? মেয়েরা সব পারে। আপনার ওখানেই যদি কোনও কর্ম পেতাম! পরক্ষণেই সে ভাবল, সে আশ্রয় তো ক্ষণিকের হোত। আচার্যকে তার বিয়ের ব্যবস্থা তো করতেই হোত। চিরটা কাল সে ওখানে থাকবার সুযোগ পেত না। তাছাড়া তার মতো রূপসীর ঐখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করাটাও ঠিক হোত না। আচার্যের যুবা শিষ্যেরা রয়েছে। তারা যে প্রলুব্ধ হবে না এমন কথা কে বলতে পারে?

মহাবিহারের দ্বারের কাছাকাছি কমলিকাদের শকটটি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু অজস্র শকটের ভিড় দেখে কমলিকা বলল, এই শকট-অরণ্যে আমাদের শকট কোথায় থাকবে, আচার্য? পরে খুঁজে পাওয়া যাবে তো?

আচার্য বলল, চিন্তা কোর না। দেখ, দ্বারে জাষ্ক রয়েছে। আমাদের মতো অতিথিদের শকট রাখার স্থান নিশ্চয় পৃথক হবে। দেখই না।

মূল প্রবেশদ্বারে প্রহরীদের সঙ্গে সত্যই জাষ্ক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিশিষ্ট

অভ্যাগতরা এবং সম্রাট এ পথেই প্রবেশ করবেন। আচার্য আর কমলিকাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন জাষ্ক। তাঁর মুখে হাসি এক বিরল ঘটনা। হয়ত কমলিকাকে দেখে আর নয়ত সম্রাটের বিশিষ্ট সভাসদ এবং মহামিশ্রের আত্মীয়জ্ঞানে এই সৌভাগ্য।—স্বাগত আচার্য! স্বাগত মণিকার পুত্রী!

কমলিকা জাষ্কের দৃষ্টিতে একটু অস্বস্তি বোধ করল। তাঁর দৃষ্টি কমলিকার কণ্ঠের মণিহারটির দিকে।

শকট থেকে নামামাত্র জাষ্ক চালককে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিয়ে বলল, শকটটি ঐখানে রাখ। ফেরার পথে আচার্য ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে তোমায় খুঁজে নেবে বা তুমি তাঁকে খুঁজে নেবে। তারপরেই সে বিগলিত হয়ে কমলিকাকে বলল, মণিকার পুত্রী! চিন্তা করবেন না। এই নগরাধ্যক্ষের ওপর আস্থা রাখুন। আপনার রত্নপেটিকা আমি উদ্ধার করে দোবই। আপনার পিতামাতার হত্যাকারী দুজন দুর্বৃত্ত তো ইতিমধ্যেই ভট্টরাইয়ের হাতে দন্ড লাভ করেছে। তৃতীয়জনকে আমি খুঁজছি দন্ড দেবার জন্য। সামান্য এক দস্যু ঐ বিপুল ধনভোগ করবে—তা হতেই পারে না। আমি কিসের জন্য আছি?

জাষ্কের দৃষ্টির মধ্যে কমিলকা এক লোলুপতার আভাস পেল—তা তার সৌন্দর্যের জন্য নাকি রত্নালংকারগুলির জন্য—সে বুঝে উঠতে পারল না। তবে কমলিকা জানে যতক্ষণ সে আচার্য চরকের আশ্রয়ে আছে ততক্ষণ কোন বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাই কৃত্রিম হাসি হেসে সে বলল, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনার আশ্বাসে বুক বাঁধছি। তৃতীয়জন যদি ধরা পড়ে আর আমার পেটিকাটি যদি উদ্ধার হয়—তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

স্থপতি এজিসিলাওসের শকটটিকে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাষ্ক।—আপনারা এগোন। আমি যবন স্থপতিটিকে একটু দেখি।

কমলিকা আচার্যের সঙ্গে পাথর-বাঁধানো পথে বিহারের দিকে এগিয়ে গেল। পথের দু-ধারে ছাঁটা ঝোপ। ফুলের গাছ।

মহামিশ্র পথিমধ্যে বোধহয় তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, আচার্য! সম্রাটের আসার সময় হয়ে গেছে। আপনারা ভিতরে গিয়ে আসুন গ্রহণ করুন। আর হ্যাঁ। পিছন দিকে বসবেন যাতে সভাভঙ্গ হলে আপনারা দ্রুত বেরিয়ে এসে এই স্থানটিতেই অপেক্ষা করতে পারেন। সভাগৃহে সম্রাটের সঙ্গে কমলিকার পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ কম। ফেরার পথেই তা হতে পারে। বিশদ কথাবার্তা আমি প্রাসাদে গিয়েই বলব।

চরক বললেন, তাই হবে। আমরা তবে এগোই।

মহামিশ্র দ্রুত প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। অর্থাৎ সম্রাট এসে গেছেন।

কমলিকা ভট্টরাইয়ের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চরককে অনুসরণ করল।—কিন্তু ভট্টরাই কোথায়? এ জনসমুদ্রে কোথায় তাকে পাবে? সে এসেছে কিনা তাই নিয়ে সংশয়। হয়ত বিশ্রাম পায়নি।

চরক লক্ষ করছিলেন কমলিকাকে। এক সময়ে তিনি বললেন, মা, তোমাকে একটা কথা বলব—যদি কিছু মনে না কর।

না—না। বলুন না।

তুমি কি ভট্টরাইকে খুঁজছ?

সলজ্জ ভাবে কমলিকা বলল, হ্যাঁ—না।

আমি জানি। তোমার কল্যাণের জন্য একটি কথা বলি, মনে রেখ। তুমি আর ভট্টরাই সমবয়েসি বলে আমার বিশ্বাস। সে তোমার বন্ধু হতে পারে —কিন্তু ভবিষ্যতে পতি কখনই নয়। আমি তার প্রতি কোনও রকমের অসূয়াপরায়ণ হয়ে কথা বলছি না। তাকেও আমি স্নেহ করি। সে ভদ্র। আচার-পরায়ণ। সুদর্শন। সব গুণই তার রয়েছে। সে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সুতরাং, তার বিরুদ্ধে আমার বলার মতো কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অন্তর রয়েছে। তুমি উচ্চকুলজাতা। রূপসী। তোমার মধ্যে বিশাল এক সম্ভাবনা। রাজপ্রাসাদই তোমার উপযুক্ত স্থান। ভট্টরাইয়ের কুঁড়ে ঘর নয়। আমার বিশ্বাস মহামিশ্র নিশ্চয় তোমাকে রাজপ্রাসাদে এক সম্মানীয় স্থান করে দেবেন। সম্রাট বিপত্নীক এবং রমণী রসিকও নন। তবু জীবনে আশ্চর্য কিছু ঘটনা ঘটে। কে বলতে পারে, তোমার আকর্ষণই সম্রাটকে আবার সংসারমুখী করে তুলবে না? তোমার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হওয়া। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কমলিকা একটু দমে গেল। সে বুঝতে পারল, তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আচার্য ভট্টরাইকে দূরে রাখতে বলছেন। এ বিষয়ে আচার্যকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি তার কল্যাণ কামনাই করছেন।

ভট্টরাই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসবে না—আসবে না চিন্তা করেও শেষপর্যন্ত এক দুর্মদ আকর্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কমলিকার দেহের বিকরিত ঘ্রাণ—তার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা শত চেষ্টা করেও সে মন থেকে দূর করতে পারেনি। যদিও সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন। তবু এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যাওয়াতে সে কমলিকাকে জানিয়ে

আসার সুযোগ পায়নি। জনারণ্যে খোঁজাখুজির পর সে কমলিকাকে আবিষ্কার করল। কিন্তু আচার্যের পাশে নীরব-নিষ্পন্দ হয়ে তাকে বসে থাকতে দেখে হতাশ হল। সে আশা করেছিল যে কমলিকাও তাকে উদ্‌গ্রীব হয়ে খুঁজবে। তাই সে আশাহত হল। নক্ষত্রদের সারিতে কমলিকাকে অচঞ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখে এক অভিমানবোধে আচ্ছন্ন হয়ে সে ধীর পায়ে সভাগৃহের বাইরে চলে গেল। সামনেই উদ্যান। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সে সেদিকেই হাঁটল। তারপর একটি আচ্ছাদনের নীচে বসে পড়ল।

ভট্টরাই দেখল সম্রাট সভাগৃহে প্রবেশ করছেন। সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তাকে একাকী শূন্য উদ্যানে ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকে অবাকও হল। ভট্টরাই মনে মনে বলল, আমি সম্রাটকে দেখতে আসিনি। বুদ্ধবাণীও শুনতে আসিনি। আমি এসেছিলাম কমলিকাকে দেখতে। না। তাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি ঠিকই। কিন্তু, কমলিকার কাছে ছুটে আসতে তার ভাল লাগে। ভাল লাগে তার সান্নিধ্য। কমলিকারও নিশ্চয় লাগে। কিন্তু আজ সে ওরকম নিষ্পন্দ কেন?

সভাগৃহে সম্রাটের নামে প্রচুর জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ভট্টরাই কোন আকর্ষণ বোধ না করে চুপচাপ বসে পড়ল। যাবার সময় কি একবারও অন্তত চোখে চোখ মিলবে না?

সম্রাটকে এই প্রথম দেখল কমলিকা। দীর্ঘদেহী। শালপ্রাংশু চেহারা। কোমরে দীর্ঘ তলোয়ার। মাথায় স্বর্ণখচিত উষ্ণীষ। বলিষ্ঠ বাহু। এই বাহুতেই কত শত্রু নিধন করেছেন তিনি। সেই বাহুর শক্তিতে তিনি ভারত-বর্হিভারতের এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। কঠিন ব্যক্তিত্বময় মুখায়ব। দীপ্ত পদক্ষেপ। এক মুহূর্তেই যেন অভিভূত হয়ে পড়ল সে।—মধ্য বয়সী। হোক। এখনও তিনি বলিষ্ঠ। শত্রুদমনে সক্ষম। এই তো তার স্বপ্নের পুরুষ!

মঞ্চের ওপর সম্রাটকে ঘিরে রয়েছেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতেরা। রয়েছেন অশ্বঘোষ, সংঘরক্ষিত, বসুমিত্র, নাগার্জুন আদি নানান জন। বিশাল সভাগৃহ তাঁদের এবং সম্রাট কণিষ্কের উপস্থিতিতে যেন ঝলমল করছিল। দেওয়াল গাত্রে গান্ধার শিল্পীদের আঁকা—খচিত বুদ্ধজীবন কথা। রঙে—শিল্প সুষমায় তা সমুজ্জ্বল।

বক্তৃতাপর্ব শুরু হল। অশ্বঘোষ উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, বুদ্ধের কাল প্রায় পাঁচশত বছর হল। কিন্তু আজও তিনি জীবন্ত। মানবমুক্তির প্রতীক। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ মৃত্যুকালে তাঁর মূর্তিপূজার অনুমতি চেয়েছিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে নিরাশ করে বলেছিলেন, না, আনন্দ। তার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। আমি তোমাদের সুত্ত পিটক, বিনয় পিটক আর অভিধর্ম পিটক দিয়েছি। জানিয়েছি অষ্টমার্গের পথ। স্বতন্ত্রভাবে সাধনা করে নির্বাণ লাভ কর। আমার মূর্তিপূজার কোনও প্রয়োজন নেই। এর থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধের ধর্মীয় নেতা বা ধর্মগুরু সাজার কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি মূর্তির মধ্যে নয়, মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, প্রতিটি মানুষ সৎ জীবন ধারণ করে পুনর্জন্মের দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্ত হোক—নির্বাণ লাভ করুক। বুদ্ধের থেকে বড় মনুষ্যপ্রেমী আর কে হতে পারে?

বুদ্ধের জীবিত কালে তাঁর ধর্ম স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ ছিল। রাজগৃহ, মল্লরাজ্য, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে সীমিত জনের মধ্যেই তা আটকা পড়েছিল। সম্রাট অশোক এসে সেই দ্বার খুলে দিলেন। সাগর অতিক্রম করল সেই মানবধর্ম। এরপর এসেছেন সম্রাট কণিষ্ক! তিনি সেই ধর্মকে ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বে! হিমালয়ের ক্রোড়ের রাজ্যগুলি থেকে তা ক্রমশ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে চিন থেকে শুরু করে আরও বিস্তৃত আঙিনায় ছড়িয়ে গেল। ধর্মহীন মানুষ ধর্ম কী তা জানল। তারা বিবেকবান হয়ে উঠল। এখানে একটি বিষয় রয়েছে। ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরের বোধ ভারতবাসীর কাছে পরিচিত হলেও অভারতীয়দের কাছে তা সম্পূর্ণ নতুন। যে ধর্মচেতনা ভারতীয়দের কাছে স্বাভাবিক—বর্হিভারতীয়দের কাছে তা স্বাভাবিক ছিল না। বুদ্ধের ভাষা ছিল দেশজ ভাষা, দেশীয় মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু বিদেশীদের কাছে সে ভাষা দুর্বোধ্য। তবু কুষাণ সাম্রাজ্যের কল্যাণে তা কিছু পরিমাণে বোধগম্য হয়েছে। সম্রাট কণিষ্ক কিন্তু এখানে থেমে থাকেননি। তিনি জানেন শিক্ষার পক্ষে মাতৃভাষাই সবচেয়ে উপযুক্ত। তাই দীর্ঘদিন হল তিনি আমাদেরই দুই বৌদ্ধ পন্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ আর ধর্মরক্ষককে চিন দেশে পাঠিয়েছেন। তাঁরা চিনভাষা আয়ত্ত করে ত্রিপিটক চিনা ভাষায় অনুবাদ করার কাজে ব্যস্ত!

একটু হেসে অশ্বঘোষ বললেন, ভগবান বুদ্ধ বলতেন, প্রথম প্রহরের দীপ শিখার সঙ্গে শেষ প্রহরের দীপশিখার অন্তর রয়েছে। ঠিক সেই রকম ভাবেই

ধর্মও বিবর্তিত হয়। জন্মলগ্নে বুদ্ধ যা বলেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত তা লিখিত না হওয়ার জন্য এই দীর্ঘ পাঁচশত বছরে বৌদ্ধধর্মও কালের নিয়ম অনুসারে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। নানান কিংবদন্তী, নানান ধ্যানধারণা, নানান নতুন নতুন আচার আচরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের ধর্ম পরিবর্ধিত হয়েছে। সনাতন ধর্মীরাও এই পরিবর্তনের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। বেদ ছিল মৌখিক। পরে লিপিবদ্ধ হয়। সুতরাং তাদের আদি ভাবনা-চিন্তাও যে উত্তরকালে পরিবর্তিত হয়নি একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন না। স্মৃতির বিভ্রম ঘটাটা স্বাভাবিক। যাহোক সনাতনধর্মীদেরও একদা নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান করা—অনুভব করা কঠিন হয়ে উঠেছিল—বিশেষ করে সাধারণ মানুষদের কাছে। তাই তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা ক্রমে প্রচলিত হয়েছে। আজ আমরা নানান জীব এবং প্রাকৃতিক প্রতীককে বুদ্ধজ্ঞানে পূজা করি। কারণ বুদ্ধের কোনও মূর্তি নেই। আমরা জানিনা তিনি ঠিক কেমন দেখতে ছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁর পূজা করতে মানসিকভাবে অসুবিধা বোধ করছেন। তাই কালের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে বুদ্ধের একটি মূর্তি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আজ যদি বুদ্ধের বা বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি আমাদের চোখের সামনে থাকত তাহলে বুদ্ধকে অনুভব করাটা কি সহজসাধ্য হোত না?

প্রায় সবাই অশ্বঘোষকে সমর্থন জানাল।—হ্যাঁ। বুদ্ধের একটি মূর্তি থাকলে আমাদের বুদ্ধকে উপলব্ধি করতে সুবিধা হয়।

অশ্বঘোষ বললেন, এ বিষয়ে আমরা ভাবনা-চিন্তা করছি। মহাপুরুষদের দেহ লক্ষণ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধরূপ আমাদের স্থির করতে হবে। নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি আমাদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধারই সৃষ্টি করবে। এই সমস্যা এবং কয়েকটি ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা একটি সংহতি সভার আয়োজন করতে চলেছি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং আপনাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রোতারা বলল, আমরা অপেক্ষা করব আপনাদের সিদ্ধান্তের জন্য। বোধিসত্ত্বের এবং বুদ্ধের মূর্তি আমাদের প্রয়োজন।

অশ্বঘোষ তাঁর বক্তব্য শেষ করে বসে পড়লেন। বসুমিত্র উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন।—এবার কুষাণ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ—সম্রাট কণিষ্ক তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

সম্রাট কণিষ্ক উঠে দাঁড়ালেন। চতুর্দিকে এক নীরবতা ঘনাল। গম্ভীর গলায় তিনি আমার প্রিয় প্রজাকুল—আপনারা আজ এই পবিত্র উদ্বোধন-

অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছেন দেখে একজন বুদ্ধপ্রেমী হিসাবে আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছি। যাহোক, যখন আমাকে কুষাণ-শ্রেষ্ঠ বলে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে তখন আমি অন্যান্য কুষাণ নায়কদের উল্লেখ করে কয়েকটি কথাও জানাতে চাই। এই ভারতবর্ষে বহু বিদেশী জাতিই হিন্দুকুশ পর্বতমালা পার হয়ে ঢুকেছিল। যেমন এসেছিল পারসিকরা বা তাদের পরে যবনরা। কালের অমোঘ নিয়মে তাদের হটে যেতে হয়েছে। নতুন শক্তি তাদের স্থান অধিকার করেছে। চিন দেশের অন্তর্গত কান-সু ও নিং-শিয়া প্রদেশের তৃণভূমি অঞ্চলে অন্যান্য নানান উপজাতিদের মধ্যে ইউ-চি নামেও একটি জাতি ছিল। অন্যান্য উপজাতিদের তাড়নায় আমরা পিছু হটতে হটতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হই অক্ষু নদীর উপত্যকা অঞ্চলে। এরপর প্রায় শতাধিক বৎসর আমরা শান্তিতে বসবাস করবার সুযোগ পাই। ফলে আমাদের বিবর্তন ঘটে। আমরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ি। এদের মধ্যে কুষাণরা হয়ে উঠেছিল শক্তিশালী। সম্রাট প্রথম কুজল কদফিস অন্যান্য চারটি শাখাকে একত্রিত করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দেন। শক, পহ্লবদের দমন করে কুজল কদফিস হিন্দুকুশ পার হয়ে ভারতবর্ষে পা রাখেন। এখানেও শক, পহ্লবদের সব খন্ড খন্ড রাজ্য অধিকার করে তাদের সামন্তে পরিণত করেন। স্থাপিত হয় একদা যবন অধিকৃত বল্খ থেকে পঞ্চসিন্ধুর তীর অবধি এক বিশাল সাম্রাজ্য। অন্যদিকে আমি—কুষাণ গোষ্ঠীর অন্য এক নেতা খোটান, কাশগড় ও ইয়ারকন্দ অভিযানে বেরিয়ে চিনাদের পরাজিত করি এবং সন্ধির শর্তানুসারে সম্রাটের এক পুত্রকে প্রতিভূ হিসাবে বল্খের মহাক্ষত্রপ বা প্রশাসকের অধীনে রাখি। অতঃপর আমি পামির মালভূমি পেরিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ি। ক্রমে অধিকার করি কশ্যপপুরা থেকে মথুরা-বারাণসী পর্যন্ত অঞ্চল। দুটি কুষাণ রাজ্য সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। আমরা মধ্য এশিয়ার মানুষ। আমাদের মধ্যে তখনও সেরকম ভাবে কোনও ধর্মীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি—যদিও অক্ষু নদীর উপত্যকায় শত-বৎসরে আমাদের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। আমরা বর্বর যাযাবর জীবন ত্যাগ করে কৃষিজীবি হয়ে উঠি। আমাদের আগে পারস্য সম্রাটেরা এবং যবন গ্রিকেরা এ দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও তারা এদেশকে ভালবাসেনি। এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করেনি। এর একটা কারণ অবশ্যই ছিল। সেটা হচ্ছে, তাদেরও একটি প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু আমাদের তো কিছুই ছিল না। ফলে, আমরা ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। আবার যেহেতু আমরা আমাদের পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে যে কোন দেশকে আঁকড়ে ধরছিলাম সেই মানসিক অবস্থায় ভারতবর্ষকেও আঁকড়ে ধরা

আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়নি। আমরা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলাম। যাহোক, আমাদের গোষ্ঠীপতি প্রথম কুজুল কদফিসকে এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হতে দেখে এবং তাঁকে সনাতনধর্মীদের শৈবধর্মে দীক্ষিত হতে দেখে অদ্ভুত লাগলেও, আশ্চর্য হইনি। ধর্মীয় চেতনা তখনও আমার উপলব্ধির বাইরে। এদিকে প্রথম কুজুল কদফিস মারা গেলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কুজুল কদফিস সিংহাসনে বসলেন। আমি তখন মথুরায় সমান্তরাল সাম্রাজ্য শাসন করছি। সেখানকার শক-নাগবংশীয়েরা পরাজিত এবং আমাদের অধীনস্থ।

দ্বিতীয় কুজুল কদফিস ঘোরতর শৈব ধর্মালম্বী। তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় আমরা দেখি তিনি নিজেকে মহেশ্বর, রাজাতিরাজা এবং সর্বলোকেশ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিভূষিত করেছেন। মথুরায় বসে আমি শক-পহ্লবদেরও লক্ষ করলাম—তারাও এদেশে ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে। এশিয়ার শকস্থান, পার্থিয়া তখন আমাদের অধিকারে। তারা চাইলেও তাদের ফিরে যাবার উপায় ছিল না। এদেশেও তারা আমাদের পদানত। ক্রমে আমার মনে হল, অক্ষু বা আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার জলের চেয়ে সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার জল অনেক শান্তিদায়ক। আমাদের বর্বর রক্তে পরিবর্তন শুরু হল। আমি মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করলাম। বুদ্ধের পদধূলি ধন্য ঐ অঞ্চল। ক্রমে আমি বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। শুনি মহাপন্ডিত অশ্বঘোষের নাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সম্রাটও মারা গেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তারিধারসূত্রে আমি সমগ্র কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে উঠি। রাজধানী স্থাপন করলাম এই পুরুষপুরে। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর পাটলিপুত্রবাসী পণ্ডিত অশ্বঘোষকে নিয়ে এলাম পুরুষপুরে। দীক্ষা নিলাম বৌদ্ধধর্মে। তারপর সকলের পরামর্শে গড়ে তুললাম এই বিশাল স্তুপ আর বিহার। যুগ যুগ ধরে এই সুউচ্চ স্তুপ বুদ্ধের কথাই প্রচার করবে।

কণিষ্ক একটু থামলেন। জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল সভাগৃহ। হাত তুলে ইংগিতে তিনি সবাইকে নীরব হতে বলে আবার বললেন।—এই মহাবিহার আমি বৌদ্ধ মহাসংঘকে দান করলাম। তাঁরা বুদ্ধের নিরন্তর সেবার জন্য এই বিহার ব্যবহার করবেন।

আবার সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি উঠল।

সম্রাটের ভাষণ, ব্যক্তিত্ব কমলিকার মনের ওপর এক অদ্ভুত প্রভাব ফেলল। ভট্টরাইয়ের মূর্তি সম্রাটের ভারে যেন চাপা পড়ে গেল। সে ভাবল, আচার্য চরক সত্য কথাই বলেছেন। ভট্টরাই তাঁর পতি হতে পারে না। তার

স্বপ্নে দেখা বীরপুরুষটি হচ্ছেন সম্রাট কণিষ্ক। হঠাৎ দমে গেল কমলিকা। ভাবল, সম্রাট অনেক দূরের মানুষ। সেখানে সে পৌঁছবে কেমন করে? সে তো এখন অতি সাধারণ। নিজের জীবিকার সন্ধানে তাকে মহামিশ্রের সাহায্য চাইতে হচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল কমলিকা।

সভা ভঙ্গ হয়েছিল। শ্রোতারা সবাই সভা ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চরক তাড়া দিলেন, চল, চল। সম্রাটের যাবার আগেই আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যেতে হবে।

কমলিকার যেন চমক ভাঙল।—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। পা বাড়াল কমলিকা। ভট্টরাই এ মুহূর্তে তার মন থেকে বিদায় নিয়েছে। অচিরেই তারা পথের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করা শুরু করে দিল।

চরক বললেন, ভিড় একটু কমে গেলেই সম্রাট বার হবেন। সত্যিই কমলিকার উদ্বেগ দূর করে সম্রাটকে অশ্বঘোষ, মহামিশ্র এবং দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সম্রাট কথা বলছিলেন অশ্বঘোষের সঙ্গে।—আপনার বুদ্ধচরিত কতদূর লেখা হল?

অশ্বঘোষ বললেন, কিছুদূর এগিয়েছি, সম্রাট। আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তা এদিকে সংহতির বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা রয়েছে। আমরা আপনার অবসর মতো প্রাসাদে এর মধ্যেই যাব। আপনার সহযোগিতা ছাড়া তো আমাদের এগোন সম্ভব নয়।

কণিষ্ক বললেন, যে কোন দিন অপরাহ্নের দিকে চলে আসবেন। আমি প্রস্তুত থাকব। ভুলবেন না, আমিও একজন বুদ্ধপুজারী। হঠাৎ সম্রাট সামনের দিকে তাকালেন।—আচার্য চরক এখানে দাঁড়িয়ে! মঞ্চে দেখলাম না তাঁকে, ভাবছিলাম।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আচার্য আমাদের আপনজন হলেও তিনি এক ব্রাহ্মণ—সনাতনধর্মী। তাই সভাগৃহে ছিলেন। মঞ্চে ওঠেননি। এখানে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হয়ত তাঁর আরোগ্য শালার জন্য...!

সম্রাট এগিয়ে এলেন।—আচার্য!

সম্রাটের জয় হোক! মঞ্চে যেতে পারিনি তাই...।

চরকের কথা শেষ করার আগেই সম্রাট বিস্ময় প্রকাশ করে প্রথা বিরুদ্ধভাবে বললেন, আচার্য! আপনার যে কন্যা আছে—তাতো জানতাম না!

চরক বললেন, এ আমার কন্যা না হলেও কন্যাসমা। চরককে থামতে

হল। মহামিশ্র বাধা দিয়ে বললেন, কন্যাটি আমার আত্মীয়া। এর ইতিবৃত্ত অনেক দীর্ঘ। এর বিষয়ে আমি প্রাসাদে আপনাকে কিছু নিবেদন করতে চাই।

কমলিকা আভূমি নত হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাল। তার হৃদপিণ্ডের গতি এখন যথেষ্ট দ্রুত।.

সম্রাট আবার স্বাভাবিক গতিতে দ্বারপথের দিকে এগিয়ে গেলেন।

উদ্যানে বসে ভট্টরাই সমস্ত ঘটনাটি দেখল। হতাশা তাকে আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরল। নিজেকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হল তার। সে উঠল না। কমলিকাকেও জানাল না তার উপস্থিতির কথা। বরং সে নিজেকেই আবার প্রশ্ন করল, কেন সে ভাববে? ক'দিনের পরিচয়? কেন সে ব্যাকুল হচ্ছে? একি ভালবাসা? কেন এক ঈর্ষায় সে জর্জরিত হচ্ছে? সম্রাটের সঙ্গে কমলিকার আলাপ হয়েছে বলে! আবার সে নিজেকে ধিক্কার দিল, কোথায় সে—আর কোথায় কমলিকা! তার স্পর্ধা হয় কীভাবে? এক ঘটনাচক্রে তাদের সেদিন আলাপ হয়েছিল। বিষয়টি তো এর থেকে বেশি নয়। জীবনের প্রতি বাঁকে এমন কত মানুষের সঙ্গেই তো আলাপ হয়! হাসাহাসি হয়। তা বলে! অনেকটা নির্মেঘ হয়ে উঠল ভট্টরাই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, উঠে দাঁড়াল সে।

আজও শয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল কমলিকা। তবে তার দৃষ্টির সামনে ভট্টরাইয়ের পরিবর্তে সম্রাটের অবয়ব। সম্রাটের চোখে সে বিস্ময়ের ছোঁয়া দেখেছে। মুগ্ধতা! নারী হয়ে কি সে তা চিনতে ভুল করবে?

চরক-গৃহিণী আজও জেগেছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, ভট্টরাই গিয়েছিল কি? এখানেও তো আসেনি।

ভট্টরাই! যেন ঢোঁক গিলল কমলিকা।—কই! দেখিনি তো!

তবে হয়ত যায়নি। যাক। ঘুমোবার চেষ্টা কর।

কমলিকা বলল, চেষ্টা তো করছি! মনে মনে সে ভট্টরাইকেও দেখতে পেল। কেমন যেন করুণ তার মুখ। কমলিকার হঠাৎ কান্না পেল। তুমি আমার সখা হয়ে থাক, ভট্ট। এর বেশি আশা করলে কষ্ট পাবে। আমার রূপ যৌবন—সৌন্দর্য তোমার জন্য নয়—সম্রাটের জন্য!

নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক এক অন্য ধাতের মানুষ। তিনি নারীরত্নে যতটা না আকৃষ্ট তার থেকে বেশি আকৃষ্ট প্রাকৃতিক রত্নে, ক্ষমতায়, অর্থে। স্বভাবগত ভাবে তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। লোককে কষ্ট দিয়ে, অত্যাচার করে—হত্যা করে তিনি আনন্দ পান।

আজ তিনি অলসভাবে বসেছিলেন কার্যালয়ে—নিজের কক্ষে। তাঁর মনে পড়ছিল গতকালের কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল কমলিকার গলার সেই দুর্মূল্য রত্নহারটি। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল কমলিকার কাছ থেকে শোনা রত্নপেটিকাটির কথা। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত কিছু রত্ন! মহার্ঘ নিশ্চয়। আর তা বহন করে বেড়াচ্ছে এক দস্যু! রত্নগুলি যেন ঝিলমিল করে উঠল।—না! স্বখেদে তিনি বললেন, না! ঐ রত্নপেটিকা তাকে উদ্ধার করতেই হবে। ধরতে হবে দস্যুটিকে। কোথায় পালাবে সে? সাম্রাজ্যের যে কোন কোণায় তাঁর হাত ঠিক গিয়ে পৌঁছবে। ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যের সব বড় বড় নগর-গঞ্জে সংবাদ পৌঁছে গেছে। দস্যুটির পরিচয় তিনি সংগ্রহ করেছেন পুষ্কলাবতীর সেই সার্থবাহকের কাছ থেকে। এখন শুধু দস্যুটিকে ধরার অপেক্ষা।

ঝিম লাগছিল জাষ্কের। তিনি ঝিমিয়ে নেবার জন্য চোখ বন্ধ করলেন। হঠাৎ একজন প্রহরী এসে ডাকল, প্রভু!

মুখ বিকৃত করে বিরক্ত জাষ্ক চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন? কী হয়েছে? এত চেঁচাবার কী আছে? দেখছিস না...!

আজ্ঞে! সুমন্ত মণিকার একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন!

কী! মণিকার সুকান্ত...নগরের সবচেয়ে বড় মণিকার? কেন তার দোকান লুঠ হয়েছে না কি?

আজ্ঞে না। তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে একটি নিম্নশ্রেণির লোক একটি দামি পান্না বিক্রি করতে এসেছে।

দামি পান্না! কোথায়? কোথায় সে?

আজ্ঞে তিনি তাকে দোকানে ছল করে বসিয়ে রেখেছেন।

স্বগোতক্তি করলেন জাষ্ক।—একটি মাত্র পান্না! তবে কি ঐ হচ্ছে দস্যু বাকাটকি? পরখ করতে এসেছে? দেখা দরকার। সুকান্তের সন্দেহ হয়েছে অর্থাৎ সন্দেহ-যোগ্য লোক। বিষয়টি নিশ্চয় গুরুতর। দেখাই যাক, পুষ্কলাবতীর সার্থবাহ দলপতি ভল্লাটকের কথা মেলে কিনা। একমাত্র বোকারাই পুরো পেটিকাটি নিয়ে

আসবে। জাষ্ক দেরি না করে তাঁর অশ্ব-শকটে চারজন প্রহরী নিয়ে নগরের মণিরত্নের কেন্দ্রের দিকে ছুটলেন।

মণিকার কয়েকজন খরিদ্দারকে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি দেখাবার ছুঁতো করে বিক্রেতাটিকে বসিয়ে রেখেছিলেন। ক্রেতারা চলে যাবার পর বিক্রেতাটি আর ধৈর্য রাখতে পারল না। বলল, না, আপনি অযথা আমাকে বসিয়ে রেখেছেন। আমি অন্য জায়গায় যাই।

মণিকারের সামনে একটি ছোট কাঠের বেদির ওপর পান্নাটি রাখা ছিল। বিক্রেতাটি তা তুলে নেবার আগেই সুকান্ত সেটি ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। —আরে বোস, বোস! একটু দেখতে দাও। তারপর পান্নাটিকে নিজের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন—একটি মাত্র রত্ন! দাম একশত কার্যাপণের বেশি হবে না।

আমাকে অন্য একজন দুইশত কার্যাপণ দেবে বলেছে। দিন ওটা। আমি উঠি। অনেক হয়েছে।

সুকান্ত বললেন, দেখ! তুমি বলছ বটে, এটা কুড়িয়ে পেয়েছ। কিন্তু কী করে বিশ্বাস করব যে তুমি এটা চুরি করে আনোনি? তাছাড়া বেশি দাম দিয়ে আমরা এমন একটিমাত্র রত্ন ক্রয় করি না। সঙ্গে যদি দশ-কুড়ি-পঞ্চাশটা থাকত তাহলে তোমার সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসা যেত। তোমারও যথেষ্ট থাকত—আমার কিছু। শুধুমাত্র ঐ একটি পান্নার জন্য আমি নগরাধ্যক্ষ জাষ্কের কবলে পড়তে প্রস্তুত নই। তুমি যাও। দুশো কার্যাপণের কথা মিথ্যে কথা। সবাই আমার কথাই বলবে। তুমি বরং সেখানেই যাও।

বিক্রেতাটি এবার ওঠার নাম না করে সুকান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আসলে একটি নয় আমি একটি রত্নপেটিকাই কুড়িয়ে পেয়েছি। অজস্র রত্ন! যদি উচিত মূল্য দেন তবে আমি সবকটাই আপনাকে বিক্রি করতে প্রস্তুত। কী নেই সেই পেটিকায়? পান্না, হিরে, মুক্তো, পোখরাজ...! দেখলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। পুরো জিনিসগুলো আপনার কেনার ক্ষমতা হবে কি না—তাতেও আমার সন্দেহ।

নিঃশব্দে দোকানে পা রেখেছিলেন জাষ্ক। শেষ কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁর আর সন্দেহ ছিল না যে এই সেই দস্যু বাকাটকি।—সুকান্ত! দেখি পান্নাটি! মণিকারের হাত থেকে রত্নটি নিয়ে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করে জাষ্ক বলে উঠলেন, এটি সুবর্ণভূমির পান্না। কোথায় পাওয়া গেল—পুরুষপুরের ধুলোয়?

বিক্রেতাটি এবার পান্নাটি রেখেই পালাবার উদ্যোগ করল। নগরাধ্যক্ষ জাষ্ককে সে চেনে। মণিকারটিই তাকে বোকা বানিয়ে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিল —একথা বুঝতে তার ভুল হল না।

জাষ্ক বিক্রেতাটিকে একটি লাথি মেরে প্রহরীদের বললেন, এটাকে বেঁধে শকটে তোল। কার্যালয়ে গিয়ে একে দেখছি।—তার আগে বল, পেটিকাটি কোথায়?

কিসের পেটিকা? ওসব আমি জানি না।

সুকান্ত বললেন, এই যে বললে, একটি পেটিকা রয়েছে...!

ক্রুদ্ধ মুখে দস্যু বাকাটকি বলল, বিশ্বাসঘাতক। তোকে আমি দেখে নোব। তুই আমায় চিনিস না।

জাষ্ক বাকাটকির গালে তীব্র একটি চড় কষিয়ে বললেন, নিজে বেঁচে থাকলে তো! মৃত্যুদণ্ড তো তোর কম দন্ড হবে। চল।

পথে ভিড় জমে গিয়েছিল। জাষ্ক হুংকার দিলেন, কী চাই? যাও সবাই নিজের কাজে। নইলে সবাইকে ভরে দোব...।

জনতা সভয়ে সরে গেল।

জাষ্কের মনের মধ্যে এক বিশাল উত্তেজনা। তাঁর সন্দেহ নেই যে এই সেই দস্যু বাকাটকি। এর নোংরা হাতে রয়েছে সেই রত্ন-পেটিকাটি...! জাষ্কের ইচ্ছে হল তলোয়ারের এক কোপে সে দস্যুটির হাত দুটি কেটে দেয়। জাষ্ক দ্রুত চিন্তা করছিলেন, দস্যুটিকে সনাক্তকরণ করাতে হবে কমলিকাকে দিয়ে, ভট্টরাই একে দূর থেকে দেখেছিল—তাই চিনতে পারবে না। কিন্তু কমলিকা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হবে। কারণ সে রত্ন-পেটিকাটি দাবি করবে। মহামিশ্রের আত্মীয়া সে। সুতরাং, বিষয়টিকে তখন আর চাপা দেওয়া যাবে না। ব্যাপারটি নিয়ে এখন হৈ চৈ না করাই ভাল।

জাষ্ক দস্যুটিকে ঘাড় ধরে নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন। প্রহরীদের বললেন, আশপাশের কেউ যেন উঁকি ঝুঁকি না দেয়।

প্রহরীদের কাছে জাষ্ক অপরিচিত নয়। তারা যা বোঝবার বুঝে সরে গেল। কথার অবাধ্যতা জাষ্ক সহ্য করবে না—এ তারা জানে।

নিজের আসনে বসে জাষ্ক নির্লিপ্তভাবে বলল, দু-দুটো হত্যা-কান্ডের দায় তোর ওপর। এছাড়াও মণিকার পুত্রীকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিস। তোর মৃত্যুদন্ড কে ঠেকায়? তোর ঘাড়টা বেশ শক্তপোক্ত। জহ্লাদের খড়্গটাকে একটু

ধার দিয়ে নিতে বলব! ভয়ালভাবে হেসে উঠল জাষ্ক! প্রায় মাসখানেক তুই আমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিস। তবু আমি ছিপ ফেলে বসে ছিলাম। আমার ভীষণ ধৈর্য—তা জানিস? তাই বলছি, মরে গেলে পেটিকাটি তো আর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবি না। আমার দিয়ে দে। আমি বরং জহ্লাদকে বলব তোর ঘাড়ে একটু মালিশ করে নিতে—যাতে এক কোপে কাটা যায়। দুতিন কোপ বড় বিশ্রী ব্যাপার—তাই না?

দস্যু বাকাটকির প্রতিরোধ ভেঙে গিয়েছিল। তবু সে বলল, শুধু ঐটুকু কৃপার জন্য দুর্মূল্য রত্ন-পেটিকাটি কেন দোব? কুবার তীরে অনন্তকাল ধরে চাপা থাক। কেউ পাবে না।

জাষ্ক এবার একটু গম্ভীর হলেন, তাহলে তোর কী চাই?

মুক্তি এবং রত্নের ভাগ।

মুক্তি অসম্ভব। আমি চাইলেও মহামিশ্র তা হতে দেবেন না। আর ভাগ? কে কাকে ভাগ দেয়?

বাকাটকি এবার সত্যিই ভেঙে পড়ল।—আমায় বাঁচান। কিছু রত্ন দিলেই আমি আমার দাবি ছেড়ে দোব।

জাষ্ক এবার বিরক্ত হয়ে বলল, রত্ন-রত্ন করছিল কেন? রত্ন নিয়ে তুই কী করবি? গলায় ঝুলিয়ে ঘুরবি? তারপর একটু শান্ত হয়ে বললেন, দেখ, ঐ রত্ন তুই সাম্রাজ্যের কোথায় বিক্রি করতে পারবি না। তোকে বিক্রি করতে দেখলেই সকলে সন্দেহ করবে। কারণ, তোর কীর্তি সবাই জেনে গেছে। তার চেয়ে তোকে আমি বাঁচিয়ে দোব। আর হ্যাঁ। আমি লোক খারাপ নই। তোকে স্মৃতি হিসেবে এই পান্নাটি দিয়ে দোব। তবে বিক্রি করার মতো বোকামি করিস নি। ওটাকে বরং আমার কাছেই নিরাপদে গচ্ছিত রাখতে পারিস। ইচ্ছে হলে একবার দুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিবি। সেটাই বরং ভাল।

তাহলে আমি খাব কী করে? তারচেয়ে বরং মরাই ভাল।

আরে! খাওয়ার জন্য চিন্তা কী? তুই একটা জলজ্যান্ত দস্যু। দস্যুরা কি সব মরে গেছে! দস্যুবৃত্তি করে খাবি।

হতাশ হয়ে বাকাটকি বলল, সেই তো আবার ধরা পড়ার ভয়। আবার জহ্লাদের খড়্গ!

জাষ্ক যেন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসছিলেন। বললেন, শোন। তোকে একটা উপদেশ দিই। তুই এই নগরেই ছোটখাটো দস্যুতা কর। কিন্তু হত্যা করিসনি কাকেও। হত্যা করলে মহা ঝামেলা। এসব করে যা পাবি—আমার

কাছে জমা করে যাবি প্রতি রাত্রে। আমার একটা ভাগ থাকবে—তোর একটা। তোকে হাতে হাতেই তোর ভাগ দিয়ে দোব। কেমন? বেঁচেও থাকবি। ধরাও পড়বি না!

দস্যু বাকাটকি খুব একটা বোকা নয়। সে নগরাধ্যক্ষকে মোটামুটি পরিমাপ করে ফেলেছিল। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে বাঁচতে গেলে নগরাধ্যক্ষের জালের মধ্যেই তাকে থাকতে হবে। বিনয়ের দিক দিয়ে বাকাটকি কম যায়না। এই বিনয়ে নিয়েই সে মণিকারের পরিবারের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল। তাই বিনয়ে গলে গিয়ে বাকাটকি বলল, আপনার তুলনা হয় না। আমি সব শর্তেই রাজি। মানুষ প্রথমে বেঁচে থাকতে চায়। আমিও তাই চাই। একটু থেমে বাকাটকি বলল, তাহলে এবার আমি আসি?

কোথায় যাবি? আমার কি মানসম্মান বলে কিছু নেই? তোকে অত লোকের চোখের সামনে দিয়ে ধরে আনলাম—তা হুট করে ছেড়ে দোব? লোকে বলবেটা কী? শোন, তুই আপাতত বন্ধনাগারে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমো। আমি এখন নানান কাজে ব্যস্ত থাকব। সময় মতো তোকে ডেকে নিয়ে পেটিকাটি উদ্ধার করতে যাব। ওটি উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমি কোন শর্তই মানবো না। বুঝতে পেরেছিস?

বাকাটকির মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

জাষ্ক মিথ্যা কথা বলেননি। নানান অভিযোগ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে করতে মধ্যরাত এগিয়ে এল। তার ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু ঘুমোবার অবকাশ নেই। আসন ছেড়ে উঠে পড়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, প্রহরী!

শশব্যস্ত হয়ে একটি প্রহরী কক্ষে ঢুকে এসে বলল, আজ্ঞা করুন, প্রভু!

সেই বন্দিটি কী করছেরে এখন?

আজ্ঞে, ঘুমোচ্ছে।

যা ওকে এখানে নিয়ে আয়। আর হ্যাঁ। হুং-চাকে বল, শকট প্রস্তুত করতে। আমি একটু বেরুব।

অচিরেই হাই তুলতে তুলতে বাকাটকি উপস্থিত হল জাষ্কের সামনে। জাষ্ক হুংকার ছেড়ে বললেন, হাই তোলা বন্ধ কর। চল, আমরা পেটিকাটি উদ্ধার করতে যাব। কোনও চালাকি করবার চেষ্টা করবি না।

হুং-চা শকটটি প্রস্তুত করে রেখেছিল। জাষ্ক আর বাকাটকি শকটে উঠে বসল। জাষ্ক জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকা প্রহরীদের বললেন, মনে রাখিস,

আমি কোথাও যাইনি। কক্ষে বসে বিশ্রাম করছিলাম।

মনে থাকবে প্রভু। প্রহরীরা বলল।

হুং-চা শকট চালনা শুরু করল।

সামনে হুং-চা-র পাশে বসেছিল বাকাটকি। পেছনের আসনে বসেছিলেন জাষ্ক। তিনি তাঁর তলোয়ার বাকাটকির পিঠে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। নির্জন পথ দিয়ে কুবার দিকে এগিয়ে চলল শকট।

একসময় বাকাটকির নির্দেশ মতো কুবার তীরে একটি নির্দিষ্টস্থানে শকটটিকে দাঁড় করাল হুং-চা।

জাষ্ক বাকাটকিকে প্রশ্ন করলেন, কোথায়?

আজ্ঞে, ঐ গাছটির সামনে বালিতে পোঁতা আছে। আমি যাচ্ছি—নিয়ে আসছি।

জাষ্ক—তলোয়ার না সরিয়েই বললেন, হুঁ হুঁ। হুং-চা, তুই যা। তলোয়ার দিয়ে জায়গাটা খোঁড়। দেখ কিছু পাস কিনা।

বাকাটকির দেখানো জায়গায় সামান্য খোঁড়াখুঁড়ি করতেই পেটিকাটি বেরিয়ে এল।—একটা পেটিকা! দেখব, কী আছে?

না। আমার কাছে নিয়ে আয়। জাষ্ক আদেশ করলেন।

সুবোধ বালকের মতো হুং-চা পেটিকাটি জাষ্কের হাতে তুলে দিল। খুশি মনে হাতে পেটিকাটির ওজন অনুভব করে জাষ্ক আবার হুং-চাকে বললেন, যা কটা নুড়ি পাথর নিয়ে আয়। বাকাটকি যেন আর্তনাদ করে উঠল, নগরাধ্যক্ষ! আমি কি কিছুই পাব না।

চাপা গর্জন করে উঠলেন জাষ্ক।—চুপ! তোর মাথাটাই যে যথাস্থানে পাচ্ছিস এই ঢের। জাষ্ক পেটিকাটির ডালা খুলে ভেতরকার রত্নগুলি সঙ্গে আনা একটি থলির ভেতর ঢেলে নিলেন খুব দক্ষতার সঙ্গে। শব্দ শুনলেও পিঠে ঠেকিয়ে রাখা তলোয়ারের ভয়ে বাকাটকি পেছনে তাকাবার সাহস করল না।

হুং-চা কয়েকটি নুড়ি পাথর নিয়ে উপস্থিত হল। পেটিকাটি বাড়িয়ে দিয়ে জাষ্ক বললেন, পাথরগুলো এতে ভরে ফেলে পেটিকাটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে বালি চাপা দিয়ে আয়।

পেটিকাটি হাতে নিয়ে হুং-চা সবিস্ময়ে বলল, আরে! এটা একদম খালি। কী ছিল এতে? কোথায় গেল?

ক্রূরভাবে জাষ্ক বললেন, হুং-চা! এতে কিছুই ছিল না। এখন শুধু নুড়ি

থাকবে। ঠিক? সভয়ে হুং-চা বলল, ঠিক!

জেনে রাখ। আমরা এই পেটিকাটির খোঁজে এসেছিলাম। কিন্তু খুঁজে পাইনি। ঠিক?

আজ্ঞে, ঠিক!

কাজ শেষ করে হুং-চা আবার শকটটিকে কার্যালয়ের দিকে চালনা করল। তার মনে প্রশ্ন, কী ছিল পেটিকাটিতে? কিন্তু প্রশ্ন করা নিরর্থক।

সেদিন প্রভাতে কমলিকা চরকের আশ্রমের দাওয়ায় উদাস হয়ে বসেছিল। সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর পনেরোটা দিন পার হয়ে গেছে—কিন্তু মহামিশ্রের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এটাই হতাশ করে তুলছিল কমলিকাকে। মহামিশ্র কি ভুলে গেলেন তাকে? কতকাল আর সে আচার্যের গলগ্রহ হয়ে থাকবে? অবশ্য, গলগ্রহ বলে ভাবাটা ভুল। কারণ সে তার বিপুল ভূসম্পত্তি এই আশ্রমের নামে দান করে দিয়েছে। সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। তাও কদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ভূমি সংক্রান্ত বিভাগ থেকে এমনই এক সংবাদ নিয়ে এসেছেন আচার্য। সুতরাং, নিজেকে এই আশ্রম বা আচার্যের গলগ্রহ বলে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু মহামিশ্র কেন আসছেন না? সম্রাট কি সম্মত হন নি? নাও হতে পারেন। কারণ সে শুনেছে, বিপাত্নীক হলেও সম্রাটের কোন নারী-প্রীতি নেই।

অদূরের বৃহৎ এক কুটীর থেকে আচার্যের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। নতুন ছাত্র বা শিষ্যের একটি দল এসেছে। তাদের জ্ঞানদান করছেন আচার্য। আচার্য বলছেন, কোন বৈদ্য যদি তাঁর জ্ঞান এবং বোধশক্তির সাহায্যে রোগীর দেহে প্রবেশ না করতে পারেন—তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হবেন। একজন বৈদ্যকে রোগী সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা বিচার-বিবেচনা করতে হবে। পরিবেশকে লক্ষ করতে হবে যা কিনা রোগীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তারপরেই তিনি চিকিৎসা শুরু করবেন। রোগ নিরাময় করার চেয়েও রোগের পুনরাবৃত্তি রোধ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চরক বলেছেন, আমাদের পরিপাক, পুষ্টি এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনটি 'দোষ'-এর সাহায্যে একটি মানবদেহ পরিচালিত হয়। তা হচ্ছে, বায়ু, কফ, আর পিত্ত। বায়ু হচ্ছে দেহ সঞ্চালন, 'কফ' হচ্ছে পিচ্ছিল করণ ও স্থায়িত্ব,

আর 'পিত্ত' হচ্ছে পরিবর্তিতা। এই 'দোষ'-এর সৃষ্টি হয় মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ করে, 'ধাতু' উৎপন্ন করে। ধাতু হচ্ছে রক্ত, মাংস ও হাড়ের রস। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, একই পরিমাণ খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় 'দোষ' উৎপন্ন করে। তাই একটি দেহ অন্য একটি দেহের তুলনায় পৃথক। কোনও মানুষ হয় দুর্বল, প্রাণ-চঞ্চলতাহীন, অন্যদিকে আর একটি মানুষ —শক্ত—সমর্থ এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর!

মানুষ কখন রোগাক্রান্ত হয়? যখনই শরীরের মধ্যে ত্রিদোষ-এর সমতা বিঘ্নিত হয়—তখনই। এই ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ঔষুধীর প্রয়োগ।

চরক একটু থেমে আবার বলা শুরু করলেন, আমি মগ গোষ্ঠীর এক ব্রাহ্মণ। তবুও শরীরবিদ্যা আমাকে আকর্ষণ করত। যৌবনে আমি শ্মশান-মশানে ঘুরে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখবার চেষ্টা করেছি মানুষের ভিতরকার যন্ত্রপাতি। মানুষের দেহে দাঁত সমেত তিনশত ষাটটি হাড় আছে। একটি হৃৎপিন্ড আছে যা তেরোটি প্রধান নালি দ্বারা রক্ত সঞ্চালন করে। এই নালিগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ক্ষুদ্র-বৃহৎ-সরু-স্থূল সব নালি যা কিন্তু দেহের প্রত্যন্ত প্রান্তে রক্তের সাহায্যে পুষ্টিকে ও বর্জ্যকে বহন করে নিয়ে যায়। প্রধান নালিগুলি প্রতিরুদ্ধ হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কমলিকা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল আচার্য চরকের প্রাথমিক ভাষণ। চরক এবার একটু থেমে বললেন, আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কালেও বিজ্ঞ বৈদ্যের অভাব ছিল না। সেইসব যুগে ছিলেন, আত্রেয়, অগ্নিবেশের মতো আর্য়ুবেদাচার্যরা। তাঁরা চিকিৎসক হিসাবে তাঁদের অভিজ্ঞান সব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমি তা বর্তমানে সংশোধন ও পরিমার্জন দ্বারা যুগোপযোগী করে তুলেছি। লিখেছি আমার আয়ুর্বেদ-সংহিতা। এছাড়াও ছিলেন, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারিত এবং ক্ষারপানি। তাঁরাও প্রত্যেকে এক একটি সংহিতা রচনা করে যান। আয়ুর্বেদ প্রতিদিনই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে তোমাদেরই কেউ হয়ত আমার সংহিতাকেও পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করবে। এভাবে এগিয়ে চলবে আয়ুর্বেদ। মানুষ রোগযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

চারদিক শান্ত। ঠান্ডা বাতাস বইছিল। বরিষ্ঠ শিষ্যের দল আরোগ্য নিকেতনে রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত। নতুন শিষ্যকুলে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে আচার্যের প্রাথমিক ভাষণ শুনছিল।

কমলিকা শুনতে পেল, আচার্য আবার বলা শুরু করেছেন :

আমাদের আয়ুর্বেদে আটটি শাখা রয়েছে।

১। সূত্রস্থান বা সাধারণ নীতি।
২। নিদান স্থান বা রোগবিদ্যা।
৩। বিমানস্থান বা রোগ নির্ণয়।
৪। শরীর স্থান বা শরীর সম্পর্কীয় এবং শরীর ব্যবচ্ছেদ।
৫। ইন্দ্রিয় স্থান বা রোগের গতি নির্দেশক লক্ষণ ও পূর্বাভাষ।
৬। চিকিৎসা স্থান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান।
৭। কল্পস্থান বা ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করণ—সংরক্ষণ।
৮। সিদ্ধিস্থান বা চিকিৎসায় সফলতা।

চরক বোধহয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামতে হল। প্রাঙ্গণে একটি শকট প্রবেশের শব্দে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন মহামিশ্র দেহরক্ষী নিয়ে একটি রথে করে এসেছেন।

ব্যস্ত হয়ে কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন মহামিশ্রকে—স্বাগত! ভাবছিলাম, আজ নয় কাল আপনি নিশ্চয় এসে পড়বেন। এদিকে কমলিকা তো উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। তার ভবিষ্যতের কী করলেন?

মহামিশ্রকে দেখে কমলিকাও এগিয়ে আসছিল। মহামিশ্র বললেন, চলুন ওদিকের কুটীরে। বলছি সব।

কমলিকা ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে আসন এনে দাওয়ার উপর বিছিয়ে দিল। মহামিশ্র আরাম করে বসলেন। তারপর কমলিকা আর চরকের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সম্রাট কমলিকার কাহিনি শুনে ব্যথিত ও লজ্জিত।

লজ্জিত কেন? চরক প্রশ্ন করলেন।

তাঁর সাম্রাজ্যে—তাঁর রাজধানীর অদূরে এই ভয়ানক কান্ড ঘটল—এ লজ্জা তাঁরই। নগরাধ্যক্ষের ওপর তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, অচিরে যদি ঐ দস্যুকে ধরতে এবং রত্নপেটিকাটি যদি উদ্ধার করা না যায় তাহলে সেটি নগরাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে অযোগ্যতাই প্রমাণ করবে। তার ফলাফল ভোগ করতে হবে তাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আমি ভট্টরাইয়ের পুরস্কারের জন্য কিছু বলার আগেই সম্রাট বলেছেন, তরুণ সেনাটির পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হোক।

কমলিকা চুপ করেছিল। চরক বললেন, কিন্তু কমলিকার কী ব্যবস্থা হল? সম্রাট কি কিছু আদেশ দিয়েছেন?

মহামিশ্র হাসিমুখে বললেন, নিশ্চয়! আমি সে জন্যেই তো আজ সাত

সকালে কমলিকাকে নিয়ে যেতে এসেছি। পড়াশুনা জানা গুণী মেয়ে। উপযুক্ত ব্যবস্থা একটা হবেই। পুরো বিষয়টি সম্রাট আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। জানি না কমলিকার ভাগ্যে কী আছে। যদি সম্রাটকে সে তার নিজের প্রতি এবং নতুন করে সাংসারিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে পারে—তবে হয়ত আমরা ওকে সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় দেখতে পাব। ও—হ্যাঁ। আমি বলতে ভুলে গেছি। আপনি হয়ত শুনেছেন, সম্রাটকে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রাসাদে দশ বারোজন অভিজাত কন্যার সমাগম ইতিমধ্যেই ঘটেছে। তারা সম্রাটের নিত্য সেবাকাজে নিযুক্ত। সর্বোপরি দায়িত্ব আমার। প্রাসাদ-রমণী হিসাবে সেও যুক্ত হবে সেই কাজে—আমার দায়িত্বও খানিকটা কমবে। অবশ্য পরিস্থিতি দেখে কমলিকা যদি প্রাসাদ-রমণী রূপে যুক্ত হতে চায়—তবেই। তবু এখানে অসুবিধা আছে। সম্রাট সম্পূর্ণভাবে নারী-বিরূপ হয়ে উঠেছেন। কোনও প্রাসাদ-রমণীকে ধন্য করার জন্য তিনি এযাবৎ কারোর দিকে ফিরেও তাকান নি। অথচ তারা সম্রাটের বৈধ স্ত্রী—এমনকি উপপত্নী হবার সুযোগ পেলেও নিজেদের ধন্যজ্ঞান করবে! পৃথক মর্যাদা লাভ করবে। অভিজাতরা তো আশায় বুক বেঁধে তাঁদের কন্যাদের পাঠাচ্ছেন।

কমলিকা চিন্তা করছিল। মহামিশ্রের প্রস্তাব সে গ্রহণ করবে কি না। সে ভেবে দেখল, ভট্টরাইয়ের ঋণ তো পদোন্নতিতে মিটে যাবে। যাহোক একটা পদোন্নতি তো হচ্ছে। নচেৎ একই পদে তাকে কতকাল পড়ে থাকতে হোত তা কে জানে! সাম্রাজ্যে বর্তমানে যুদ্ধ-বিগ্রহও নেই। তা থাকলে বিভিন্ন পদ খালি হবার সম্ভবনা থাকত।

কমলিকাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে আচার্য প্রশ্ন করলেন, কী মা? কী ভাবছ? মহামিশ্রের প্রস্তাব কি গ্রহণীয় নয়?

কমলিকা বলল, প্রতিযোগী তো শুনলাম অনেকগুলি। আমি সেখানে আমার স্থান করে নিতে পারব?

মহামিশ্র বললেন, তুমি রাজরানি হবার যোগ্য। এতো আগেও বলেছি। শুধু রূপে নয়। তার সঙ্গে গুণেরও প্রয়োজন। তোমার মধ্যে দুটোই আছে। এখন দেখতে হবে তোমার ভাগ্য তোমার সহায়তা করে কি না।

আমি প্রস্তুত। জীবন একটা পরীক্ষা। কোনও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে আমি ভয় পাই না।

তবে চল। তোমার সঙ্গে নেবার মতো কিছু তো নেই। অলংকার যা ছিল তাতো পরেই আছ। পোশাক-আশাক? সে তোমার চিন্তার বিষয় নয়।

কমলিকা ধীর পায়ে এগিয়ে গড় হয়ে চরককে প্রণাম করল। চরক-গৃহিণীও

এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কমলিকা তাঁকে প্রণাম করার আগেই তিনি কমলিকাকে বুকে চেপে ধরলেন। হু-হু করে কেঁদে উঠল কমলিকা।—আবার মা হারালাম!

চরক-গৃহিণী নিজের চোখের জল রোধ করে বললেন, দূর বোকা মেয়ে! আমি তো রইলাম। যখনই মন খারাপ হবে এখানে ঘুরে যাবি। মনে কর, তুই শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিস।

কমলিকা মৃদু প্রতিবাদ করল, দূর! সবই কি এত সহজ? দেখছেন না আমার ভাগ্য! এক কুগ্রহে আমার জন্ম!

চরক বললেন, নিজেকে এভাবে ছোট করতে নেই। জীবন হচ্ছে সংগ্রাম। প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সংগ্রাম। আমাকেই দেখছ না, জীবনে প্রতিকূলতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাকে কম যুদ্ধ করতে হয়েছে? পরিণামে কিছু তো পেয়েছি!

কমলিকা পা বাড়িয়েও থেমে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে ভট্টরাই যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। কমলিকা চরক-গৃহিণীকে বলল, মা। ভট্টরাই যদি এর মধ্যে আসে তাহলে বলবেন, তার সম্ভাব্য পদোন্নতিতে কমলিকা খুশি। এই ছোট্ট পুরুষপুরে একদিন না একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবেই। কমলিকা অকৃতজ্ঞ নয়। ভট্টরাইকে সে মনে রাখবে।

চরক-গৃহিণী বললেন, বলব মা। তবে এখন ভট্টরাইয়ের কথা থাক। তুমি তোমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করতে চলেছ। তুমি বুদ্ধিমতী!

এক সময় মহামিশ্রের রথ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। রথ থেকে সাধারণ পোষাকে এক অপরূপাকে নামতে দেখে প্রহরী-দাসদাসীরা বিস্মিত হল। ইনি কে?

ফিসফিসানি শোনা গেল, মহামিশ্রের আত্মীয়া।

কমলিকা রাজপ্রাসাদ দেখে বিস্ফারিত হল। প্রাসাদে প্রবেশ করে সে আরও বিস্মিত হল! এত উপকরণ—একটি মাত্র মানুষের জন্য!

প্রাসাদের একটি বিশাল কক্ষে প্রবেশ করে মহামিশ্র একটি পরিচারিকাকে আদেশ করলেন, প্রাসাদ-রমণীদের ডেকে আন। পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে একে সমর্পণ করে যাই। সভাগৃহে যাবার সময় হয়ে গেছে।

মহামিশ্র প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেন এই প্রাসাদ, সম্রাটের শতাধিক দেহরক্ষীর তত্ত্বাবধায়ক আর সম্রাটের ব্যক্তিগত সচিব। পদমর্যাদায় এক ক্ষমতাশালী মন্ত্রী।

অচিরেই জনা বারো সুন্দরী যুবতী ঝলমল করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করে কমলিকাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদেরই মধ্যে সত্যা নামে এক যুবতী

তাদের স্বাভাবিক নেত্রী। সে মহামিশ্রকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন?

হ্যাঁ, সত্যা। তোমাদের দলে যোগ দেবার জন্য আরও একজন এসে গেছে। প্রতিযোগীতা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল!

সত্যা বলল, কঠিন নয়, ভন্তে মহামিশ্র। সবই ভাগ্য! এক সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হওয়া কি সকলের ভাগ্যে লেখা থাকে? আর প্রতিযোগীতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যাহোক, বলুন। কী আদেশ?

একে নিয়ে যাও। তোমার ঘরের পাশে যে ঘরটি খালি আছে সেটিতেই কমলিকা থাকবে। এর পোশাক-আশাক পরিবর্তন করিয়ে তোমাদের মতো করে নাও। আমি উঠছি। পরে সাক্ষাৎ হবে। মহামিশ্র রাজসভার পথ ধরলেন।

সত্যা বলল, চল। ওপরে যাই। তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। কাজকর্ম বুঝিয়ে দিই।

প্রাসাদ-রমণীরা প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কমলিকা অবাক হয়ে দেখল, অলিন্দের দুপাশে সার সার কক্ষ। অন্যান্য প্রাসাদ-রমণীদের সত্যা বলল, সম্রাটের ঘর গোছানো শুরু করেছে দাসীরা। তোরা দেখ। সম্রাটের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন কর। আমি কমলিকাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। প্রাসাদ-রমণীরা কাজে চলে গেলে সত্যা একটি কক্ষে প্রবেশ করতে করতে কমলিকাকে বলল, পাশের কক্ষটি আমার।

কমলিকা কক্ষে ঢুকে দেখল, নতুন নতুন পোষাক-আশাক আনলায় বু'লছে। ঘরটি ছবির মতো সুন্দর।

ঘরের ভেতরেই স্নানঘর। সত্যা বলল, স্নানঘরে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে পোশাক-আশাক পালটে নে। তারপর তোর কথা শুনব'খন। অলিন্দ দিয়ে সোজা চলে গেলে সম্রাটের ঘর। আমরা এখন ঐখানেই থাকব কিছুক্ষণ। দেরি করিসনি। সত্যা চলে গেল।

কমলিকার ভাল লাগল সত্যাকে। অন্য মেয়েগুলি যেন কিছুটা দাম্ভিক। তাদের চোখে-মুখে এক ঈর্ষার ছবি ফুটে উঠেছে।

সম্রাটের মন্ত্রীমন্ডলী মিশ্রিত জনের। সেখানে যেমন ভারতীয়রা রয়েছেন তেমন অ-ভারতীয়রাও রয়েছেন। বল্খের প্রতিনিধিরাও স্থান পেয়েছেন। বর্হি-সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ। সব সময় হিন্দুকুশ পেরিয়ে দুই অংশের মধ্যে মানুষজনের চলাচল অব্যাহত। এছাড়াও অজস্র সার্থবাহের দল হিন্দুকুশের গিরিপথ পেরিয়ে দুই অংশের মধ্যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। চিনা

পশমের পথটি এসেছে ইয়ারকন্দ, কাশগড় ও খোটানের মধ্যদিয়ে। বল্খের মধ্যে দিয়ে তার একটি শাখা চলে গেছে পার্থিয়া হয়ে রোমের দিকে। অপর একটি শাখা প্রবেশ করেছে ভারতে। তাই রোমের সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক ব্যবসায়িক নিবিড়তা। অফুরন্ত ভারতীয় পণ্যসম্ভার চলে সেই রেশম পথ বেয়ে।

অন্যদিকে নিম্নসিন্ধুর বন্দরগুলি দিয়েও ভারতীয়পণ্য ছড়িয়ে পড়ে মিশর, রোম এবং এশিয়া-ইউরোপের অন্যান্য অংশে। এই রেশম-পথ আর নিম্নসিন্ধুর বন্দরগুলিই কুষাণ সাম্রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ—বিপুল উন্নতির কারণ। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সম্রাট দ্বিতীয় কুজুল কদফিস তাই নিম্নসিন্ধুর বন্দরগুলিকে নিজ অধিকারে আনেন। পহ্লব আর শক গোষ্ঠীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। সাম্রাজ্যের আর একটি অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছে মথুরা। সেখানকার নাগ ও শক বংশীয়রাও সম্রাটের পতাকা তলে। পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে মথুরা। গান্ধার শিল্পের মতো, মৌর্য, শুঙ্গ ও ভারতের আদি শিল্পকলার সংমিশ্রণে সেখানে মথুরার শিল্প নামে নতুন এক শিল্পকলারও সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাটপুত্র বাসিস্ক তার পৃষ্ঠপোষক।

আজকের সভায় জানা গেল, সিন্ধুর বন্দরগুলিতে এক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। গূঢ়পুরুষরা নির্ভয়ে ব্যক্ত করল, এই অসন্তোষের জন্য সেখানকার প্রশাসনিক অধিকারীরাই মূলত দায়ী। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত। শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার খুব খারাপ। কাজের মাত্রাও বেশি করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরাও ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! এখনই এর প্রতিকার করা প্রয়োজন। বন্দরগুলি আপনার সাম্রাজ্যের উন্নতির কারণ। এই অরাজকতা সেখানে চলতে দেওয়া যায় না। নচেৎ, ভবিষ্যত বিদ্রোহের কথাও আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। সম্রাট অশোকের সময় তক্ষশিলায় এইভাবে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহ হতে যাচ্ছিল উজ্জয়িনীতে।

সম্রাট বললেন, মহামিশ্র সঠিক কথাই বলেছেন। সাম্রাজ্যের আর্থিক স্বার্থে আমাদের উচিত হবে এই অসন্তোষ অবিলম্বে দূর করা। এর জন্য আমি চাই মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবল আজই সিন্ধুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করুক। সমস্ত বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিক। এর ফলে তারা প্রয়োজন মতো যে কোনও আধিকারিক বা শ্রমিককে স্থানান্তরেও পাঠাতে পারে। আমি চাই শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হোক।

মন্ত্রী ইউনাস বললেন, সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য। আমরা আজই সিন্ধুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

এরপর কয়েকটি আবেদনের বিচার হল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্রাট আবেদনকারীকে মুক্তি দিলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় দণ্ড বহাল রইল। এক সময় সভা সেদিনের মতো ভঙ্গ হল।

সম্রাট মহামিশ্র আর অঙ্গরক্ষকদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরে চললেন। প্রাসাদের সিংহ দ্বারে অঙ্গরক্ষকেরা থেমে গেল। সম্রাট মহামিশ্রকে নিয়েই প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

বন্ধনাগারে একটি অপরাধীকে সেবা করে আসার পর নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক নিজের কক্ষে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলেন। নিয়মিত বন্ধনাগারের সেবা তাকে প্রফুল্ল করে তোলে। আর তখনই তার চিন্তাশক্তি বেড়ে যায়। আকাশ-পাতাল চিন্তায় তিনি ডুবে যান। আজও চিন্তা করতে করতে তিনি রত্নঘাটে এসে ঠেকলেন। ভাবছিলেন বিপুল রত্ন তো তিনি করায়ত্ব করলেন। এরপর? রত্নগুলি মণিকার সুকান্তের সাহায্যে নানান স্থানে বিক্রি করে বিপুল অর্থও তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। তারপর কর্মত্যাগ করে রাজসুখে বাকি জীবনটা কাটাতেও পারেন। কিন্তু সেই রাজসিক সুখ তো কৃত্রিম। তিনি প্রকৃত রাজসুখ ভোগ করতে চান। কণিষ্কের চেয়ে তিনি কম কিসে? একই ইউ-চি রক্ত তাঁরও শরীরে বয়ে চলেছে। অসহ্য এই কুষাণ-কুল। এদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতেই হবে। কুষাণ আধিপত্য তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী? ভাবলেন, তাঁর নিজের গোষ্ঠীর এবং অনুগত মানুষজন এই পুরুষপুরে কম নেই। তাদের সাহায্য নিয়ে তিনি কি অধিকার করতে পারবেন না এই পুরুষপুরের রাজ সিংহাসন? তিনি জানেন, কুষাণ ছাড়া অন্য চারটি গোষ্ঠীর অনেক মানুষ কণিষ্কের এই বুদ্ধ-ভজনা এবং তাঁর নিস্তেজ হয়ে পড়ার বিষয়টিকে সমর্থন করছে না। তাদের অনেকেই সনাতনধর্মীদের শৈব শাখার অনুরাগী। স্বভাবতই বৌদ্ধদের সঙ্গে তাদের বিবাদ রয়েছে। সম্রাটের ভয়ে তারা কিছু করতে পারে না।

জাষ্ক তার থলি থেকে একটি হীরক বার করে চোখের সামনে ধরলেন। হীরকটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। মনে মনে তিনি বললেন, তাঁর হাতে এখন প্রভূত ধন। একে তাঁর ভাগ্য গড়ার কাজে লাগাতে হবে। কণিষ্ক এখন অকর্মা। তাকে পুরুষপুর থেরে দূর করতে

হবে। বাসিষ্ককে বলে দেওয়া হবে, পিতাকে সাহায্য করতে সিন্ধুতীরে এলে তারও জীবন বিপন্ন হবে। সে যেন মথুরা নিয়েই আপাতত সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু জাষ্ক শেষ পর্যন্ত আকাশ-কুসুম কল্পনা ছেড়ে বাস্তবের মুখোমুখি হল।—না! এ তার একার কাজ নয়। কোনও বলিষ্ঠ সাহায্যের প্রয়োজন। কণিষ্কের বিরুদ্ধে উত্থান ঘটাতে গেলে তার মিত্রের প্রয়োজন। কে বা কারা সেই মিত্র হবার উপযুক্ত? অন্য দিকে তিনি যদি কুষাণদের ভারতীয় সাম্রাজ্য অধিকার করেন—তাহলে বল্খের প্রশাসক হিউ-পিনান কি চুপ করে বসে থাকবেন? হোক না তিনি তাঁর গোষ্ঠীর লোক—তাঁর নিকট আত্মীয়। সাম্রাজ্য অধিকারের সময় কোনও সম্পর্কই বিবেচ্য হয়না। বরং তিনি হিউ-পিনানকে তাঁর দলভুক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন। দীর্ঘকাল প্রশাসক থাকতে থাকতে তাঁরও নিশ্চয় ঘেন্না ধরে গেছে। হিউ-পিনান আজকালের মধ্যে পুরুষপুরে আসছেন। কৌশলে তাঁকে জয় করতে হবে।

সাম্রাজ্যের নানান অংশের প্রশাসক বা উর্ধতন রাজপুরুষদের সম্রাটের সভায় আনাগোনা এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই জাষ্ক কারোকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নগর তোরণে ছোটেন না। কিন্তু আজ হিউ-পিনানের আগমনে তাঁকে নগর তোরণে দেখা গেল।

অঙ্গরক্ষকদের নিয়ে হিউ-পিনান সবে তোরণে প্রবেশ করছেন—জাষ্ক ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলেন। কিন্তু সবায়ের মুখের ছবি দেখে তাঁর সম্বিত ফিরল। কাজটা ঠিক হয়নি। সম্রাট বর্তমানে—সম্রাটের নগরে এক প্রাদেশিকের নামে জয়ধ্বনি! হিউ-পিনানও ব্যাপারটি বুঝতে পেরে জাষ্ককে ডাকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ জাষ্ক! আবেগ সংযত কর। আমাকে সম্মান কর—তা স্বতন্ত্র কথা!

জাষ্ক হেঁ হেঁ করে বলল, মাথার ঠিক ছিল না, প্রাদেশিক! অনেক দিন পর দেখা হল তো! হাজার হোক আমাদের শরীরে একই গোষ্ঠীর রক্ত বইছে। আপনাকে দেখে আনন্দ হচ্ছিল!

হিউ-পিনান সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালেন জাষ্কের দিকে।—এসব আবার কী

বলছ! রক্ত! আমাদের সকলের মধ্যেই তো সেই আদি ইউ-চিদেরই রক্ত বইছে! গোষ্ঠী...এসব ঠিক সংগত কথা নয়।

জাষ্ক একটু দমে গেলেন। বুঝতে পারলেন না হিউ-পিনান সম্রাটের পক্ষে? নাকি জনসমক্ষে এই সমস্ত কথা বলছেন? রাজনীতিক তো!

জাষ্ক বললেন, ক'দিন থাকছেন পুরুষপুরে?

হিউ-পিনান বললেন, ঠিক নেই। দু-তিন দিন হতে পারে। আসলে পার্থিয়া আর কাশগড়কে নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। একদিকে পহ্লবেরা অন্যদিকে চৈনিকরা। তাই সম্রাটের সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। চিঠিপত্রে তো এসব আলোচনা হয় না।

জাষ্ক বললেন, সে তো নিশ্চয়। সম্মুখ ছাড়া কোনও আলোচনাই সিদ্ধ হয় না। যাক, সম্রাট নিশ্চয় আপনার সম্মানে নৈশভোজ দেবেন। তা ঠিক আছে, আগামীকাল রাত্রে আমার কার্যালয়ে একবার পদধূলি দিলে ধন্য হব। জানেন তো ঐটিই আমার গৃহ। নগরাধ্যক্ষর ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই।

হিউ-পিনান হাসলেন, তা বটে—তা বটে। তা কি তোমারও কিছু আলোচনা আছে?

হ্যাঁ, প্রাদেশিক। আমি স্থান পরিবর্তন করতে চাই। এই পদে আর থাকতে চাই না। আপনিই তো আমার সব। তাই প্রথমে আপনার সঙ্গে...

চিন্তা কোর না। হিউ-পিনানের রথ এগিয়ে গেল।

জাষ্ক হিউ-পিনানের রথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভাবলেন, এই হিউ-পিনানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এই নগরাধ্যক্ষর পদটি লাভ করেছিলেন। হিউ-পিনানই তাঁর সপক্ষে সম্রাটকে প্রভাবিত করেছিলেন। এবার পুরুষপুরের অধিপতি হবার জন্য এই হিউ-পিনানেরই সাহায্য নিতে হবে।

অদূরে বিষ্কের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ভট্টরাই। কর্মজীবনে তাঁর সদ্য উন্নতি ঘটেছে। সহকারী তোরণরক্ষীর পদটি দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়েছিল। বিষ্কের ক্রমাগত আবেদনে শেষ পর্যন্ত সম্রাটের সহমতিতে মহামিশ্র সাড়া দিলেন। বিষ্ককে তিনি একদিন প্রাসাদে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে পাঠালেন।

মহামিশ্রের আহ্বানে সাধারণ কর্মচারিদের ভয় পাবারই কথা। বিষ্ক তাই ভয়ে ভয়ে একদিন উপস্থিত হলেন প্রাসাদে।—আজ্ঞে!

বিষ্ককে বসতে বলে মহামিশ্র সরাসরি প্রশ্ন করলেন, তোমার সহকারীর পদটি খালি রয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদি পূরণ না করি...!

সে আপনার ইচ্ছা। যত দুরূহ-ই হোক না কেন, আমি উভয় পদের দায়িত্ব পালন করে যাব।

বেশ খুশি হলাম। এবার বল, ভট্টরাই ছেলেটি কেমন?

অতীব কর্মনিষ্ঠ। সপ্রতিভ। দক্ষ যোদ্ধা।

কী করে জানলে, সে অতীব দক্ষ? কোনও যুদ্ধে তো সে যায়নি!

আজ্ঞে তা নয়। প্রভাত-কর্তব্যের সময় সে অন্যদের সঙ্গে নিয়মিত অস্ত্রাভ্যাস করে। তোরণদ্বারে ধনুক এবং তলোয়ারে সেই সেরা। তার পিতাও অবসরপ্রাপ্ত এক সেনানী। জানেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ জানি। এবার বল, তুমি ভট্টরাইকে তোমার সহকারী হিসাবে পেলে খুশি হবে কি না? নাকি তাকে স্থানান্তরে পাঠাব?

না। আমাকেই দিন ওকে। আমি খুশি হব।

বেশ। এবার তুমি আসতে পার। তোমার কথা আমি বিবেচনা করব।

দু-একদিন পরেই সম্রাটের আদেশনামায় মহামিশ্র সাক্ষর করে পাঠালেন। ভট্টরাইয়ের পদোন্নতিতে তোরণের সবাই খুশি হয়ে উঠল। প্রায় সকলেই এই প্রাণচঞ্চল তরুণটিকে পছন্দ করে। ভট্টরাই নিজে শুধু অবাক হল। বিষ্ক তাকে আগে কিছুই জানাননি। তবে ভট্টরাই বুঝতে পারল, মহামিশ্র কমলিকাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতি মতো পুরস্কার দিয়েছেন। মহামিশ্রের ওপর শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠল। কিন্তু সে হঠাৎ ভাবল, কমলিকা কি জানে? নিশ্চয় জানে। তাকে কি সে ধন্যবাদ জানাবে? না। অর্থহীন হবে। কমলিকা বহু দূরে সরে গেছে। এ বরং ভালই হল। মাঝে সত্যিই সে কমলিকার চিন্তায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। মহাবিহার উদ্বোধনের দিনই সে সম্বিত ফিরে পায়। প্রাসাদ কর্মচারিদের সূত্রে সে জেনেছে, কমলিকা এখন অন্যতম প্রাসাদ-রমণী। তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে। নিজের কাজ নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকতে চায়।

বিষ্ক ভট্টরাইকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে তার কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন—কী ভাবছ?

না। কিছু নয়।

জাষ্কের জয়ধ্বনি শুনেছ?

হ্যাঁ। ওটা তৈলমর্দন। একই গোষ্ঠীভুক্ত কিনা। শুনেছি হিউ-পিনানের জন্যই জাষ্ক নগরাধ্যক্ষের পদটা পেয়েছে।

বিষ্ক বললেন, ঠিকই শুনেছ। ঐ দেখ জাষ্ক এদিকেই আসছে।

সত্যিই জাষ্ক তার ঘোড়া নিয়ে বিষ্ক আর ভট্টরাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন।—কেমন আছ বিষ্ক! সহকারী পেয়ে পরিশ্রম নিশ্চয় কমেছে!

বিষ্ক হেসে বললেন, নিশ্চয়। আপনিও মহামিশ্রের কাছে সহকারীর জন্য আবেদন করুন না। তিনি নিশ্চয় দেবেন। তবে একটা কথা, সেনাবাহিনীর কেউই আপনার সহকারী হতে চাইবে না বলে আমার বিশ্বাস।

কেন? কেন? আমি কি খারাপ লোক?

সে কথা বলিনি। আপনি এত কর্তব্যপরায়ণ যে তাদের তা সহ্য হবে না। কাজ ফাঁকি দেবার ফন্দী আর কি!

তা ঠিক বলেছ বিষ্ক। অলস কাউকে আমি চাই না।

হ্যাঁ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। বিষ্ক বললেন।

জাষ্কের আর বলার মতো কোন কথা হয়ত ছিল না। তাই তিনি বললেন, আসি, অনেক কাজ পড়ে। যতসব চোর-বদমায়েস নিয়ে আমার কাজ! জাষ্ক ঘোড়া ছোটালেন।

বিষ্ক অপসৃয়মাণ জাষ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, জাষ্ক যে ভাবে হিউ-পিনানের নামে জয়ধ্বনি করলেন—তা সম্রাটের কানে গেলে তিনি হয়ত রুষ্ট হবেন।

হতেই পারেন। গূঢ়পুরুষের অভাব নেই! তারা নিশ্চয় বিষয়টি সম্রাটের কানে তুলবে।

বিষ্ক হঠাৎ প্রশ্ন করল, জাষ্ককে তোমার কেমন মানুষ বলে মনে হয়?

কেন? একথা তো সবাই জানে যে জাষ্ক এক লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মাধ্যক্ষ। পুরুষপুরে তো তার প্রশংসা কেউই করে না।

বিষ্ক বললেন, জাষ্কের নিশীথ রাত্রের গতিবিধি সন্দেহজনক।

কেন?

একটা গোপন কথা বলি। কদিন আগের এক রাত্রে জাষ্ক কুবা নদীর তীরে গিয়েছিল। সম্ভবত কিছু খোঁজাখুঁজি করছিল। কুবা নদী বেয়ে এক জেলের নৌকো তখন উজানে যাচ্ছিল। আকাশে চাঁদ ছিল। ওরা তিনজন ছিল। দূর থেকে সে সবাইকে চিনতে না পারলেও জাষ্ক যে তাঁর শকটের ওপর বসেছিলেন অন্য এক আরোহীর সঙ্গে—এবিষয়ে সে নিশ্চিত। পুরুষপুর ছাড়াও আশপাশ অঞ্চলের মানুষজন জাষ্কের ছায়া দেখেও চিনে নিতে পারবে। তৃতীয় ব্যক্তিটি একটি গাছের তলায় সম্ভবত কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করছিল।

ভট্টরাইয়ের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—কমলিকার সেই রত্ন পেটিকার সন্ধান করছিলেন না তো? নিশ্চয় তাই। জাষ্ক ছাড়া দুজনের একজন নিশ্চয় তাঁর শকট চালক। আর তৃতীয়জন সেই পলাতক দস্যু। এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। বিষয়টি মহামিশ্রের কানে তুলে দিলে হয় না?

বিষ্ক বললেন, না। আরও কিছু অপেক্ষা করা যাক। দেখা যাক, নগরাধ্যক্ষ কী করেন। মণিকার পুত্রী তো এখন প্রাসাদে অবস্থান করছেন। পেটিকা সম্পর্কে তার খুব একটা যে মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। মণিকার পুত্রীর মন খুব বড়। সারা পুরুষপুর জেনে গেছে যে তিনি তাঁর বিশাল ভূসম্পত্তিও আচার্য চরকের আশ্রমকে দান করেছেন।

ভট্টরাই স্বগোতক্তি করল, হ্যাঁ, খুবই ভালমানুষ মণিকার পুত্রী। আমার সঙ্গে তার সাবলীল ব্যবহারেই তা বুঝেছি। তবে নগরাধ্যক্ষের ওপরে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি দস্যুটিকে আশ্রয় দিয়েছেন। রত্নগুলিও নিশ্চয় তাঁর হস্তগত হয়েছে। গূঢ়পুরুষেরা তো তার ওপর অলক্ষে নজর রাখতে পারে।

বিষ্ক হতাশ স্বরে বললেন, যতক্ষণ না আমরা কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারছি ততক্ষণ আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষত জাষ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ!

ভট্টরাই বলল, আমরাই পারতাম—কিন্তু সময় কোথায়?

বিষ্ক বললেন, দূর! সারাদিন ধরে একাজ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? তার চেয়ে প্রাথমিক ভাবে আমরা তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারি। আমার সন্ধানে একজন ভিক্ষুক রয়েছে। সে দিনের বেলায় নগরের নানান স্থানে ভিক্ষা করে বেড়ায়। রাতে তার আস্তানায় ফিরে আসে। নগর-কার্যালয়ের বিপরীতে নানান গাছপালায় ঢাকা যে স্থানটুকু রয়েছে—ওখানেই একটি চালা বানিয়ে সে আজ অনেক বছর ধরে বাস করছে। তার চালা থেকে নগর-কার্যালয়ের প্রবেশ দ্বারটি স্পষ্ট দেখা যায়। আশা করি অর্থের বিনিময়ে রাত্রে সে ঐ প্রবেশ পথের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারবে। তার চাহিদা মতো সামান্য অর্থের জোগান আমরা দুজনে নিশ্চয় দিতে পারি।

ভট্টরাই বলল, তাই করা যাক।

বিষ্ক বললেন, ঠিক আছে। পরে বাকিটুকু আলোচনা করা যাবে। সার্থবাহের দল নগরে প্রবেশ করার জন্য সার দিয়েছে। শুল্ক বিভাগের কর্মীরাও এসে গেছে। চল, ওদিকটা দেখি।

শুল্ক বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে সার্থবাহ দলের একটা বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ক আর ভট্টরাই দ্রুত সেদিকে পা বাড়াল। এমন তর্ক-বিতর্ক সবসময়ে লেগে থাকে। কারণ, কিছু অসাধু শুল্ককর্মীদের জবরদস্তি।

কণিষ্ক রাতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে কিছুটা অবাক হলেন। সম্প্রতি প্রাসাদ-রমণীরাই তাঁর শয্যাকক্ষের দায়িত্বে রয়েছে। তারাই দাসীদের সাহায্যে পরিষ্কার করায় ঘর। কিন্তু সাজায় নিজেরা। আজকের সজ্জার সঙ্গে যেন দূর অতীতের এক সুগন্ধ মিশে রয়েছে। তাঁর মনে পড়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের সেইসব দিনের কথা। এই শয্যায় তিনি একদিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করতেন। অনেক সুখময় রাত তিনি কাটিয়েছেন এই শয্যায়। তখন সম্রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁর কক্ষসজ্জা করাতেন। তারপর এখন অনেক বছর পার হয়ে গেছে। সেসব স্মৃতিও এখন ধূসর হয়ে এসেছে। এখন তিনি একাকী-ই শয্যায় যান। একাই জেগে ওঠেন। সেবার অবশ্য কোনও কমতি নেই। পরিচারিকারা ছাড়া প্রাসাদ-রমণীরা রয়েছে। তারা সম্রাটকে খুশি করার জন্য সর্বদা উদগ্রীব। আহার থেকে শয়ন—সব সময় তারা উপস্থিত। কিন্তু রাত্রে সম্রাটের কক্ষে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কণিষ্ক জানেন, এই সব কন্যাদের উদ্দেশ্য, মনোগত ইচ্ছা। এরা সকলেই প্রয়াত সম্রাজ্ঞীর স্থান অধিকার করতে চায়। অন্যথায় সম্রাটের উপপত্নী হতেও তাদের আপত্তি নেই। তাতেও তারা নিজেকে ধন্যজ্ঞান করবে। কিছুদিন আগে রাজ্যের সর্বস্তর থেকে তাঁর ওপর সংসার জীবনে প্রবেশ করার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এমন কি অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, সংঘরক্ষিত প্রমুখদেরও এ বিষয়ে অনুমোদন ছিল। তাঁরা বলেছিলেন, বুদ্ধের গৃহী ভক্তও হওয়া যায়। সম্রাজ্ঞীর স্থান খালি থাকা উচিত নয়। সম্রাট তাই সেই দাবি শর্তাধীনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে। বিবাহযোগ্যা কিছু কন্যাকে নির্বাচন করে এখানে আমার সেবার কাজে ব্যবহার করা হোক। যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাকে প্রকৃতই সংসারমুখী করতে পারে —তাকেই আমি গ্রহণ করব। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবেই তিনি শুভানুধ্যায়ীদের চাপ প্রতিহত করতে পারবেন।

কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সম্রাট ক্রমশ নিজেকে বুদ্ধের পায়ে গভীর থেকে গভীরতর ভাবে নিক্ষেপ করছিলেন। কামনা-বাসনার ঊর্ধে উঠে তিনি এক

বিমল আনন্দের জগতে প্রবেশ করছিলেন। ফলত, প্রাসাদ-রমণীদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব তাঁর কাছে ছিল না। তারা রাজপ্রাসাদ আলো করে রয়েছে—এই পর্যন্ত। সাম্রাজ্যের অভিজাতেরা তাদের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেবার জন্য উৎসাহিত করে তাদের পাঠিয়েছেন, এই আশায় যদি কেউ সম্রাজ্ঞী হতে পারে! সম্রাজ্ঞী না হোক অন্তত পক্ষে বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের উপপত্নী তো হতে পারবে! তাই কন্যারা ইচ্ছায় হোক—অনিচ্ছায় হোক অভিভাবকদের চাপে এখানে এসে জড়ো হয়েছে, কিন্তু কন্যারা সম্রাটের যোগীমূর্তি দেখে প্রতিদিনই নিরাশ হয়। আবার প্রভাতে নতুন উৎসাহে জেগে ওঠে। সম্রাটের ধ্যান ভঙ্গ করে তাঁকে আবার রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবে জাগিয়ে তুলতে হবে! এ বড় কঠিন সাধনা!

কণিষ্ক ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে শয্যা প্রান্তে বসলেন। ঘরের ভেজানো দ্বারের পাশে তাঁর প্রহরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সার সার রক্ষিণী। কিন্তু আজ তাঁর এই কক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কেউ নেই। কেউ তাঁকে জড়িয়ে ধরে শয্যায় বসাবে না। এক সময় তার পোশাক পরিবর্তন স্ত্রী-ই নিজের হাতে করে দিত। আজ আর কেউ নেই। শেষের দিকেও কেউ ছিল না। সেই অজ্ঞাত অধ্যায় মহামিশ্র ছাড়া আর কেউ জানেও না। তবে, আজ তিনি সামান্যতম ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রাসাদ-রমণীরা যে হুড়োহুড়ি শুরু করে দেবে তা তিনি জানেন। ঐসব অশোভন প্রতিযোগীতা তাঁর আর ভালো লাগে না। তাই উদাসীনতা আর গাম্ভীর্য দিয়ে তিনি এদের প্রতিহত করে রেখেছেন।

কিন্তু আজ তাঁর কক্ষসজ্জা তাঁকে তাঁর সংসার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কোনও এক অপরিচিতার হাতের ছাপ এখানে স্পষ্ট হয়ে আছে। আজ দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত প্রাসাদ-রমণীরা একাজ করত, এ তাদের কেউ নয়। পুষ্প স্তবকটির মধ্যে রয়েছে পারস্যের সুগন্ধী এক লাল গোলাপ! সেই অপরিচিতা কেমন করে জানল যে সম্রাট ঐ লাল গোলাপ পছন্দ করেন? নাকি নিজেও তা পছন্দ করে? এক দৃষ্টে লাল গোলাপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কণিষ্ক হঠাৎ একটু বিচলিত বোধ করলেন। —না! এসব চিন্তায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বুদ্ধকে স্মরণ করলেন তিনি।—প্রভু! আমায় শান্তি দাও। আমার মনকে দৃঢ় কর। আমি আবার সেই অন্ধকার দিনগুলোয় ফিরে যেতে চাই না। নারীজাতির ওপর আমি বিশ্বাস হারিয়েছি।

একটু পরেই সম্রাটকে আহার-কক্ষে নিয়ে যাবে রূপসীর দল। দাসীরা আহার সাজিয়ে পরখ করে সম্রাটকে নিবেদন করবে। চুপ করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রাসাদ-রমণীরা। সামান্য দু একটা অনুরোধ হয়ত তারা

করবে—সম্রাট! এই ব্যঞ্জনটি পরখ করুন। ওটি আরও একটু গ্রহণ করুন। সম্রাট তাদের অনুরোধ রক্ষা করে ধন্য করবেন।

শয্যা গ্রহণের সময় হলে সম্রাট আর নারীমুখ দর্শন করেন না। তবে কখনও কখনও সম্রাটের বাসনা হয় যে তিনি ত্রিপিটক বা জাতক কাহিনী শুনবেন শয্যায় শুয়ে শুয়ে। মহামিশ্রকে আদেশ করেন। সম্রাটের শয্যার কাছে একটি পরদা ঝোলানো হয়। পরদার অপর পারে একটি আসনে বসে কোনও প্রাসাদ-রমণী পাঠ করে। সম্রাট শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে এ কথা ঠিক যে সকলের পাঠ সম্রাটের সমান ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি কাউকেও উৎসাহিত করেন না। নিরাশও নয়। মহামিশ্র অপেক্ষা করেন। সম্রাট নিদ্রা গেলে প্রাসাদ-রমণীটি আর মহামিশ্র বিদায় নেন। এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে সম্রাটের জীবন। তৃণাঞ্চলের উষ্ণ রক্তধারার কোন চিহ্নই ইদানিং লক্ষ করা যায় না তাঁর মধ্যে। সম্রাট সত্যিই যেন ভীষণ শান্ত হয়ে গেছেন। এক অব্যক্ত জগতের পথে হেঁটে চলেছেন। একমাত্র মহামিশ্র জানেন সম্রাটের এই ভাবান্তরের কারণ। আর তাই তিনি কায়-মনোবাক্যে চান যে সম্রাট যেন স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে ফিরে আসেন। মহামিশ্রের চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

হিউ-পিনান অনেকদিন পরে খোটান-কাশগড় আর ইয়ারকন্দ জয়ী সম্রাট কণিষ্ককে দেখে অবাক হলেন। এ যেন সেই প্রাণচঞ্চল সম্রাট নন। এক গাম্ভীর্যের আবরণে তিনি নিজেকে ঢেকে ফেলেছেন। উচ্চগ্রামে সকলকে সচকিত করে তিনি আর চিৎকার করেন না। শান্তস্বরে কথা বলেন। সম্রাটের এই পরিবর্তনের জন্য হিউ-পিনান দুটি কারণ খুঁজে পেলেন। এক স্ত্রীর মৃত্যু আর বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাধিক মনোযোগ। যাহোক, নিরাপত্তার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। সম্রাট কিছু কিছু নির্দেশ দিলেন এবং তা যথাযথ ভাবে পালন করার আদেশও দিলেন। আগামীকালও আলোচনা চলবে। আমুদরিয়া বা অক্ষুনদী, শিরদরিয়া, কিছুই বাদ যাবে না। রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের আরও উন্নতির বিষয়ে কিছু পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে হবে।

আজকের দুপুরের আহার হিউ-পিনান অতিথি ভবনেই সেরেছেন সম্রাটের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন মহামিশ্র সমেত সাম্রাজ্যের নানান গণ্যমান্যেরা। সম্রাট চলে যাবার পর অতিথিশালায় হিউ-পিনান কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে

এলে আবার স্নান সারলেন। স্নানের পর তাঁর আর বেরুবার ইচ্ছা করছিল না। অথচ উপায় নেই। জাষ্কের প্রতিনিধি এসে বসেছিল। তবু তিনি বিশ্রামের অছিলায় কিছুক্ষণ কাল-হরণ করার চেষ্টা করলেন। বসে বসে ভাবলেন জাষ্কের উদ্দেশ্যটা কী? এর আগেও তো তিনি এখানে অনেকবার এসেছেন, কিন্তু সামান্য সৌজন্যটুকু দেখানো ছাড়া জাষ্ক তো তাকে এমন আপ্যায়ন করে নি! তোরণ দ্বারে জাষ্কের অতি উৎসাহের পেছনে যে একটি কারণ ক্রিয়াশীল তা অনুমান করতে তাঁর ভুল হয়নি বলেই বিশ্বাস। কারণ, জাষ্ককে তিনি চেনেন। জাষ্ক কি এবার নগরাধ্যক্ষের পদ ছেড়ে অন্য কোন পদের জন্য লালায়িত হয়ে উঠে আবার তাঁর সাহায্যের প্রতাশী হয়েছে? তাই যদি হয়—তবে কোন সেই উচ্চতর পদ? জাষ্ক নিশ্চয় কোনও মন্ত্রীপদের আশা করে না। সে যোগ্যতা তার আছে বলে হিউ-পিনানের মনে হয় না। শত হলেও জাষ্ক তাঁর নিকট আত্মীয়। তার ওপর তাঁর একটা স্বাভাবিক দুর্বলতাও রয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্য। কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত কণিষ্কের চিন্তাটাও তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেছে সম্রাটের মধ্যে। এই শান্তরূপ নিয়ে তিনি কেমন করে শাসন করবেন এই বিশাল সাম্রাজ্য? তবে কি কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন? সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক চিন্তা হিউ-পিনানকে গ্রাস করল। কণিষ্ককে যদি সিংহাসনচ্যুত করা যায়! কিন্তু প্রজাকুলের মধ্যে কণিষ্কের যে জনপ্রিয়তা তাতে তাঁর জীবিতকালের মধ্যে তাঁকে সরানো সম্ভব নয়। একমাত্র কণিষ্কের মৃত্যুই সেই পথ সুগম করে দিতে পারে। কিন্তু সেই মৃত্যুই বা তাঁর পক্ষে কেমন করে ঘটানো সম্ভব? পুরুষপুরের বিরুদ্ধ শক্তির সহায়তা তাঁকে নিতেই হবে। কে এখানে তাঁর সেই সহায়ক শক্তি হতে পারে? দু-একজন মন্ত্রী অবশ্যই রয়েছেন। কিন্তু মাটির বুকে কাজ করার জন্য অন্য এক কুটিল মানুষকে তাঁর চাই। জাষ্ক কি তাঁর সেই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না? জাষ্ক যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ও কুটিল। তাকে আজ এ বিষয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখতে হবে।

জাষ্ক হিউ-পিনানের জন্য কার্যালয়ের দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তিনজন মন্ত্রী আর কিছু অভিজাতবর্গ। সবাই জাষ্কের গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। হিউ-পিনানের রথকে আসতে দেখে সকলে স্বাগত জানালেন।

জাষ্ক নাচ-গানেরও সংক্ষিপ্ত আয়োজন করেছিলেন। পুরুষপুরের বুকে সুদূর বল্খের নৃত্য-সংগীত সবাইকে মুগ্ধ করল। এসবের পর খাওয়া দাওয়ার আসর বসল। তাও শেষ হতে বেশ কিছু রাত হল। জাষ্ক পরিষ্কার ভাবে অতিথিদের এক সময়ে বললেন, আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। হিউ-পিনানের

সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলোচনা রয়েছে। উনি আমার নিকট আত্মীয়—এ কথা তো সবাই জানেন। তাই পারিবারিক আলোচনা সবার সামনে করা সম্ভব নয়।

অতিথিরা অবশ্যই—অবশ্যই বলে একে একে বিদায় নিতে থাকলেন। মদের প্রভাবে তারা তখন কেউই স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। অনেকে আবার হিউ-পিনানের সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। জাষ্ক তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, হিউ-পিনান আগামী কালও থাকবেন। আপনাদের কারোর কোন বক্তব্য থাকলে তা সন্ধ্যাবেলায় অতিথিশালায় গিয়ে বলতে পারেন।

অগত্যা...!

সবাই চলে গেলে জাষ্ক তাঁর নিভৃত কক্ষে হিউ-পিনানের মুখোমুখি হলেন। হিউ-পিনান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাষ্কের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, বল। এতসব আয়োজন হঠাৎ কেন? তুমি কি পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা করছ?

হ্যাঁ। মহামান্য প্রশাসক। নাটকীয় ভাবে জাষ্ক বললেন।

কী সেই পদ? মন্ত্রিত্ব? সৈনাপত্য?

না। রাজপদ। আমি রাজা হতে চাই।

চমকে উঠলেন হিউ-পিনান।—এ তুমি কী বলছ জাষ্ক!

জাষ্ক গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি ঠিকই বলছি। বুদ্ধ-বুদ্ধ করে কণিষ্কের অধঃপতন ঘটেছে। সম্রাট থাকার আর সে যোগ্য নয়। আমি সোজাসুজি আপনাকে বিশ্বাস করেই বলছি, আমি কুষাণদের ভারতীয় অংশের সম্রাট হতে চাই। আপনি সম্রাট হন বর্হিভারতীয় অংশের। আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে?

কিন্তু কেমন করে কণিষ্ককে সিংহাসন থেকে নামাবে। প্রজারা সব তাঁর অনুকূলে। সৈন্যবাহিনীও। সেনাপতি গুণবর্ধন কেন রাজি হবে আমাদের প্রস্তাবে? বাসিস্ক রয়েছে মথুরায়।

জাষ্ক বললেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পরের কথা। আমি প্রথমে কণিষ্ককে হত্যা করে প্রাসাদ অধিকার করে নিতে চাই।

হিউ-পিনান বললেন, বুঝলাম। কিন্তু প্রাসাদে ঢুকে তাঁকে হত্যা করাটা অত সহজ কাজ নয়। প্রহরীরা রয়েছে। অঙ্গ-রক্ষকেরা রয়েছে আর অদূরেই রয়েছে সেনানিবাস। বাইরেও হত্যা করা যাবে না। সম্রাট মারা গেলেও যে হত্যা করবে তার মৃত্যু অথবা ধরা পড়া নিশ্চিত। তাছাড়া অঙ্গ-রক্ষক এবং সেনারা বাইরে সম্রাটকে এমনভাবে ঘিরে থাকে যে হত্যা করার সুযোগই দুর্লভ

হবে। আরও একটা কথা, হঠাৎ সম্রাটকে হত্যা করলে লাভটা কী হবে? যদি কোনও অভ্যুত্থান ঘটানো না যায় তবে হত্যাটা মিথ্যা হয়ে যাবে।

অভ্যুত্থান ঘটাবেন আপনি। বল্খে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপনি ভারতে ঢুকে আসবেন। ইত্যবসরে আমি আমার অনুগতদের সংগঠিত করব। বৌদ্ধ বিরোধী জনসাধারণকে স্বপক্ষে নিয়ে আসব। সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্রাট বিরোধী বিষ ছড়িয়ে দোব। এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধদের ওপর খুব ক্রুদ্ধ। তাদের অভিযোগ রাজকোষ বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধির পিছনেই ব্যায় করা হচ্ছে। ঐ মহাবিহার আর স্তুপ তৈরি করতে কী বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

হিউ-পিনান একটু চুপ করে থেকে কিছু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, এটা সম্ভব। পদানত পহ্লব, শক, নাগবংশীয় আর শুঙ্গদের আমরা প্ররোচিত করতে পারি। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ।

জাষ্ক বললেন, খুব বেশি একটা সময় লাগবার কথা নয়। বৌদ্ধরা খুব শিঘ্রই কণিষ্কপুরে তাদের চতুর্থ সংহতির আয়োজন করবে বলে শুনেছি। দেশ বিদেশ থেকে সেই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বৌদ্ধ প্রতিনিধিরা আসবে। বল্খ থেকেও নিশ্চয় আসবে। আপনি কৌশলে সেই দলের সঙ্গে জনাদশেক ঘাতককে পাঠিয়ে দেবেন। তারা যেন দুঃসাহসী এবং দক্ষ হয়।

হিউ-পিনান বললেন, কেন ঘাতক কি এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে না?

যাবে। কিন্তু আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। এক, সম্রাটকে হত্যার ব্যাপারে এই মুহূর্তে উৎসাহী লোকের সংখ্যা কমই হবে। দ্বিতীয়ত, লোক জানাজানির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

হিউ-পিনান বললেন, ঠিক আছে। আমি দশ-বারোজন ঘাতককে বৌদ্ধ দলের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। এরপর?

জাষ্ক বললেন, সমাজ-উৎসবের ঠিক আগে থাকতেই আপনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কিছু—অন্তত দু হাজার সৈনিককে পাঠাবেন। তারা নগরের পেছনে হিন্দুকুশের যে শৈলশিরা রয়েছে সেখানে কোনও ছদ্মবেশে—কোনও অজুহাতে আশ্রয় নেবে। পাহাড়টিতে রয়েছে নিবিড় অরণ্য। তাদের পক্ষে দু-একদিন সেই জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকা বিশেষ কষ্টকর হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। অন্যদিকে আপনি আপনার সেনাবাহিনী নিয়ে হিন্দুকুশের কাছে অপেক্ষা করবেন। সময় নির্দিষ্ট করছি সমাজ-উৎসবের রাত্রি। সারা দিনের উৎসবের ক্লান্তি আর যথেচ্ছ মদ্যের প্রভাবে মানুষজন এমনকি সৈন্যরাও শিথিল হয়ে থাকবে।

হিউ-পিনান বললেন, তাহলে হাতে মাত্র কয়েক মাসের সময়।

জাষ্ক বললেন, হ্যাঁ। এই অবসরে আমি অবৌদ্ধদের নিয়ে এখানে কিছু অশান্তির চেষ্টা করব। সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের লোকজনকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও করব।

হিউ-পিনান বললেন, এবার উঠি। রাত অনেক হল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে যাচ্ছে।

জাষ্ক বললেন, স্বাভাবিক। দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু একটা কথা। এখানে কাজ শুরু করতে হলে তো বেশ কিছু পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। আমি সামান্য এক নগরাধ্যক্ষ। এই অর্থের যোগান কেমন করে দোব?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হিউ-পিনান বললেন, চিন্তা কোর না। আমি বল্খে ফিরে গিয়ে এক প্রতিনিধির হাতে কিছু অর্থ পাঠাব। আশা করি তাতেই তুমি তোমার কাজ শুরু করে দিতে পারবে।

অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। নিশ্চিন্ত হলাম। বিনয়ে গলে পড়লেন জাষ্ক।

টলমল পায়ে হিউ-পিনান তার রথে উঠলেন। কার্যালয়ের অপর প্রান্তে আধা জঙ্গলের মধ্যে এক পর্ণকুটীর থেকে এক ভিখারি সমস্ত বিষয়টি লক্ষ করার পর শুয়ে পড়ল। প্রভাতেই আবার তাকে ভিক্ষা করতে বার হতে হবে।

সেদিন প্রভাতে প্রস্তুত হয়ে কমলিকা ঘর থেকে বেরুচ্ছিল। অলিন্দ পথে দেখা হয়ে গেল মহামিশ্রের সঙ্গে। অভিবাদন জানাল কমলিকা।—সুপ্রভাত, ভদ্রে মহামিশ্র!

সুপ্রভাত। তোমাকেই খুঁজছিলাম। একটা সুখবর রয়েছে তোমার জন্য।

কমলিকা উৎসাহিত হল না। সে জানে তার জীবনে সুখবর কিছুই নেই। বাবা-মায়ের ঐ মর্মন্তুদ মৃত্যুর পর তার জীবনে সুখকর আর কিছু থাকতে পারে না। তবু আশায় বুক বেঁধেছিল। ভট্টরাইয়ের সঙ্গে এক সহজ সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার জীবনের সীমানায় আবির্ভাব ঘটল সম্রাটের। সমস্ত কিছুর যেন ওলট-পালট ঘটে গেল। ভট্টরাই মিথ্যে হয়ে গেল। সম্রাজ্ঞী হবার লোভ তার নেই। সম্রাটের বীরমূর্তিই তাকে আকর্ষণ করেছে। তার কল্পনা করা বীরমূর্তির সঙ্গে সম্রাট যেন একীভূত হয়ে গেছেন। প্রথম প্রথম প্রাসাদ-রমণীর

জীবনে সে আনন্দ উপভোগ করছিল। কিন্তু ক্রমে সম্রাটের নিরস ব্যবহার যেন তাকে ক্লান্ত করে তুলছে। এ পর্যন্ত সম্রাট কোনও বাক্যালাপই করেন নি। অপর দিকে যন্ত্রের মতো নিবিষ্ট মনে সে তার কাজ করে গেছে। মনের মাধুরী মিশিয়ে সম্রাটের কক্ষসজ্জা করেছে। এখন নিরাশার প্রান্তসীমায় সে। সুতরাং মহামিশ্র আর কী সুখকর সংবাদ বয়ে আনতে পারেন? সেই রত্নপেটিকা? না। রত্নপেটিকার ওপরও আকর্ষণ নেই তার। যে পেটিকার জন্য তাকে তার বাবা-মাকে হারাতে হয়—সেই পেটিকা তার কাছে অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু সেই রত্ন-পেটিকা এক দস্যুর ভোগে না লেগে কোনও কল্যাণকর কাজে লাগলে ভাল হোত।

মহামিশ্র কমলিকার ভাবান্তর লক্ষ করছিলেন। তাই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী হল? কী ভাবছ?

লজ্জিত হয়ে কমলিকা বলল, না। কিছু নয়। বলুন কী সেই সুসংবাদ?

সম্রাট গতকাল রাত্রে আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, কে মাঝে মধ্যে আমার কক্ষ-সজ্জা করে যায়? একটি কৃষ্ণ গোলাপ দিয়ে কে ঐ পুষ্পস্তবকটি সাজিয়েছে?

ভীত কমলিকা বলল, সম্রাটের পছন্দ হয়নি?

অভয় দিয়ে মহামিশ্র বললেন, মোটেও তা নয়। তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। সম্রাট বলেছেন, অতঃপর যেন ঐ রমণীটিই কেবলমাত্র আমার কক্ষ-সজ্জা করে।

কমলিকার মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—সত্যি! কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে বিষাদে ছেয়ে গেল।

কী হল?

অন্যান্য প্রাসাদ-রমণীরা আমায় ঈর্ষা করা শুরু করবে। তারা রাজনৈতিক অভিজাতদের পুত্রী। আমি সামান্য এক মণিকার কন্যা। এমনিতেই কথা শুনতে হয়।

মহামিশ্র হাসলেন।—ওসবে কান না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাক। প্রাসাদ-রমণীদের প্রত্যেকের গুণাবলী আমি জানি। তোমার মতো গুণাবলী আর কারোর আছে বলে আমার মনে হয় না।

কমলিকা বলল, ভন্তে মহামিশ্র! সম্রাটকে জানাবেন, আমি কৃতজ্ঞ।

মহামিশ্র নিজের কাজে চলে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধ কমলিকা ঐ একই স্থানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার সারা দেহে এক কম্পন। এই আনন্দ অন্য কারোর সাথে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কার সঙ্গে সে এই আনন্দ ভাগ করে

নেবে? কেন জানি, ভট্টরাই মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠেই বিশালদেহী সম্রাটের আড়ালে চলে গেল। প্রশান্ত মুখে সম্রাট সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বপ্নের ঘোরে কমলিকা বলল, আপনার জীবনে শান্তি আমি ফিরিয়ে দোব, সম্রাট। সুযোগ দিন, আদরে-সোহাগে আপনাকে ভরিয়ে দোব।

সত্যা ঘর থেকে বেরিয়ে কমলিকাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হল। তার ডাকে বাস্তবে ফিরে এল কমলিকা।—কী রে! হাসিমুখে কী ভাবছিস? খবর শুনেছিস। আজ থেকে সম্রাটের কক্ষ-সজ্জার দায়িত্ব তোর? মহামিশ্র. কাল রাত্রে আমায় জানিয়েছেন। সত্যার মুখে যেন সামান্য অভিমান।—তুই কী ভাগ্যবতী রে! আমাদের হাত ক্ষয়ে গেল, তবু সম্রাটের মন উঠল না। আমাদের কোমর ব্যথা হয়ে গেল। অথচ সম্রাট একবারও বললেন না।—সত্যা! তোমার কোমরটি বড় সুন্দর!

কমলিকা হেসে উঠল।—তুই পারিস বটে, সত্যা!

সত্যা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, তোকে একটা কথা বলে রাখি কমলিকা। সম্রাটকে তুই ছাড়া আর কেউ জয় করতে পারবে না। আমার অনুরোধ যত তাড়াতাড়ি পারিস সম্রাটের মাথাটা চিবিয়ে ওনাকে সংসার ধর্মে টেনে নিয়ে আয়। তাতে তাড়াতাড়ি আমিও মুক্তি পাব।

বিস্মিত কমলিকা বলল, তোর মুক্তি! এর অর্থ?

জানিস না? আমার একজন ভালবাসার মানুষ রয়েছে। কিন্তু আমার বাবা যেহেতু একজন মন্ত্রী, তিনি চান আমি যেন সম্রাটকে জয় করে সম্রাজ্ঞী হই। দূর—তা কি হয়? ছোটবেলা থেকে যার সঙ্গে খেলাধুলো-খুনসুটি করে বড় হলাম—তাকে ছেড়ে...। অবশ্য সম্রাজ্ঞী হবার লোভ যে আমার নেই তা নয়। কত লোকে অভিবাদন করবে...তোরাও করবি...কত লোকের মুণ্ডু নিতে পারব...। তারপর সত্যা আবার ফিস ফিস করে বলল, আমার কুষাণ সাম্রাজ্য চাই না। আমার নিজের সাম্রাজ্য গড়ে নিতে চাই। আমি জানি এই সম্রাজ্ঞীর হবার প্রতিযোগিতায় তুই ছাড়া কেউই বিজয়ী হবে না। তবে একটা কথা—সাবধানে থাকবি। তুই এবার সবার বিষ নজরে পড়বি।

কমলিকা হাসল।—দূর! কোথায় কী? কাজে যাই। দাসীরা ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা ভবিষ্যতই জানে। আমি প্রকৃতপক্ষে মহামিশ্রের সহকারী হয়ে এসেছিলাম। তিনিই আমাকে তোদের দলভুক্ত করে দিয়েছেন। আমার মাথার ওপর ছাদ নেই। পায়ের নীচে শক্ত জমি নেই!

সত্যার স্বর সহানুভূতিতে ভরে গেল।—আহা রে! দস্যুটা এখনও ধরা

পড়েনি। রত্নপেটিকাটি উদ্ধার হলে তোর আর কোনও চিন্তা ছিল না।

বা ব্বা! পেটিকার খবর শুনেছিস তাহলে! তবে পেটিকা নিয়ে আমার দুঃখ আছে বটে—কিন্তু মাথাব্যথা নেই। সম্রাট যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন তা উদ্ধার হবে নিশ্চয়। একটু থেমে কমলিকা বলল, থাক ওসব। চল, বেলা বাড়ছে।

সম্রাটের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পর হিউ-পিনান বিদায় নিয়েছেন। সম্রাট নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ। নচেৎ এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারতেন না। হিউ-পিনান যে মনোযোগ দিয়ে প্রথম দিনের আলোচনা করেছিলেন—সম্রাটের মনে হয়েছে, দ্বিতীয় দিনে হিউ-পিনানের মধ্যে তা অনুপস্থিত। কোথায় যেন তাঁর মধ্যে এক চঞ্চলতা রয়েছে। আর চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছে গতরাত্রের জাঙ্কের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসার পর থেকেই। অবশ্য সম্রাট এ বিষয়ে কারোর কাছে মন খুলে কিছু বলেন নি। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কোন কিছু করা উচিত হবে না। পাঁচ কান হলে জল ঘোলা হওয়ার সম্ভাবনা। মহামিশ্র ছাড়া কারোর কাছে মন খুলে কিছু বলাও যাবে না।

সম্রাট শেষ পর্যন্ত মহামিশ্রের কাছে তাঁর সন্দিগ্ধতার কথা বললেন। মহামিশ্র গুপ্তচর প্রধান নীলাকারকে ডেকে সম্রাটের কথা ব্যক্ত করে তাকে সাবধানে হিউ-পিনান ও জাঙ্কের ওপর দৃষ্টি রাখতে বললেন।

অন্যদিকে ভিখারিটি তার প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল বিষ্কের কাছে। সে বলেছিল, হিউ-পিনান গভীর রাত্রে একাকী কার্যালয় ত্যাগ করে যান। তাঁর যাওয়ার অনেক আগেই অন্যান্য অতিথি-অভ্যাগতরা চলে গিয়েছিলেন। এর অর্থ জাঙ্কের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় আলোচনায় মত্ত ছিলেন। দ্বিতীয় একটি চমকপ্রদ তথ্যও জানা গিয়েছিল। হিউ-পিনান যাবার পর আর এক অতিথির আগমন ঘটেছিল। এই অতিথিটি নাকি প্রায়ই গভীর রাতে কার্যালয়ে আসে। কিছুক্ষণ থাকে এবং বিদায় নেয়।

বিষ্ক স্বাভাবিকভাবেই বুঝেছিলেন যে—গভীর রাতে যে অতিথিটি আনাগোনা করে—সে অন্ধকারেরই লোক! একটি ষড়যন্ত্র যে চলছে একথা

ঠিক। কিন্তু কিসের ষড়যন্ত্র? কোন তথ্য প্রমাণ হাতে না আসা অবধি মহামিশ্রের কাছে জাষ্ক সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করাও সম্ভব নয়। মহামিশ্রের সঙ্গে তার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই যে বিষ্ক তাঁকে উপদেশচ্ছলেও কিছু বলতে পারেন!

ভট্টরাইও বিষ্কের সঙ্গে সহমত হল। সে বলল, অপেক্ষা করা যাক।

সম্রাট কণিষ্ক ধর্ম নিয়ে বর্তমানে যতই মাতামাতি করুন না কেন, প্রশাসন সম্পর্কে তিনি নিচেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। যদিও তাঁর মধ্যে আগের সেই উগ্রতা-বিদ্বেষ নেই—পরিবর্তে তাঁর ধৈর্য এবং সহনশীলতা বেড়েছে। কিছুকাল আগে হলে তিনি সন্দেহের বশেই হিউ-পিনান এবং জাষ্ককে বন্দী করতেন। অত্যাচার চালিয়ে জানতে চাইতেন প্রকৃত কারণ। বর্তমানে তিনি সহজে অশান্তির মুখোমুখি হতে চান না। যদিও তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভীষণ সজাগ। তিনি বুঝতে পারছেন, আবার একটা কিছু ঘটতে চলেছে। মহামিশ্রও এবিষয়ে সহমত। ফলে, গুপ্তচর বিভাগের ওপর চাপ বৃদ্ধি ঘটছে। তারাই সংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে। সর্বশেষ সংবাদ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে এক অসন্তোষ দানা বাঁধছে। সম্রাটের বুদ্ধপ্রীতি তারা ভাল চোখে দেখছে না। সম্রাট মহামিশ্রকে প্রশ্ন করলেন, এইসব তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্য কী? তারা কি বৌদ্ধ মহাসভার আয়োজন করতে দিতে চায় না নাকি আরও কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন। খেদের সঙ্গে তিনি বললেন, অথচ দেখ, আমি কোনও ধর্মকেই অবজ্ঞা করিনি। প্রত্যেককে আমি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছি। আমার মুদ্রায় তাঁদের দেব-দেবীর মূর্তিও খোদাই করছি। তাছাড়া, এই হঠাৎ উঠে আসা নেতারাই বা কারা? এদের পেছনে কারা রয়েছে? আমার তো মনে হয় জাষ্কই এসবের পেছনে কোন না কোন রকম ভাবে যুক্ত।

মহামিশ্র বললেন, জাষ্ককে বিদায় দিন, সম্রাট।

সম্রাট বললেন, বিষয়টি এত সহজ নয়, মহামিশ্র। সে হিউ-পিনানের নিকট আত্মীয়। তাঁরই বিশেষ অনুরোধে আমি তাকে ঐ পদটি দিই। এখন আমাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যখন একটা অশান্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন জাষ্ককে সরালে তা অর্থবহ হয়ে উঠবে। বরং আমাদের এখন ভাবতে হবে যে জাষ্ক অপদার্থ। সর্বসমক্ষে তার অপদার্থতা প্রমাণ করতে পারলেই তাকে বিদায় দেওয়া সহজ হবে।

মহামিশ্র বললেন, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। আমি এসব কথা ভেবেই আজ জাষ্ককে আসতে বলেছি। তার কাছ থেকে জানতে চাই, মণিকার পুত্রীর রত্ন-পেটিকা উদ্ধার আর দস্যুটিকে ধরবার কাজ কতদূর এগোল। এছাড়াও নগরে কিছু কিছু লুটের ঘটনা ঘটেছে। সে কোন লুটেরা? নগরাধ্যক্ষ এ বিষয়ে কতটা যত্নবান হয়েছে? নগরে এসব উৎপাত ছিল না। এতে সম্রাটের সন্মানহানি হচ্ছে। বিরোধীরা সম্রাটের সুনাম নষ্ট করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা প্রচার করার সুযোগ পাচ্ছে যে সম্রাট প্রশাসনিক কাজে শিথিল হয়ে পড়েছেন অত্যাধিক বুদ্ধচর্চা করার জন্য।

সম্রাট আর মহামিশ্রের আলোচনা চলার সময়ই একজন পরিচারিকা এসে জানাল, নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক সম্রাটের দর্শনের অভিলাষী।

সম্রাট মহামিশ্রের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পরিচারিকাটিকে বললেন, ওকে নিয়ে এস।

দ্বারের বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন জাষ্ক। অচিরেই তিনি কক্ষে প্রবেশ করে আভূমি নত হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, সম্রাট কি আমাকে আসতে আজ্ঞা করেছিলেন?

বসার আসন ছিল। কিন্তু সম্রাট তা উপেক্ষা করে সরাসরি বললেন, তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট নই, জাষ্ক। মনে হচ্ছে, নগরাধ্যক্ষের চাপ তুমি যথাযথ ভাবে সহ্য করতে পারছ না।

কেন কেন সম্রাট! আমি দিবারাত্রি আমার কার্য্যালয়ে পড়ে থাকি। সেখানেই আমার আহার এবং শয়ন!

সম্রাট এবার বললেন, মণিকার পুত্রীর রত্ন-পেটিকা উদ্ধার এবং হত্যাকারী দস্যুটিকে বন্দী করার বিষয়ে তুমি কতদূর এগিয়েছ?

আজ্ঞে! আজ্ঞে! বিব্রত হয়ে পড়ল জাষ্ক।

কতদূর এগিয়েছ?

আজ্ঞে...আমি সাম্রাজ্যের নগরে নগরে প্রচার করে দিয়েছি। এখনও কোনও সংবাদ পাইনি। চিন্তা করবেন না। আর কয়েক দিনের ব্যাপার।

রাজধানীতে দস্যুবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে কেন? এতো ছিল না। এ কোন দস্যু—নিভৃতে নাগরিকদের আক্রমণ করে লুট করছে?

আজ্ঞে—সন্ধান করছি। দস্যুটির মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা থাকার জন্য তাকে ঠিক সনাক্ত করতে পারছি না। তবে নগরে প্রহরীরা এ বিষয়ে চোখ

কান খোলা রেখেছে। প্রতিটি উপকার্যালয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আশা করি অতি শিঘ্র এই সমস্যারও সমাধানও হয়ে যাবে।

সম্রাট গম্ভীরভাবে বললেন।—বেশ তোমায় সাতদিন সময় দিলাম। ব্যর্থ হলে তা তোমার অযোগ্যতা প্রমাণ করবে। যাও।

সম্রাট আর মহামিশ্রকে অভিবাদন জানাতে জানাতে পালিয়ে বাঁচলেন জাষ্ক। বেরুবার পর মনে মনে স্থির করলেন, রত্ন-পেটিকাটির ব্যবস্থা তথা দস্যু বাকাটকির বিষয়টির আজ মিমাংসা করতে হবে।

জাষ্ক বিদায় হতেই সম্রাট বললেন, মহামিশ্র! জাষ্কের আচরণ সন্দেহজনক। তুমি এখনই গূঢ়পুরুষ-প্রধান নীলাকার আর সেনাপতি গুণবর্ধনকে ডেকে পাঠাও। তারা যেন এখনই উপস্থিত হয়।

মহামিশ্র বললেন, নিশ্চয় সম্রাট! দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে একজন পরিচারিকাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে মহামিশ্র ফিরে এলেন।

গূঢ়পুরুষ নীলাকারের কার্যালয় এবং সেনাপতি গুণবর্ধনের কার্যালয় সেনানিবাসেই—পাশাপাশি। দুটি বিভাগ অপূর্ব সমন্বয়ে কাজ চালায়। তথ্যের আদান প্রদান করে। রাজপ্রাসাদের অনতিদূরেই দুটি কার্যালয়। তাই দুজনের সম্রাটের কাছে ছুটে আসতে বিশেষ সময় লাগল না।

সম্রাট চোখ বুজে আসনে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলেন। একটি সময় ছিল যখন তিনি খোলা তলোয়ার হাতে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বিভীষিকার মতো ছুটে বেরিয়েছেন। তারপর সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু। সম্রাটের জীবনে এক আমুল পরিবর্তন ঘটে গেল। মহামিশ্র ছাড়া সকলেই বিশ্বাস করে যে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু সম্রাটকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। শিথিল হয়ে গেছেন তিনি। আশ্রয় নিয়েছেন বুদ্ধের চরণে। নারী জাতির প্রতি তাঁর কৌতূহল নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু...!

সম্রাটের জয় হোক! গুণবর্ধন ও নীলাকার অভিবাদন জানালেন সম্রাট কণিষ্ককে। আমাদের আহ্বান করেছেন, সম্রাট?

সম্রাট চোখ খুললেন। তারপর দুজনকে বসতে বলে একটু চুপ করে রইলেন। এরপর হঠাৎ বললেন, নীলাকার! তোমার বিভাগ কি সাম্রাজ্যের কোনও খোঁজখবর রাখে আজকাল?

বিমূঢ় নীলাকার বিব্রত হয়ে বললেন, এমন কথা কেন বলছেন, সম্রাট? কোন বিচ্যুতি কি আপনি লক্ষ করেছেন? তাহলে অবিলম্বে আমি তা সংশোধন করে নোব।

বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের ভেতরে এক অসন্তোষ যে মাথাচাড়া দিচ্ছে, তার কোন সংবাদ তোমার কাছে আছে কি?

ক্ষমা করবেন সম্রাট। আমার গূঢ়পুরুষেরা ইতিমধ্যেই এই নিয়ে ব্যস্ত। তারা তাদের নেতাদের—তাদের উদ্দেশ্য—তাদের পেছনে উৎসাহদাতা কে রয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করছে। প্রমাণযোগ্য কিছু তথ্য হাতে এলেই আমি তা আপনার গোচরে নিয়ে আসব। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু বা ধর্মীয় নেতারা একাজে যুক্ত নন। তাঁরা সম্রাট ভক্ত। বিভিন্ন ধর্মের কিছু উৎসাহী যুবক এসব কাজের উৎসাহ দাতা বলে জানা গেছে। কিন্তু বিশদভাবে সবকিছু না জানা পর্যন্ত আপনাকে কিছু জানাতে পারছি না। তারা অতিশয় ধূর্ত! তবু, সম্রাট চিন্তা করবেন না। ভন্তে মহামিশ্রের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। প্রাথমিক প্রতিবেদনটি আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম।

সম্রাট বললেন, হ্যাঁ। মহামিশ্র আমায় জানিয়েছে। কিন্তু যা জেনেছি, তা যথেষ্ট নয়। সেইজন্যই তোমাকে ডাকা। এই কাজটি এত শ্লথভাবে করলে চলবে না। দ্রুত শেষ করতে হবে। নচেৎ সাম্রাজ্যে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে।

সম্রাটের নির্দেশ আমি পালন করব। তবে এ প্রসঙ্গ যখন উঠল, তখন সম্রাটের অবগতির জন্য বলে রাখি, বল্খের প্রশাসক হিউ-পিনান আর নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক আমাদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। কিন্তু প্রমাণাভাব!

সম্রাট বললেন, আমি খুশি যে তোমার সন্দেহ আমারই অনুরূপ। তুমি তুমি নিজে পারলে বা তোমার কোন যোগ্য সহকারীকে আগামীকালই বল্খে পাঠাও। তোমার গূঢ়পুরুষ বিভাগকে নির্দেশ দাও যেন তারা হিউ-পিনানকে সন্দেহের তালিকায় রেখে তার প্রতিটি গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখে। হিউ-পিনানের সহকারী সোরোডান সতর্ক কর। আমি জানি, সোরোডান সঙ্গে হিউ-পিনানের সম্পর্ক মধুর নয়। তাকে ইংগিত দেবে যে ভবিষ্যতে সেই হবে বল্খের প্রশাসক!

আপনার আদেশ মতোই কাজ হবে সম্রাট। নিশ্চিন্ত থাকুন।

সম্রাট এবার গুণবর্ধনের দিকে তাকালেন।—সেনাপতি! সাম্রাজ্য জুড়ে বিশেষ করে পুরুষপুরে ইউ-চি জাতির গোষ্ঠী বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যদিও বিষয়টি এখন অঙ্কুর অবস্থায় রয়ে গেছে—কিন্তু সুযোগ পেলে তা মহীরূহে পরিণত হতে দেরি লাগবে না। সুতরাং...! সম্রাট একটু থামলেন।

উদ্‌গ্রীব হয়ে গুণবর্ধন প্রশ্ন করলেন, 'সুতরাং' কী সম্রাট?

সম্রাট বললেন, তোমার বাহিনীতে—এ অঞ্চলে পৃথক ধর্মগোষ্ঠীর এবং

ইউ-চি গোষ্ঠীর কত লোক আছে—সে সম্বন্ধে কোন হিসাব কি তোমার কাছে আছে?

না, সম্রাট। পূর্বে কখনও প্রয়োজন পড়েনি তাই...।

এবার প্রয়োজন পড়তে পারে। তুমি কাল বিলম্ব না করে একটি তালিকা প্রস্তুত করবে কোনও এক অজুহাত দেখিয়ে। মূলত উদ্দেশ্য হবে কুই-সাং গোষ্ঠীর এবং বৌদ্ধদের সংখ্যা নিরূপণ করা। কুই-সাং গোষ্ঠী সংখ্যায় অল্প। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাদের কিছু কিছু করে সাম্রাজ্যের পৃথক পৃথক স্থানে পাঠিয়ে ভারতীয় বা অন্য গোষ্ঠীর সেনা দিয়ে সেইসব স্থান পূরণ করে নাও। অন্যদিকে তোমাকে দেখতে হবে সেনাবাহিনীতে বৌদ্ধ জনসংখ্যা যেন অধিক হয়। কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

গুণবর্ধন বলল, বুঝতে পারছি সম্রাট। কিন্তু কিছু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি অনুমতি করেন...!

সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো আমিও জানি। কিন্তু আমি চাই এই কাজ তুমি অতি দ্রুততার সঙ্গে এবং উদ্দেশ্য গোপন রেখে করবে। শুধুমাত্র কুই-সাং গোষ্ঠীর সেনা অপসারণ করলে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তাই প্রয়োজন হলে কুই-সাং গোষ্ঠীর দলে অন্য গোষ্ঠীর বা কিছু ভারতীয় সেনাকেও স্থানান্তরে পাঠাও। দ্বিতীয়ত, নীলাকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে প্রতিনিয়ত। লক্ষ্য রাখবে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি যেন মাথা চাড়া দিতে না পারে। আমি চাই না—বহু জাতি—বহু ধর্মী—বহু গোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে যে কুষাণ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস হয়ে যাক। এই ভারত যেন মহামানবের মিলনভূমি হিসেবেই যুগ যুগ ধরে পরিচিত হতে পারে। সাম্রাজ্যে বেশ কিছু বছর ধরে শান্তির বাতাবরণ রয়েছে। তা ছিন্ন করতে বিভেদকারীদের মুহূর্তমাত্র সময় লাগবে না। আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য পরিভ্রমণে আর বার হইনি। এটা আমার কাছে একটি ত্রুটি বলেই মনে হচ্ছে। তাই আমি স্থির করেছি, আগত বৌদ্ধ-সম্মেলন এবং তারপরেই 'সমাজ উৎসব'-শেষ হলে আবার আমি সাম্রাজ্য পরিভ্রমণে বার হব। প্রজাদের সঙ্গে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। যাহোক তোমরা তোমাদের বাহিনীকে প্রস্তুত রেখো। দিগন্তে আমি যেন অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছি!

মহামিশ্র, গুণবর্ধন ও নীলাকার একত্রে সম্রাটকে আশ্বস্ত করলেন, চিন্তা করবেন না সম্রাট। সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমরা আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছি। আমরা জানি, সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজা এবং সেনাদের কাছে আপনি দ্বিতীয় 'দেবানংপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক।' আপনার বিরুদ্ধে একটি

তৃণও উঁচিয়ে ধরার ক্ষমতা কেউ রাখে না। তবু আমরা সতর্ক থাকব। আপনার নির্দেশ মতো কাজ আজ থেকেই শুরু করব।

সম্রাট আশ্বস্ত হলেন।

সভাভঙ্গ হল। গুণবর্ধন আর নীলাকার বেরিয়ে যেতে মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আপনাকে ক্লান্ত লাগছে। চলুন, কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন।

দাসীরা দেওয়ালগিরিগুলি একে একে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। আলোয় ঝলমল করে উঠল প্রাসাদ।

দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মহামিশ্র বললেন, জগতকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার জন্য সম্রাট অশোকের পরই আপনার আগমন। সেই পরম বুদ্ধের পায়ে আপনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কে আপনার অনিষ্ট করবে?

দোতলায় মহামিশ্র ছাড়া অন্য পুরুষের আগমন নিষিদ্ধ। অলিন্দের দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষিণী এবং প্রাসাদ-রমণীদের মধ্য দিয়ে মহামিশ্র সম্রাটকে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন। সম্রাট শয্যার এক প্রান্তে একটু আরাম করে বসলেন।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! বিশ্রামের পর পোষাক পরিবর্তন ও স্নান-ঘরে স্নান সেরে নিন। স্বস্তি পাবেন। আমি দাসী এবং প্রাসাদ-রমণীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। চিন্তা মুক্ত হন।

মহামিশ্র চলে গেলেন। সম্রাট ভাবলেন, এক সময় তাঁর স্ত্রীই এইসব বিষয় দেখত। অন্তত কিছুকাল...। তারপর! সম্রাট চান না কোন দাসী তাঁর দেহের সংস্পর্শে আসুক। নিজে স্নান-ঘরে পোষাক পালটাবেন। কিছু পরে আহার সেরে নিয়ে ঘরের কিনারায় রাখা বুদ্ধ-প্রতীক পদ্মফুলটিকে ধ্যান করবেন। আর একটু রাত হলে—নিদ্রা যদি না আসে কোনও প্রাসাদ-রমণীকে ডেকে পাঠাবেন। পরদার আড়ালে বসে সে ত্রিপিটক বা জাতক কাহিনি পড়ে শোনাবে। এক সময় তিনি নিদ্রায় কোলে আত্মসমর্পণ করবেন।

সম্রাটের মাথায় এখন আর একটা চিন্তা। কশ্যপুরার কণিষ্কপুরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংহতি। তাম্রপর্ণী, সুবর্ণভূমি, দক্ষিণাপথ, পাটলিপুত্র, ওদিকে বল্খ ইত্যাদি জায়গা থেকেও নিত্য প্রতিনিধিরা আসছেন। কিছু রাজকর্মচারি চলে গেছে কণিষ্কপুরায়। সভামন্ডপ, প্রতিনিধি এবং সম্রাটের বাসস্থানের আয়োজনে তারা ব্যস্ত। সম্রাটকে উদ্বোধন সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু বিশাল দলবল নিয়ে যাওয়ার অর্থ ওখানকার প্রশাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। এমনিতেই তারা দেশ বিদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তার উপর সম্রাট গিয়ে উপস্থিত হবেন। নতুন গড়ে ওঠা নগরে সম্রাটের বাসোপযোগী বাসস্থানের ব্যবস্থা

করা প্রশাসকদের কাছে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই কণিষ্ক চিন্তা করলেন, স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়েই তিনি যাবেন। জনা চারেক প্রাসাদ-রমণী। কিছু দাস-দাসী। অঙ্গরক্ষক আর সেনা তো স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তাঁরা সবাই শিবিরে বসবাস করবেন। মহামিশ্র সঙ্গে থাকলে তাঁর সুবিধা হোত। কিন্তু তাঁকে পুরুষপুরে রেখে যেতেই হবে।

চিন্তা থামিয়ে কণিষ্ক এবার কক্ষসজ্জার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আজকের সজ্জাও তাকে অভিভূত করল। তিনি মহামিশ্রের কাছে জেনেছিলেন—এই সজ্জা মণিকার পুত্রীর। শুধু এই কক্ষ-সজ্জা নয়। ঐ মণিকার পুত্রী রাত্রে ত্রিপিটক এবং জাতক কাহিনি পাঠ করেও তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সুরেলা কণ্ঠস্বর। নিখুঁত উচ্চারণ। জড়তাহীন। হঠাৎ কণিষ্ক একটু যেন কেঁপে উঠলেন। মণিকার পুত্রী তাঁকে একটু আকর্ষণ করছে!

এক দাসী এসে বিনীত ভাবে জানাল, সম্রাট! নৈশ আহার প্রস্তুত। প্রাসাদ-রমণীরা অপেক্ষা করছে।

সম্রাটের রান্না প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ-রমণীর তত্ত্বাবধানে রাঁধা হয়। প্রথা হিসাবে সম্রাটের সামানে তাকে সেই আহার পরখ করতে হয়। খাদ্যে বিষ প্রয়োগ রাজকুলে নতুন কিছু নয়। সম্রাট বিশ্বাস করেন, তাঁকে কেউ ঘৃণীত ভাবে হত্যা করতে চাইবে না। অন্ততপক্ষে এই প্রাসাদ-রমণীরা তো নয়ই। এদের ধ্যানজ্ঞান তিনিই। যদি কোনও রকমে তাঁর অঙ্কশায়িনী হওয়া যায়—তাহলে এদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু মহামিশ্র এ ব্যাপারে ভীষণ প্রাচীনপন্থী। তিনি বলেন, না সম্রাট, প্রথা—প্রথাই। একে রদ করার কোনও অর্থ হয়না।

সম্রাট উঠে পড়লেন। ক্ষুধার্ত বোধ করছেন তিনি।

জাষ্ক সম্রাটের কক্ষ থেকে বার হওয়ার পর স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে সম্রাট তাঁর ওপর প্রসন্ন নন। তাকে সারধান করার জন্যই আজ ডেকে পাঠানো হয়েছিল। হয়ত সন্দেহও করছেন। সুতরাং অভীষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত সম্রাটকে রুষ্ট করে তোলা চরম মূর্খামীর কাজ হবে। তাই তিনি ঠিক করলেন যে রত্ন-পেটিকা আর দস্যু বাকাটকির সমস্যাটির আশু সমাধান করতে হবে। মণিকার পুত্রী হয়ত সম্রাটকে নিত্য বিরক্ত করছেন। আর রাজধানীর পথে-ঘাটে দস্যু

বাকাটকির দস্যুতা ইতিমধ্যেই পুরুষপুরের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং এসব সমস্যা যদি সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিষ্পত্তি করা না যায় তাহলে তা সব তাঁর অপদার্থতা প্রমাণে ব্যবহৃত হবে। অথচ সমাজ উৎসবের দিন পর্যন্ত তাঁকে ধৈর্য ধরে সাবধানে থাকতেই হবে। তারপর...! পরমুহূর্তেই জাষ্কের মনে চিন্তা এল, বাকাটকির অধ্যায় বন্ধ করে দিলে তাঁর অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অসাধু ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য দুষ্কৃতিদের কাছ থেকে তাঁর যা আয়—তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর উঠতি নেতাদের বিপুল চাহিদা। কাজ শুরু হয়ে গেছে। মাঝপথে অর্থের জন্য তা বন্ধ হয়ে গেলে পুরো অর্থটাই লোকসান হয়ে যাবে। এদিকে হিউ-পিনানের অর্থ এবং তাঁর পাঠানো ঘাতকদলেরও কোন সংবাদ নেই। জাষ্ক স্থির করলেন, আর দু-একদিনের মধ্যে হিউ পিনানের অর্থ না এলে তাঁকে তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবলের কাছে অর্থ চাইতে হবে। তাঁরাও যখন স্বইচ্ছায় এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছিলেন তখন অর্থব্যয় করতে তাঁরা বাধ্য। হিউ-পিনানের মাধ্যমেই এই তিন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। তাঁদের দাবি ছোট। তক্ষশিলা আর পুষ্কলাবতীর রাজ্যপদ। অবশ্যই তাঁরা তাঁর অধীনেই থাকবেন। পরে যদি সম্ভব হয়—হিউ-পিনান যদি করুণা করেন—তাহলে তাঁরা ইরারকন্দ-খোটান বা কাশগড়েও যেতে পারেন। রেশম পথে আধিপত্য বিস্তার করবেন। বণিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা অনেক সহজসাধ্য!

শেষ পর্যন্ত হিউ-পিনানের ওপর বিরক্ত হয়ে জাষ্ক স্থির করলেন, তিনি নিজেই একটি ঘাতকদল গড়ে তুলবেন। অসুবিধার কী আছে—একটু সাবধানী হতে হবে আর কি! রাজপ্রাসাদের নক্সা তিনি ইউনাসের কাছ থেকে যোগাড় করে নেবেন। তাঁর জানা আছে, সম্রাট দোতলায় বাস করেন। উদ্যান দিয়ে রজ্জু সোপানের সাহায্যে ঘাতকরা দোতলায় উঠে যাবে। তার আগে উদ্যানের দিকে সামান্য যে কজন প্রহরী থাকে তাদের নিঃশব্দে হত্যা করলেই চলবে। সমাজ-উৎসবের দিন সবাই এমনিতেই ক্লান্ত থাকবে। বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

জাষ্কের চিন্তা আবার রত্ন-পেটিকা আর বাকাটকিতে ফিরে এল। সম্রাট মাত্র সাতদিন সময় দিয়েছেন। অন্যদিকে সমাজ-উৎসবের এখনও যথেষ্ট দেরি। সুতরাং কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে বাকাটকির অধ্যায় তার শেষ করা উচিত। সামান্য কিছু আর্থিক ক্ষতি হবে। হোক গে। একসঙ্গে এত লোভ করা ভাল

না। তাই বাকাটকি এবং তাঁর শকট চালকের আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। পরিকল্পনা প্রস্তুত করা শুরু করলেন জাষ্ক।

আসনে বসে জাষ্ক বাকাটকির আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। কার্যালয়ের পেটা ঘড়িতে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করা হয়ে গেছে। ঘুম জড়িয়ে ধরছিল তাঁকে। কিন্তু আজ যদি পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ না হয় তাহলে একটি দিন নষ্ট হবে।

ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলেন জাষ্ক।—আজ বাকাটকি এত দেরি করছে কেন? করবে তো কিছু অলংকার লুঠ! তারজন্য মধ্যরাত্রি পার করে দেওয়ার কি অর্থ হয়? এখন পথে কি কোন সালংঙ্কারা কন্যাকে একাকী বা দুর্বল কোন সঙ্গীর সঙ্গে পাওয়া যাবে? তবে কি সে তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পালিয়েছে? তাই বা সম্ভব কেমন করে হবে? জাষ্কের মনের কথা জাষ্ক ছাড়া আর কে জানে? আফশোষ হল জাষ্কের। বাকাটকি এ'কদিন বেশ ভালই উপার্জন করে আনছিল। আরোও কটা দিন চালাতে পারলে ভালই হত। কিন্তু সম্রাট তো মাত্র সাতদিনের সময় দিয়েছেন। এই মহামিশ্রই সম্রাটের কান ভারী করেছে। মনে মনে গর্জালেন জাষ্ক। তাঁর দিন এলে তিনিও তাঁকে দেখে নেবেন। যে আগুন জাষ্ক লাগাবে সে আগুন থেকে পুরুষপুরে কেউ বাঁচতে পারবে না। ধর্মীয় বিক্ষোভ বড় ক্ষোভ। গোষ্ঠী বিক্ষোভও প্রাণঘাতি। ক্ষীণ হলেও তাদের প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে এখন থেকেই!

জাষ্কের হঠাৎ ক্ষুধা পেল। আহারের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি আহার নিয়ে বসলেন। আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় বাকাটকি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

কর্কশ ভাবে জাষ্ক বললেন, অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারিস না?

বাকাটকি কয়েকদিন জাষ্কের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করেছিল। সে বলল, আসব তো আপনার জানা ছিল।

অনেক হয়েছে। দে, আজ কী নিয়ে এসেছিস?

বাকাটকি একটি থলি থেকে দুটি ভারি স্বর্ণহার, কয়েকটি রত্নখচিত অঙ্গুরী আর দুটি কর্ণাভরণ বার করে জাষ্কের হাতে তুলে দিল।

অঙ্গুরীয়ের হিরেটা চোখের সামনে ধরে জাষ্ক বলল, এটি নিশ্চয়

দক্ষিণাপথের। অন্ধ্রপথের খনি থেকে এসেছে।

নির্লিপ্তভাবে বাকাটকি বলল, হতে পারে। দিন, আমাকে সাত দিনের অর্থ মিটিয়ে দিন। আমি আর পুরুষপুরে থাকব না। আপনার মতো অংশীদারের সঙ্গে আমার কাজ করা পোষাচ্ছে না। সিংহভাগ তো আপনিই নিয়ে নিচ্ছেন।

চাপা স্বরে গর্জন করে উঠলেন জাষ্ক।—বাজে বকিস না। ওরকম মুখে কাপড় বেঁধে দুর্বল মেয়েদের ওপর দস্যুতা করতে সবাই পারে। কিন্তু এই পুরুষপুরে লুটের জিনিস বিক্রি করতে কি পারবি? তোর দস্যুতার চেয়ে জিনিসপত্তর বিক্রি করা আরও কঠিন।

বাকাটকি সতর্ক হয়ে গেল। নরম গলায় বলল, আহা রাগ করছেন কেন? আমি কি সত্যিই তাই বলছি।

জাষ্ক নরম ভাব দেখালো না। তিনি পঞ্চাশটি কার্যাপণ বাকাটকির দিকে এগিয়ে বললেন, নে ধর!

হতবাক বাকাটকি বলল, আপনি তো আমার চেয়ে বড় দস্যু! পাঁচ শতের জায়গায় পঞ্চাশ।

জাষ্ক বললেন, কী করব বল। গত সপ্তাহের জিনিসগুলো এখনও পড়ে আছে। বিক্রি হয়নি। এতো তোকে আমার থেকেই দিলাম!

বিক্ষুব্ধ বাকাটকি বলল, একই কথা তো প্রতিদিনই বলেন। বুঝে গেছি—কার হাতে পড়েছি! আর দস্যুতা নয়। এবার জমি চাষ করে খাব। কই আমার প্রাপ্য রত্নটা অন্তত আমায় দিন।

তোর তো ভারি লোভ! ওটা নিয়ে এখন করবি কী? বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তো আবার আমার কাছে আসবি, তার চেয়ে বরং ওটা আমার কাছেই থাক। বিক্রি করতে পারলে ভালরকম অর্থ দোব।

বাকাটকি পাশে রাখা জল ভান্ড থেকে ঢক ঢক করে কিছুটা জল পান করে আবার পাশে তাকাল। একটি পাত্রে কয়েক টুকরো মেষ-মাংস রয়েছে দেখে তা গলাঃকরণ করল।

সহানুভূতি যেন ভেঙে পড়লেন জাষ্ক।—আহা রে! যদি একটু আগে আসতিস তাহলে পেট ভরে খেতে পেতিস!

বাকাটকি ব্যঙ্গ করে বলল, জানা আছে কত খাওয়াতেন! নেহাৎ ফাঁদে পড়েছি—তাই খুব খেলাচ্ছেন। আপনি যে কী জিনিস তা আমার জানা হয়ে গেছে। দিন—ঐ পঞ্চাশ কার্যাপণই দিন, নইলে কাল আহার জুটবে না।

জাষ্ক যেন রসিকতা করলেন।—এখনই তো মাংস খেলি! আর এখন থেকেই কালকের আহারের জন্য খাই খাই করছিস? যা হোক, শোন। সম্রাট আমায় আজই ডেকেছিলেন। সেই রত্ন-পেটিকার জন্য বকাবকি করলেন। তাই আজই ঐ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তুই হুং-চাকে নিয়ে শকটে করে নদী তীরে চলে যা। আমার জন্য অপেক্ষা করবি। আমি কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে গিয়ে ঐ পেটিকা উদ্ধার করব। লোকের সামনে ওটা খুলে দেখাব যে ওটার ভেতর নুড়িপাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

বাকাটকিও কম যায় না। সে বলল, সাক্ষীরা যদি প্রশ্ন করে, পেটিকাটি যে এই জায়গায় রয়েছে তা জানলেন কেমন করে?

জাষ্ক বললেন, মূর্খ! নগরাধ্যক্ষ কি সর্বসমক্ষে তার সংবাদের উৎস সম্পর্কে প্রচার করবে? আর যদি সেরকম হয় তাহলে বলব, কোনও এক সৎ নাগরিক কারোকে ঐ স্থানে কিছু পুঁতে রাখতে দেখে আমায় সংবাদ দেয়। সেই নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য আমি কোনও কিছু প্রকাশ করতে পারব না।

যুক্তিটি স্বীকার করে নিল বাকাটকি। সে বলল, আপনি পেটিকা উদ্ধার করবেন তো আমার যাবার কী প্রয়োজন? আমায় কি জড়িয়ে ফেলার চক্রান্ত করছেন?

অভয় দিলেন জাষ্ক।—আরে তা নয়। সেই সৎ নাগরিকটি হচ্ছ তুমি। আমার শকট চালকের সঙ্গে তোমায় নদী তীরে পাঠিয়ে দিয়েছি স্থানটিকে পাহারা দেবার জন্য। আমি বিচার বিভাগীয় সাক্ষীদের ডাকতে গেছি। একেবারে পাকা কাজ যাতে পরে কেউ কিছু না বলতে পারে।

এত জটিলতা বোধগম্য হল না বাকাটকির। তবে সঙ্গে হুং-চা যাচ্ছে শুনে সে আশ্বস্ত হল। সে বলল, যাব। কিন্তু একটি শর্ত, ফিরে এসে আমি বাকি পড়ে থাকা অর্থ চাই। বিক্রি না হওয়ার ওজর শুনব না। এমনিতেই তো কয়েক লক্ষ কার্যাপণ আমায় ঠকিয়ে নিয়েছেন।

জাষ্ক ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তবু তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে। এখন যা তো!

নিজের কুটীরে শুয়ে থাকা ভিখারীটা দেখল, হুং-চা একজনকে নিয়ে শকট চালনা করে বেরিয়ে গেল। ঐ লোকটিই প্রায় মধ্যরাত্রে জাষ্কের কাছে আসে, কিন্তু কোথায় গেল তারা? আরও আশ্চর্য হল সে যখন দেখল, জাষ্ক কিছুক্ষণ পরে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত বিষয়টির মধ্যে

কোথাও যেন একটি গন্ডগোল রয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙতে ভিখারিটি কৌতূহলী হয়ে কার্যালয়ের দিকে তাকাল। অদ্ভুত ব্যাপার! নগরাধ্যক্ষের ঘোড়াটি বাঁধা রয়েছে অথচ শকটটির কোনও চিহ্ন নেই। রাতে বার হয়ে হুং-চা আর সেই মানুষটি কি আর ফিরে আসেনি? গেল কোথায়? রাতে নগরদ্বার তো বন্ধ থাকে!

ভিক্ষায় বেরোবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে ভিখারিটি আরও একটি দৃশ্য দেখতে পেল। বেশ কিছু নাগরিক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। প্রহরীর দল বেরিয়ে এসেছে।

এক সময় জাষ্কও চোখ মলতে মলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কার্যালয়ের দাওয়ায় বসে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে প্রশ্ন করলেন রূঢ়ভাবে—কী ব্যাপার? সাত সকালে এই চিৎকার চেঁচামেচি কেন?

জনতা চিৎকার করে বলল, একটা সাংঘাতিক কান্ড ঘটে গেছে। আপনার শকট চালক ও অপরিচিত এক ব্যক্তি হাতে তলোয়ার নিয়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কুবা নদীর তীরে পড়ে রয়েছে। আপনার শকটটিও সেখানে দাঁড়িয়ে।

বিস্ময় প্রকাশ করে জাষ্ক স্বগোতক্তি করলেন, আরে তাই তো! শকট কোথায়? কে নিয়ে গেল—প্রহরী? রাত-কর্তব্যে কারা কারা ছিলে, এদিকে এস।

জনাচারেক প্রহরী কাঁচুমাচু মুখে জাষ্কের সামনে এসে দাঁড়াল, আজ্ঞে?

তোমরা হুং-চা কে শকট নিয়ে বার হতে দেখেছ?

না, প্রভু। তবে আমরা দেখেছি হুং-চা তার এক মিত্রের সঙ্গে শকটের ওপর বসে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করছিল। লোকটিকে আমরা চিনি না। তবে হুং-চা-এর কাছে থেকে শুনেছি, তারা নাকি মিত্র। বম্বে পাশাপাশি তাদের বাড়ি। ইদানিং প্রায়ই সে হুং-চা এর সঙ্গে গল্প করতে আসত।

সে তো আমিও কদিন লক্ষ করেছি। কিন্তু হুং-চা শকট নিয়ে বেরিয়ে গেল আর তোমরা কেউ দেখনি—কখন সে গেল? তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। সত্য বল। নচেৎ কঠিন দণ্ড পাবে। কঠিন গলায় জাষ্ক বললেন।

একজন প্রহরী ভীতস্বরে বলল, প্রভু যদি অভয় দেন তো একটি সত্য কথা বলি।

নির্ভয়ে বল। সত্য কথা আমি পছন্দ করি।

আজ্ঞে, আমাদের প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছিল। হুং-চা সে কথা শুনে বলেছিল, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি জেগে রইলাম। আমার মিত্র কাল ফিরে যাবে।

তাই ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত পুইয়ে যাবে। যাও যাও একটু ঘুমিয়ে নাও। আমরা বুঝতে পারিনি যে এটা হুং-চা-র ষড়যন্ত্র! আমাদের ক্ষমা করে দিন, প্রভু।

লোকটার পরিচয় জানো?

না, প্রভু। হুং-চা কোনদিন আমাদের সঙ্গে আলাপ করায়নি। শুধু বলেছিল, তার মিত্রটি পুরুষপুরের একটি বিশেষ কাজে এসেছে।

কী কাজ, জানো?

না, প্রভু।

অপদার্থ সব। তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।

ক্ষমা করুন প্রভু।

জাষ্ক যেন কিছু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, অনেক হয়েছে! চল এখন নদীর তীরে। দেখি দুটো কেমন করে মরল!

একসময় জাষ্ক সদলবলে কুবা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। বহু মানুষ জমে গেছে ইতিমধ্যেই। শকটের ঘোড়াটি একটি গাছের গায়ে বাঁধা। জাষ্ক তার গায়ে হাত বোলাতেই সেটি চিঁ চিঁ করে উঠল। জাষ্ক চিৎকার করে জনৈক প্রহরীকে আদেশ করলেন, যা। এটাকে একটু ঘাস-জল খাইয়ে নিয়ে আয়। ক্ষিদে পেয়েছে এটার।

একজন প্রহরী এগিয়ে এসে ঘোড়াটিকে নিয়ে গেল। তারপর জমা জনতাকে দেখে জাষ্ক এবার হুংকার দিয়ে উঠলেন।—সর। সর। পথ ছাড়। দেখি দুটোকে। জনতা সভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। অকুলস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন জাষ্ক।

কিছুটা এগোতেই জাষ্ক দেখতে পেলেন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় হাতে তলোয়ার নিয়ে হুং-চা আর বাকাটকি পড়ে আছে। জনতাকে শুনিয়ে জাষ্ক খেদ প্রকাশ করলেন, হতভাগা দুটো এখানে মরতে কেন এল? কী উদ্দেশ্য ছিল এদের? কখনই বা এল—কেনই বা এল? শুনলাম তো দুই বন্ধু গল্প করছিল কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে। কী মতিভ্রম হল? আহা—হুং-চা আমার বহু দিনের সাথী। সুদূর বল্খ থেকে সে আমার সঙ্গে পুরুষপুরে এসেছিল। আর এই লোকটাই বা কে? দেখতে তো দস্যুদের মতো। হুং-চা-র মিত্র ছিল। এও নাকি বল্খের অধিবাসী। হুং-চা-র মিত্র বলে আমি একে কিছু প্রশ্ন করিনি কোনদিন! কী ভুল করেছি! কথা বলতে বলতে জাষ্ক পা দিয়ে বাকাটকির দেহটা উল্টে দিলেন।—আরে! আরে! এটা কি...! একটি

পেটিকা দেখছি! তোল! তোল! দেখি সোনাদানা কিছু আছে কি না!

একটি প্রহরী ছুটে এসে পেটিকাটি তুলল।—বেশ ভারী প্রভু।

খোল! খোল! দেখ্ কী আছে এতে।

সমস্ত জনতার চোখ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল পেটিকাটির ওপর। কিন্তু খোলামাত্রই এক চাপা হতাশার স্বর বেরিয়ে এল সবায়ের গলা থেকে।—একি! এ যে কেবল নুড়িপাথর! কী ছিল এতে? গেল কোথায়?

জাষ্ক এবার গম্ভীর স্বরে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ব্যাপারটা এবার বোঝা গেল। দুজনেই এই পেটিকার অবস্থান জানত। ঠিক করেছিল, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে। সেই উদ্দেশ্যে তারা শকট নিয়ে সবায়ের অগোচরে এখানে এসেছিল এবং পেটিকা খালি দেখে একে অপরের ওপর দোষ চাপায়। ফলে আত্মঘাতি যুদ্ধ এবং মৃত্যু। কী বোঝা গেল?

ভয়ে হোক বা ভক্তিতে হোক জনতা বলে উঠল, তাই হবে। কিন্তু ভেতরে কী ছিল? তা গেলই বা কোথায়?

জাষ্ক বললেন, সেই চিন্তা তো আমাকেও খাচ্ছে। গেল কোথায়? তারপর প্রহরীটিকে বললেন, পেটিকাটি আন তো—দেখি কার? কোন কিছু চিহ্ন বা নাম এতে খোদাই করা আছে কিনা।

খালি পেটিকাটি হাতে নিয়ে জাষ্ক হাতের তালু দিয়ে ওপরকার ধুলো সরালেন। খোদাই করা একটি নাম স্পষ্ট হয়ে উঠল—মণিকার মণিভদ্র! জাষ্ক যেন চমকে উঠলেন।—আরে! এতো মণিকার পুত্রীর বাবার নাম। মণিকার পুত্রী এখন প্রাসাদ-রমণীদের একজন। এই পেটিকা উদ্ধার করার জন্যই তো সম্রাট গতকাল আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন!

জনতা বলে উঠল, হায় মণিকার পুত্রী! বা-মা গেলেন এই পেটিকার জন্য। সেই পেটিকা যদিও বা পাওয়া গেল—তাও শূন্য!

গর্জন করে উঠলেন জাষ্ক।—এ আমার পরাজয়। আমি ছাড়ব না। এই পেটিকার পশ্চাতে নিশ্চয় তৃতীয় আরও একজন রয়েছে। তাকে আমি ধরবই। হিমালয়ের কোনও গুহায় লুকিয়ে থাকলেও তাকে আমি টেনে বার করব। সম্রাটের প্রশাসন সহস্রচক্ষু! জাষ্ককে সে ফাঁকি দিতে পারবে না। এ আমার প্রতিজ্ঞা। তারপরেই জাষ্ককে যথেষ্ট বিহ্বল দেখাল।—সম্রাটকে আমি মুখ দেখাব কী করে? এ আমার ব্যর্থতা! আমি...!

জনতা জাষ্কের বিলাপে অভিভূত হল। তারা যেন সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, আপনার কী দোষ! এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিটি অপরাধীকেই কি সঙ্গে

সঙ্গে ধরা সম্ভব? সম্রাট বিবেচক। তিনি নিশ্চয় আপনার অসুবিধাটুকু বুঝবেন।

জাষ্ক স্বগোতক্তি করে বললেন, তাই যেন বোঝেন। তারপর কণ্ঠস্বর চড়িয়ে প্রহরীদের আদেশ করলেন, দেহদুটিকে শকটে তোল। মণিকার পুত্রীকে দেখিয়ে সনাক্ত করতে হবে—এই লোকটি দস্যু বাকাটকি কি না। সার্থবাহ-দলপতি ভল্লাটের বর্ণনা অনুযায়ী আমার মনে হচ্ছে এটি দস্যু বাকাটকি। আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। দিনের পর দিন আমার কার্যালয়ে এসে হুং-চা এর সঙ্গে গল্পগুজব করে গেছে! ইস্!

একজন প্রহরী বলে উঠল, আপনি কী করে জানবেন প্রভু? এ তো আসত মধ্যরাতে। আপনি তো তখন শয্যায় থাকতেন। দেখলেও দূর থেকে দু-একবার দেখে থাকবেন—তাতে কি বোঝা যায়!

ঠিক! ঠিক! আমায় তখন কালঘুমে ধরত। সবই আমার কপাল!

জনতার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

সমস্ত করণীয় কাজকর্ম সেরে—অকুস্থলে একজন প্রহরীকে রেখে খুশি মনে জাষ্ক তার কার্যালয়ের দিকে এগিয়ে চললেন। এখন তার কাজ হবে মণিকার পুত্রীকে প্রাসাদ থেকে আনিয়ে বাকাটকির মৃতদেহ সনাক্তকরণ করা। সনাক্তকরণ হয়ে গেলে মণিকার পুত্রী প্রাসাদে ফিরে যাবে—রত্নগুলি চিরকালের জন্য তার কাছেই থেকে যাবে। রইল তৃতীয় ব্যক্তির কথা। তার কাল্পনিক সন্ধান চলবে সমাজ-উৎসবের দিন পর্যন্ত। তারপর কোথায় সম্রাট? কে সম্রাট? নিজের মনে হেসে উঠলেন জাষ্ক।

জাষ্কের নির্দেশমতো একজন প্রহরী ছুটল রাজপ্রাসাদে। মহামিশ্রের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনাটি জানাল এবং বলল, মণিকার পুত্রীকে এখনই একবার কার্যালয়ে যেতে হবে সনাক্তকরণের জন্য। বেশি দেরি হলে মৃতদেহে পচন শুরু হয়ে যাবে। তখন বিষয়টি মণিকার পুত্রীর কাছে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

মহামিশ্র বললেন, বেশ তুমি যাও। আমি মণিকার পুত্রীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর জাষ্কের লোক চলে যেতে মহামিশ্র ভাবলেন, গতকাল সম্রাট চাপ দিলেন আর রাতারাতি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—আশ্চর্য! তিনি বুঝলেন জাষ্ক ধূর্ত—কিন্তু বুদ্ধিহীন। আজ না হয় কাল এই রহস্যের মিমাংসা নিশ্চয় হবে। গুপ্তচর বিভাগ বসে নেই। তারা প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ে একদিন না একদিন প্রকৃত তথ্যটি হাজির করবে। যাহোক, কমলিকাকে সংবাদটি দেবার জন্য দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন মহামিশ্র। কমলিকা প্রস্তুত হলে, তার শকট এবং দেহরক্ষীর ব্যবস্থাও করতে হবে। সে এখন সাধারণ রমণী নয়—প্রাসাদ-রমণী।

কমলিকার প্রতীক্ষায় জাষ্ক কার্যালয়ের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভট্টরাইকে তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন—যদিও জানেন, ভট্টরাই সনাক্ত করতে পারবে না। কারণ, সে অনেক দূর থেকে বাকাটকিকে দেখেছিল।

কমলিকার শকট কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢুকতেই জাষ্ক এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।—আসুন মণিকার পুত্রী! আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জাষ্ক কমলিকাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কক্ষে ঢুকলেন। তারপর বললেন, বসুন। আপনাকে একটা উপহার দোব।

কমলিকা আসনে বসে কৌতুহলী হয়ে জাষ্কের দিকে তাকাতে জাষ্ক পেটিকাটি এগিয়ে দিলেন।—দেখুন চিনতে পারেন কি না।

না চেনার কিছু ছিল না। তার বাবার নাম পরিষ্কার করে খোদাই করা রয়েছে।—কোথায় পেলেন? খালি নিশ্চয়।

মৃতদেহ দুটির কাছে। তৃতীয় কোনও জন রত্নগুলি আগে বা পরে বার করে নিয়ে গেছে—আরও দুটো লড়াই করে মরেছে! তবে চিন্তা করবেন না। রত্নগুলি আমি উদ্ধার করবোই। একটু থেমে জাষ্ক বললেন, এবার আপনি যদি দস্যু বাকাটকিকে সনাক্ত করতে পারেন তবে আমি তৃতীয়জনের সন্ধানে মন দিতে পারি। আমার সন্দেহ মৃত লোকটিই বাকাটকি।

বেশ চলুন। দেখি। তাকে চিনতে তো আমার কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়!

জাষ্ক উঠে কমলিকাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। মৃতদেহ দুটি চাদরে ঢাকা দেওয়া ছিল। একটি প্রহরীকে খুলে দিতে বললেন তিনি।

কমলিকা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, এটি কে?

ও আমার শকট চালক। দ্বিতীয়জনটিকে ভাল করে দেখুন।

কমলিকা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দ্বিতীয় মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে থেকে পেছন ফিরল।—না।—ও বাকাটকি নয়। আমি নিশ্চিত।

হা-হা করে উঠলেন জাষ্ক।—না-না আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। ভাল করে দেখুন। এ নিশ্চয় বাকাটকি!

কমলিকা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর মৃদু হেসে বলল, আপনি কি বলতে চান যে আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে? যে লোকটিকে আমি কিছুদিন ধরে অহর্নিশ দেখেছি, হত্যাকাণ্ডের রাত্রেও দেখেছি—তাকে চিনতে আমার ভুল হবে? আপনিই বা নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কী করে? মনে রাখবেন, রত্নগুলি এখনও উদ্ধার হয়নি। কে সেই তৃতীয়জন? তার সঙ্গে মৃত দুজনের কী সম্পর্ক ছিল—অনুসন্ধান

করুন। কথা শেষ করে কমলিকা এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় চলে এল।

ঘরের ভেতর নিরুপায় ক্রোধে জাষ্ক কমলিকার মুন্ডুপাত করতে থাকল।

কমলিকার চোখে হঠাৎ ধরা পড়ল, প্রাঙ্গণের এক কোণায় ভট্টরাই তাঁর ঘোড়াটিকে বাঁধছে। কমলিকার চোখে খুশির ছায়া জেগে উঠেও মিলিয়ে গেল। ভট্টরাই একবারও তার খোঁজ খবর করল না! একটু অভিমান জাগল কমলিকার মনে। আনমনে দাওয়া থেকে নেমে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল সে।

ভট্টরাই আপন খেয়ালে মাথা নিচু করে আসছিল। সিঁড়ির মুখে বাধা পেয়ে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতেই ভট্টরাই থমমত খেয়ে গেল।—তুমি...আপনি...! হঠাৎ?

কমলিকা বলল, হঠাৎ কেন? এতো আমারই বিষয়। দেখছ না পেটিকাটি ফেরত পেয়ে গেছি!

ও! তাই তো দেখছি। তবে শূন্য নিশ্চয়।

কী করে বুঝলে?

মুখে তাহলে খুশির ছাপ থাকত!

তুমি বলা বুঝি নিষেধ! আমি কি এতই দূরের মানুষ হয়ে গেছি? কেন ভট্টরাই...?

না! না! আসলে এখন তোমার প্রাসাদে অবস্থান। আমি এক সাধারণ মানুষ! তোমাকে সম্ভ্রম করতে হবে বই কি। স্বস্থানে অর্থাৎ প্রাসাদে যাবার আগে একবার জানাতে পারোনি? ব্যঙ্গ করল ভট্টরাই! আমি বাধা দিতাম, না কেঁদে ভাসাতাম?

কমলিকা এবার হাসল, ও এই ব্যাপার! তা তুমি কি আশ্রমে আমার খোঁজে গিয়েছিলে?

উদ্বোধনের দিন যখন আবিষ্কার করলাম যে আমি সত্যিই অকিঞ্চিৎকর এক মানুষ—তখন আর তোমার খোঁজে যাইনি। ভেবেছিলাম, তুমিই আমার খোঁজ করবে। তা করনি।

একটু চুপ করে থাকার পর কমলিকা বলল, সত্য কথা। প্রথম দিকে আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম। তখনও তুমি সম্ভবত পৌঁছাও নি। আচার্য এটা ঠিক পছন্দ করছিলেন না। অতঃপর!

তা ঠিক!

কমলিকা বলল, আমাকে হঠাৎ আশ্রম ছেড়ে যেতে হয়। ওখানে গেলে

জানতে, তোমার কথা আমি বলে এসেছিলাম কিনা!

ভট্টরাই এবার সহজ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। বলল, থাক ওসব। আমরা এখন যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে। পরস্পরকে তুমি বলার সুযোগটুকু থাকলেই যথেষ্ট! বল, কী দেখলে? চিনতে পারলে?

না।

এটা কেমন হল? তবে কি সেই লোকটা...?

প্রাঙ্গণে নেমে এসে ফিসফিস করে কমলিকা বলল, আমি ইচ্ছে করেই চিনতে চাইনি।

ভট্টরাই বলল, ভালই করেছ। জাষ্ক নাটক করছে। রত্নগুলো ওর কাছেই আছে। ও চাইছে রত্নের প্রসঙ্গটি চাপা পড়ুক। আর আমাকে ডেকে পাঠানোর তো কোন অর্থ হয় না। আমি তো চিনতেই পারব না। তবে রত্নের বিষয়টি চাপা পড়ার সম্ভাবনা কম। সার্থবাহ দলের দলপতি ভল্লাটক এখন সম্ভবত পুষ্কলাবতীতে বসে নেই। থাকলেও সনাক্তকরনের জন্য তাকে আনাতে আনাতে মৃতদেহ পচে যাবে। তখন সনাক্তকরণের প্রশ্নটা উঠবে না।

কমলিকা বলল, যা হোক, তোমার কি মনে হয় যে হুং-চা, আর বাকাটকি লড়াই করে মরেছে ঐ রত্নের জন্য?

মোটেও না। বলেছি তো এ হচ্ছে জাষ্কের সাজানো নাটক। সেই নাটক চুরমার করে দিয়েছ তুমি!

কমলিকা তার শকটের দিকে হাঁটা শুরু করে দিল। সঙ্গে এগোল ভট্টরাই। সে বলল, বাকাটকির কথা সারা সাম্রাজ্যে প্রচারিত হয়েছে—আর সে কিনা কার্যালয়ে হুং-চা-র সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসত! এ কথা বিশ্বাস করতে হবে? হুং-চা এত কালের শকট-চালক আর তার সঙ্গে কিনা দস্যুদের যোগাযোগ? জাষ্ক কি আমাদের বোকা ভাবে? তুমি মহামিশ্রকে সব জানাবে। আমার আর বিষ্কের অনেক কাথাও তাকে জানাবার আছে। আমরা জাষ্কের ওপর কিছুদিন ধরে লক্ষ রাখছি!

কমলিকা শকটে উঠে পড়ল, আসি!

এস। ভট্টরাইয়ের মনটা হঠাৎই বিষণ্ণ হয়ে গেল। ভাবল, রাজপ্রাসাদের পরিচর্যার মধ্যে থেকে কমলিকা যেন আরও রূপবতী হয়ে উঠেছে। তার ইচ্ছে হল, কমলিকাকে বলে সে কথা। কিন্তু না। সে সংযত হয়ে ভাবল, কমলিকা এখন সম্রাটের কাছে উৎসর্গীকৃত। তার থেকে বহুদূরে। তাকে এসব কথা বলার অর্থ ধৃষ্টতা প্রকাশ করা। তবু তো সে ভাগ্যবান। কার্যালয়ের এই সমস্ত মানুষের

সামনে এই অসামান্যা তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছে। অনেকেই হয়ত তার এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। গর্ব অনুভব করার চেষ্টা করল ভট্টরাই। কিন্তু পারল না। পরিবর্তে তার মন যেন কেমন হু-হু করে উঠল। বিষণ্ন মুখে সে জাষ্কের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল।

মহামিশ্র প্রাসাদে তাঁর কার্যালয়ে কমলিকার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এক সময় পেটিকা হাতে তাকে প্রবেশ করতে দেখে হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, কী! রত্ন ফেরত পেয়েছ?

মৃদু হেসে কমলিকা পেটিকাটি মহামিশ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শূন্য! রঙ্গমঞ্চে তৃতীয় জনের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই সম্ভবত রত্নগুলি হাতিয়েছে। অন্তত জাষ্কের তো সেইরকমই অনুমান।

মহামিশ্র বললেন, সে আবার কী?

কমলিকা বলল, জাষ্ককে প্রশ্ন করুন। আমাকে তো সে তাই বোঝাল! দস্যুটিকে সনাক্ত করা গেছে?

না।

কেন?

আমি করতে চাইনি। আমি চিনতে অস্বীকার করেছি ইচ্ছে করে। জাষ্কের গল্প আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। আমার মনে হয়, সে ঐ দুজনকে পরিকল্পনা করে হত্যা করেছে। রত্নের বিষয়টি চাপা দেবার জন্য ঐ তৃতীয়জনকে নিয়ে এসেছে। একদিকে অবশ্য সে ঠিক কথাই বলেছে। তৃতীয়জন হচ্ছে সে স্বয়ং। যাহোক ভট্টরাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। জাষ্ক তাকেও অহেতুক ডেকে পাঠিয়েছে! তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, বিষ্ক আর ভট্টরাই আজ কিছুদিন যাবৎ জাষ্কের ওপর লক্ষ রাখছে। ওকে একবার ডাকিয়ে সব শুনুন না কেন?

মহামিশ্র চিন্তিত ভাবে বললেন, ওরা লক্ষ রাখছে কেন? রাজকীয় গূঢ়-পুরুষেরা কী করছে?

তারা হয়ত তাদের কাজ করছে। ওদের ডেকে প্রশ্ন করলেই সব জানতে পারবেন। আচ্ছা, আমি আসছি। কমলিকা উঠে দাঁড়াল।

মহামিশ্রও উঠে দাঁড়ালেন।—ও! একটা কথা। সম্রাট কয়েক দিনের মধ্যে

কণিষ্কপুরের মহাসম্মেলনে যোগদান করতে যাবেন। তুমি আর সত্যা যাচ্ছ। আরও জনা তিনেকের নাম ঠিক করতে বলেছি তাকে। দশ বারোজন দাসদাসীও সঙ্গে যাবে। সম্রাট ওখানকার প্রশাসকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বেশি লোকজন সঙ্গে নিতে চাইছেন না।

কমলিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—আমি কৃতার্থ হব। কমলিকা নিজের কাজে ফিরে গেল।

অপসৃয়মাণ কমলিকার দিকে তাকিয়ে মহামিশ্র ভাবলেন, সত্যিই বুদ্ধিমতী এই কমলিকা। সম্রাট যদি কোনদিন সাংসারিক জীবনে ফিরে আসেন—তবে এই কমলিকাই হবে সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত। অন্য সব প্রাসাদ রমণীরা সবাই উচ্চ ঘরের হলেও কমলিকার সমকক্ষ কাউকে দেখতে পান না মহামিশ্র। রূপে,গুণে, স্বভাবে, হৃদয় ঔদার্যে সে অতুলনীয়া। কমলিকা ইতিমধ্যেই সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। অন্যরা যা এযাবৎ কাল পর্যন্ত পারেনি। বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কমলিকাকে তিনি নির্বাচন করে কণিষ্কপুরে পাঠাচ্ছেন। সম্রাট যে নির্দিষ্ট কোন প্রাসাদ-রমণীকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলবেন—এমনটা নয়। কারণ, তিনি বিভেদ সৃষ্টি করতে চান না। নেহাৎ যেটুকু না হলে চলে না—সেটুকু বলেন এবং তাও মহামিশ্রকে। কমলিকাকে দেখে প্রথম দর্শনেই যে সম্রাট সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা কমলিকার নিযুক্তির অনুমোদনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। যা হোক, সম্রাট প্রাসাদ-রমণীদের বিষয়ে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ থাকাই পছন্দ করেন।

কণিষ্কপুরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংহতির উদ্বোধনের দিন সমাগত। সম্রাট কণিষ্কপুরে পৌঁছলেই সম্মেলন শুরু হবে। এখন সম্রাটের আসার জন্য প্রতীক্ষা।

উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কোল দিয়ে পথ চলে গেছে। এক দিকে পাহাড়। অন্যদিকে অতলস্পর্শী খাদ। দেখলে গা ছমছম করে। যূথবদ্ধ ভাবে সম্রাটের শকটগুলি এবং অন্যান্যেরা এগিয়ে চলেছিল। সর্বপ্রথম একদল অশ্বারোহী সেনা। তাদের পেছনে সম্রাটের রাজকীয় শকট। অঙ্গ-রক্ষকদের দ্বারা বেষ্টিত। সেই শকটের পেছনে যথাক্রমে প্রাসাদ-রমণীরা—দাসদাসীরা। তাদের পরে রসদবাহী কিছু শকট। সর্বশেষে আরও একদল অশ্বারোহী সেনা। পদে পদে বাঁক।

শকটের জানালা দিয়ে দূর পর্বতগুলির দিকে তাকিয়েছিল কমলিকা।

পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণির শিখরে শিখরে তুষার আবরণ। সুনীল আকাশ। কোথাও বা পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণা ধারা। নিচে সবুজ উপত্যকা ভূমি। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য কমলিকা আগে কখনো দেখেনি। চন্দ্রভাগার তীরে তার অজাত নগরের সৌন্দর্য ভিন্নধর্মী। সেখানেও রয়েছে পাহাড়ের সারি। তারই মধ্য দিয়ে ভীম গর্জনে ছুটে চলেছে চন্দ্রভাগা। বর্ষায় তা ফুলে ফেঁপে ওঠে। শীতে হিমালয়ের বরফের স্তূপ ভাসে। সে নদী কোথাও অগভীর। কোথাও গভীর। কোথাও বা তীব্র খরস্রোতা, সংকীর্ণ। আবার কোথাও গভীর শান্ত—প্রশস্ত! স্বচ্ছ কাকচক্ষু জল। তলের নীচের নুড়িপাথরগুলি পর্যন্ত দেখা যায়। প্রায় আড়াইশত বছর আগে যবনবীর আলেকজান্ডার এই নদী পার হতে গিয়ে প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সামনা-সামনি হয়েছিলেন। তবুও চন্দ্রভাগা তিনি পার হন।

কমলিকা জানে, কণিষ্কপুরের অদূরেই রয়েছে সম্রাট অশোকের শ্রীনগর। চিনার গাছের ছাওয়া, সেই নগর অজস্র হ্রদ—উদ্যান-ঝর্ণায় শোভিত। গ্রীষ্মে যখন উপত্যকায় ফুল ফোটে—সারা উপত্যকা যেন হেসে ওঠে। নীল চক্ষু হ্রদে আকাশের ছায়া। মনে হবে যক্ষিণী, কিন্নরীরা এখানেই জল বিহার করে। বরফগলা জলে পূর্ণ থাকে বিতস্তা। কশ্যপপুরার মাঝ দিয়ে বয়ে চলে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে।

শকটের মধ্যে তখন নিস্তব্ধতা। সবাই প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিভোর—মুগ্ধ।

মন্ত্রী ইউনাসের পুত্রী জানুকা একটু নড়ে চড়ে বসল। সে লক্ষ করছিল কমলিকাকে। এক সময় সে তাকে ব্যঙ্গ করে সত্যাকে বলে উঠল, দেখ, সত্যা! কমলিকা বোধহয় সম্রাটের ধ্যান করছে।

সত্যা বিরক্ত হল। বলল, তাই যদি করে তবে অন্যায়টা কী? আমরা সবাইতো কায়মনোবাক্যে সম্রাটেরই ধ্যান করছি। নচেৎ এখানে আসলি কেন? অবশ্য তোরা বলতে পারিস, সম্রাটের কৃপা না পেলে তোদের উপযুক্ত পাত্র তোদের বাবা-মা-ই জুটিয়ে দেবে। এই মেয়েটির কী হবে? ওর যাবার জায়গাই বা কোথায়? ওর যা রূপ—যা দেহের সৌষ্ঠব তাতে বুভুক্ষ পুরুষগুলো একলা পেলেই তো ওকে ছিঁড়ে খাবে। সুতরাং, সম্রাটের ধ্যান করা ছাড়া ওর উপায় বা কী? তোদের ভাল না লাগলে পড়ে আছিস কেন এখানে? চলে যা না বাপের বাড়ি...!

বল্লভী বলে উঠল, ইস আর কী! আমরা সরে যাই আর ও সম্রাটকে দখল করুক। কী সুন্দর কথা!

জানুকা বলল, তা সত্যা, তুই বা কেন পড়ে আছিস? তুই গেলে আমাদের অন্তত একজন প্রতিযোগী কমে!

সত্যা বলল, যাবই তো! তোদের একজন যেদিন সম্রাটের কোলে চড়ে বসবি—সেদিনই আমি পালাব। উপপত্নী হবার জন্য এখানে পড়ে থাকব না। আমার একজন প্রেমিক আছে—জানিস তো! বেচারি মুখ শুক্ল করে মাঝে মাঝে প্রাসাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আমার বড় কষ্ট হয় রে!

বল্লভী বলল, আহা! মরি মরি! তা পালাচ্ছিসই বা না কেন?

বাবার ভয়। পালিয়ে যাব কোথায়? বাবার হাতের নাগাল ছাড়াতে পারব? তাঁর হাত কী কম লম্বা! আমাকে সম্রাজ্ঞী করার কত সখ! বাবার ইচ্ছে, সম্রাট যদি কপালে না জোটেও—তবে যে কোন রাজপুরুষকে ধরে ঝুলে পড়তে হবে। ওসব গান্ধার শিল্পী-টিল্পী চলবে না!

জানুকা আর বল্লভী বলল, বেচারা!

সত্যা বলল, বেচারাই বটে! তবু আমার আশা ছাড়বে না। ও জানে না, আমাদের বাবারা কত স্বার্থপর। মেয়েদের জীবনের সুখ-শান্তির কোন মূল্য নেই ওদের কাছে। ওরা জানে, মেয়েরা যদি সম্রাটকে গাঁথতে সফল হয় তাহলে তাদের ভাগ্যও সফল হবে। রাজ্য শাসনের সুখ আস্বাদন করতে পারবে। প্রয়োজনে তাঁরা অবাধ্য মেয়েকে হত্যাও করতে পারে।

আনন্দের মধ্যে যেন এক বিষাদ ঘনিয়ে এল। কমলিকা তা লক্ষ করে পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বলল, এসব আলোচনা থাক। এখনও সময় আছে। যৌবন যাবার আগে রণে ভঙ্গ দেওয়াই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে। নইলে হয়ত একুল-ওকুল দুকূলই যাবে। সম্রাটের জন্য আমরা আজীবন কুমারীব্রত নিয়ে বসে থাকব—এমন কথাটাও আমরা নিশ্চয় কেউ ভাবিনি। যদি ভেবে থাকে কেউ—তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। হয় সম্রাট, নয় অন্য কোন রাজপুরুষ—আর নয়ত আমার মতো শুধুই সম্রাটের ধ্যান কর। আমার তো যাবার অন্য কোন জায়গা নেই। পাত্র খুঁজে আমার বিয়ে দেবারও কেউ নেই। আমি কারোকে ঈর্ষা করি না। তোরাও নিশ্চয় আমায় করিস না। সবই ভাগ্য! নইলে আমার এ অবস্থা কেন হবে। রাগ করিস না, ধনজনমানে আমিও তো কিছু কম ছিলাম না!

সত্যা বলল, তুই একটি বোকা। মহামিশ্রের কাছে আমি শুনেছি, তোদের বিশাল ভূসম্পত্তি তুই অবহেলায় আচার্য চরকের আশ্রমকে দান করে দিয়েছিস। কেন? নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবলি না?

কমলিকা বলল, সত্যি বলতে কি আমার চাহিদা অল্প। আমার যেটুকু অলংকার আছে তা বেচে কষ্টেসিষ্টে আমার দিন চলে যাওয়ার কথা। আসলে আমি যা চেয়েছিলাম, তা হচ্ছে এক নিরাপদ আশ্রয়, আর সামান্য একটি কর্ম। মহামিশ্র আমাকে তোদের দলে যুক্ত করেছেন ঠিকই। আসলে আমি তাঁর কাছে একটি সভ্য-ভব্য কর্মের জন্যই অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমি তাই নিজেকে ঠিক প্রাসাদ-রমণীদের এক জন বলে ভাবতে পারি না। ভাবি এটিই আমার কর্ম। মহামিশ্রের সহযোগী। সুতরাং...। বিষণ্ণ হয়ে লাভ নেই।

কমলিকা হাসল। সবাই হাসল।

অপরাহ্নে সম্রাট পৌঁছলেন কণিষ্কপুরে। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। তটস্থ হয়ে উঠল কর্মচারিরা।

আগাম সংবাদ পেয়ে কণিষ্কপুরের প্রশাসক শিবির প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। বৃত্তাকার সেই ব্যবস্থা। কেন্দ্রে সম্রাটের বিশাল শিবির। যতদূর সম্ভব রাজকীয় সাজসজ্জার ও উপকরণের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। সম্রাটের শিবির ঘিরে চার প্রাসাদ-রমণীদের শিবির। সেই শিবিরকে ঘিরে দাসদাসীদের শিবির। এরপর যথাক্রমে দেহরক্ষীবাহিনী আর সর্বশেষে সেনাবাহিনী।

সম্রাট শকট থেকে নেমে নিজের শিবিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি এবং বৌদ্ধ সংঘের অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, সংঘ- রক্ষিত আদি বৌদ্ধ শ্রমণেরা। মহামিশ্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন কণিষ্কপুরেরই এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি। সম্রাট তাঁকেই তাঁর শিবিরসজ্জা ও অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে অতিথিদের সঙ্গেই আগামী কালের সভাস্থল দেখতে বেরিয়ে পড়লেন।

সম্রাট বেরিয়ে যাবার পরই রাজপুরুষটি প্রাসাদ-রমণীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, দেবীরা! সম্রাট তাঁর শিবিরসজ্জার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বলেছেন, দেবী কমলিকা যেন তাঁর শিবিরটি সজ্জিত করে অন্যান্য দেবীদের সহায়তায়। আর আপনারা সম্রাটের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তো জানেনই। আমি বিরুপাক। প্রয়োজনে আমায় ডেকে পাঠাবেন।

বিরুপাক বিদায় নিতেই সত্যা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল কমলিকার ওপর।

—তুই কি জাদু করেছিস সম্রাটকে! কক্ষ-সজ্জা তুই ছাড়া হয় না?

কমলিকা সত্যার ঠাট্টা বুঝতে পেরে রাগ করল না। বলল, আমি তো কক্ষ-সজ্জা করার অধিকারিণী। সম্রাটের শয়ন-শয্যাটির দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়। ও দায়িত্ব তোমরা কেউ নিতে পার।

কপট ক্রোধে সত্যা বলল, দাঁড়া! মজা দেখাচ্ছি।

সম্রাটের শিবিরটি বিশাল। রাজপ্রাসাদের অনুকরণেই রঙিন মোটা কার্পাস বস্ত্র দিয়ে শিবিরটির অভ্যন্তরভাগ নানান কক্ষে ভাগ করা হয়েছে। শয্যাকক্ষ, স্নানকক্ষ, আহারকক্ষ, দর্শনদানেরকক্ষ, পরামর্শকক্ষ...।

সত্যা, জানুকা আর বল্লভী অন্যান্য দিকে নজর দিল, শয্যাকক্ষ নিয়ে পড়ল কমলিকা। সম্রাট ফুল ভালবাসেন, তাই নানান রঙের ফুলের এক সম্ভার রাখা ছিল কক্ষে। কমলিকা দ্রুত চিন্তা করল, সম্রাট এখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসেছেন। কক্ষে এক ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করাই তার উচিত হবে। পবিত্র ফুল গাঁদা—দেবার্চনায় ব্যবহৃত হয়। কমলিকা গাঁদা আর বুদ্ধ-প্রতীক পদ্ম ফুল গুলিকে আলাদা করে নিল। নতুন ছন্দে, নতুন ছাঁদে সে গড়ে তুলল পুষ্প স্তবকগুলি। আজ কামনার প্রতীক গোলাপ নয়। অন্যান্য ফুলগুলিকে সে শিবিরের নানা স্থানে ব্যবহার করল। এক সময় সে ক্লান্তও হয়ে উঠল। বিশ্রামের জন্য অন্য সকলের সঙ্গে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেল। স্নানাহার করতে হবে। এখানে পা রাখা অবধি সে সুযোগ তারা কেউই পায়নি। সম্রাট স্নান সেরে গেছেন। আহার করেন নি। হয়ত সভাকক্ষে অন্যান্য সকলের সঙ্গে তা করে থাকতেও পারেন।

বল্লভী যেন মুখিয়ে ছিল।—বাসর সাজান হল? হায়! ডাক তো এল না। বৃথা যায় নিশিদিন।

সত্যা বিরক্ত হয়ে বলল, আবার শুরু করেছিল, বুঝেছি। যৌবন জ্বালায় জ্বলছিস। সম্রাট নয়। যে কোন পুরুষ এখন তোদের কাম্য। পুরুষপুরে ফিরে আমি মহামিশ্রকে বলব।

বল্লভী বলল, আহা! একটু ঠাট্টা তামাশা করেও কি নিজেদের একটু স্থির করতে পারব না? পুরুষের আদর খাবার বয়স কি আমাদের হয়নি? তুই যেমন বলছিস! দেখিস। ভ্রূকুটি করল বল্লভী। আমরা তো ফুটন্ত ফুল। মৌমাছির ছোঁয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। এর মধ্যে লুকোচুরির কী আছে?

সত্যা বলল, মর! চল—চল। স্নানাহার সেরে নে। সম্রাট ফিরলে আবার ওদিকে ছুটতে হবে।

কণিষ্ক যখন ফিরলেন তখন সূর্য অস্ত গিয়ে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। কিছু পরেই চাঁদ উঠবে। সম্রাট নিজেও ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। পথে ঠিক বিশ্রাম পাননি। বরফ শোভিত পীর-পাঞ্জালের শোভায় বিভোর হয়েছিলেন। তারপর তো শিবির থেকে বেরিয়েই সভাগৃহ। নানান আলোচনা। পাঁচশতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে গেছে। তাদের আহার-বাসস্থান সম্পর্কে অনুজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দান। উদ্বোধনের বিষয়সূচি প্রণয়ন করা। দেশ-দেশান্তরে পাঠাবার জন্য অর্হৎদের নাম সংকলন করা। মহাপুরুষদের নানান দেহ সৌষ্ঠব অবলম্বন করে গান্ধার শিল্পীদের দ্বারা বোধিসত্ত্ব ও শেষ বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধের দুটি মূর্তি প্রস্তুত করে ঢেকে রাখা হয়েছে। বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ কার্য অনুমোদিত হলে মূর্তি দুটির আবরণ উন্মোচন করা হবে। অতঃপর পৃথিবীর যাবতীয় বুদ্ধমূর্তি এই মূর্তির অনুকরণে প্রস্তুত করা হবে। ফলে, বুদ্ধের বিবিধ মূর্তির জটিলতা আর থাকবে না। প্রতিটি জাতক কাহিনিকে চিত্রায়িত অথবা খোদিত করা হবে।

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের সেই মূর্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে সম্রাটকে। বুদ্ধের সেই মূর্তির কথা স্মরণ করতে করতে সম্রাট তাঁর শিবিরে প্রবেশ করলেন। শয্যাকক্ষে প্রবেশ করে বিস্ফারিত হলেন ফুলসজ্জা দেখে। গাঁদা ফুলের পুষ্পস্তবক আর একটি কাঠের বেদির ওপর রাখা একটি বড় পদ্ম সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সম্রাট যেন দেখতে পেলেন পদ্মাসনে বসে রয়েছেন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ। কক্ষের এই ধর্মীয় পরিমন্ডল সম্রাটকে মুগ্ধ করল। পদ্মফুলটির সামনে ভূমিতে বসেই সম্রাট বুদ্ধকে প্রণতি জানালেন।

সম্রাট কতক্ষণ এভাবে বসেছিলেন—ঠিক তা জানেন না। এক সময় এক পরিচারিকার পায়ের শব্দে বাস্তবে ফিরে এলেন।

সম্রাট সম্ভবত আজ অভুক্ত রয়েছেন। তাই প্রাসাদ-রমণীরা আপনাকে আহার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

সম্রাট সত্যিই ক্ষুধার্ত বোধ করলেন। বললেন, চল। আমি আসছি।

আহার সেরে শয্যায় আশ্রয় নিয়ে সম্রাট আজ এক অস্বস্তিবোধ করলেন। তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল কমলিকা। তিনি ভাবলেন, কেমন করে এই রমণী তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কথা জানল? সম্রাট এই মুহূর্তে নিজের কাছে অনেক খোলামেলা হয়ে উঠলেন। তিনি আপাত নির্লিপ্ত হলেও অস্বীকার করতে পারেন না যে তিনি কমলিকাকে কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করছেন। তার প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব ব্যাঞ্জক মুখটি, তাঁর আয়তচোখের গভীর দৃষ্টি যেন বারবার অলক্ষ্যে তাঁকে বিদ্ধ

করে। শব্দহীন স্বরে কমলিকা যেন তাঁকে কিছু নিবেদন করতে চায়। কমলিকা কাছাকাছি উপস্থিত হলে তাঁর ভেতরে সম্প্রতি যেন কেমন এক কম্পন জাগে। অথচ অন্যান্য প্রাসাদ-রমণীদের কেমন যেন যন্ত্রবৎ বলে মনে হয়। তাঁদের কাজে তিনি কোন প্রাণের সাড়া পাননি। কিন্তু কেন, মণিকার পুত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর এই বিশেষ অনুভব?

একসময় সম্রাট সচেতন হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, না। এ অন্যায়! তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। শিঘ্র তিনি প্রাসাদ-রমণীদের গৃহে ফিরে যেতে বলবেন। বৃথা এক আশায় তারা নিজেদের রূপ-যৌবন নষ্ট করছে দিনের পর দিন। কারোকে অহেতুক আশা দেওয়া এক অপরাধ। বুদ্ধ যেন তাঁর এই অপরাধ ক্ষমা করেন। সম্রাট পদ্মফুলটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সভাগৃহ বৌদ্ধ প্রতিনিধিরা পূর্ণ করে তুলল। প্রভাতে ত্রিশরণ মন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠল কণিষ্কপুরের আকাশ বাতাস। সম্রাট, অশ্বঘোষ, বসুমিত্রের নামে জয়ধ্বনি উঠতে থাকল। বহুকষ্টে অশ্বঘোষ দর্শকদের চুপ করিয়ে বললেন, আজ এই পবিত্র দিনে সম্রাট কণিষ্ক এই মহাসম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে দু'চার কথা বলবেন। আপনারা সম্রাটকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাঁকে তাঁর ভাষণ দান করার সুযোগ করে দিন।

সম্রাট মঞ্চে তাঁর ভাষণ রাখতে উঠলেন। সম্রাট বললেন, আজ এই চতুর্থ বৌদ্ধ-সংহতি উদ্বোধন করতে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এর পূর্বে আরও তিনটি বৌদ্ধ সংহতি হয়ে গেছে তা আপনারা নিশ্চয় জানেন। প্রথমটি বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় সংঘটিত হয়েছিল। তারপর বৈশালী, পাটলিপুত্র এবং আজ কণিষ্কপুরে। কিন্তু প্রথম দিন থেকে যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তার কোন মিমাংসা তো হয়নি বরং বহুগুণে বেড়ে গেছে। কারণ, বৌদ্ধধর্মের অনুরাগীদের সংখ্যা তখন কম ছিল—আজ তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বর্হিভারতীয় ধর্মের সঙ্গেও তাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমার বিশাল সাম্রাজ্যে রয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি, যেমন যবন—গ্রীক, সুমেরীয়, এলামাইট, মিথরেইক, জরাথুষ্টবাদী, নির্গ্রন্থ এবং হিন্দু বা সনাতনধর্মীরা। তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস। প্রতিবেশী হিসাবে রয়েছে রোমকরা——তারাও যবন আর সনাতনপন্থীদের মতোই পৌত্তলিক। কিন্তু রোম

বা ঐ অঞ্চল ঘিরে খ্রিস্ট নামে নতুন এক ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। আজ এইসব জাতি বা ধর্মের মানুষের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ এবং ওঠাবসা। শক্-পহ্লবেরা আজ এদেশেরও অধিবাসী। তাই এদের প্রভাবও আমাদের ধর্মের ওপর পড়ে নিত্য নতুন অভিঘাত সৃষ্টি করছে। ফলে, কালের নিয়মে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে প্রধানত দুটি মতবাদের সংঘাতেই আমাদের ধর্ম এগিয়ে চলেছে—সেটি থেরবাদ এবং মহাসংঘিক। আজ আমাদের এই দুটি মতবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে আমরা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হব। বুদ্ধকে বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হব।

আমি বৌদ্ধপন্ডিত বা দার্শনিক নই। আমি যোদ্ধা। রাজনীতিক। এই সমস্যার সমাধান করবেন আমার সাম্রাজ্য থেকে আগত বিভিন্ন পন্ডিতেরা এবং পুরুষপুর মহাসংঘের নেতা অশ্বঘোষ, বসুমিত্র এবং সংঘরক্ষিত প্রমুখ পন্ডিতেরা। বুদ্ধের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সম্মেলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বুদ্ধচরিত প্রণেতা অশ্বঘোষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্রাট নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

অশ্বঘোষ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন : ভগবান বুদ্ধের জীবনকথা আপনারা সবাই জানেন। আমি আবার তা উল্লেখ না করেও বলতে চাই জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর সরূপ দেখে মানবপ্রেমী বুদ্ধ চিন্তিত হয়ে এই ত্রয়ী কষ্টের হাত থেকে মানবকে উদ্ধার করার পথ খুঁজতে থাকেন। তিনি সংসার ত্যাগ করে—যৌবনবতী স্ত্রী যশোধারা এবং পুত্র রাহুলকে ত্যাগ করে পথে এসে নামেন। পরিশেষে তিনি গয়ার কাছে উরুবিল্ব গ্রামে এক বটবৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থ হয়ে বোধি লাভ করে বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সেসব আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর আগেকার কথা। একে একে মানুষ তাঁর প্রচারিত সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে। বুদ্ধ হয়ে ওঠেন মানবের মুক্তিদাতা। দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর বাণী। বুদ্ধের পথ হয়ে উঠল বেদ বিরোধী। যাগযজ্ঞ নয়। সরল সাধারণ জীবনযাত্রার পথেই বুদ্ধ নির্দেশ করলেন মানব মুক্তি। পুনর্জন্মের কষ্টের হাত থেকে তিনি মানবকে দেখালেন মহানির্বাণের পথ। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। সমস্যা দেখা দিল তাঁর মৃত্যুর পর। বুদ্ধের সব উপদেশ এবং কথাবার্তা—সবই ছিল অলিখিত। ফলে সঠিক, বেঠিক নিয়ে তর্ক শুরু হল। রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার সম্মেলন সেই সমস্যার সমাধান করতে পারল না। বৌদ্ধরা স্পষ্টতই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। থেরবাদী এবং মহাসংঘিক যা আজ মহাযান নামে খ্যাত। আর একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটল—তা হচ্ছে বুদ্ধের

মূর্তি পূজা। বুদ্ধ স্বয়ং একদা নিজের মূর্তি পূজার সমর্থন করেন নি। তিনি ব্যক্তি মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু মহাযানীরা মনে করেন তিনি ব্যষ্টির মুক্তির পথ প্রদর্শক। যাহোক, অধিকাংশ বুদ্ধশিষ্যেরা এখন মনে করেন যে বুদ্ধের মূর্তির প্রয়োজন। এবং বিভিন্ন দেশে তার রূপ একই হওয়ারও প্রয়োজন। ভারতবাসীর কাছে নিরাকারের সাধনা করা সহজসাধ্য। কারণ, এখানে ব্রহ্মচর্চা রয়েছে এবং তা আছে পৌত্তলিকদের সমান্তরাল ভাবেই। কিন্তু বিদেশীদের কাছে তা একটু দুরূহ ব্যাপার। কারণ বর্হিভারতে বেশির ভাগ ধর্মের মধ্যে রয়েছে মূর্তি পূজা। সেই মূর্তির দাবি আমাদের মধ্যেও উঠছে। গান্ধার-শিল্পীরা তাঁদের মনোমত মূর্তি রচনায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে বুদ্ধের এবং বেধিসত্ত্বের কোন মূর্তি অনুমোদিত না হলে অসুবিধার কারণ হবে। স্থান বিশেষে—দেশ বিশেষে বিভিন্ন রকমের মূর্তি হবে—এ হয় না। তাই আমরা কেন্দ্রীয় ভাবে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মাণ করিয়েছি। অতঃপর বুদ্ধের অপরাপর মূর্তি এই মূর্তির অনুকরণেই হবে। আমি সম্রাটকে অনুরোধ করব—মূর্তি দুটির আবরণ উন্মোচন করতে।

সম্রাট মূর্তি দুটির আবরণ উন্মোচন করলেন।

সভাগৃহ পদ্মাসীন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বুদ্ধের পবিত্র নামে সভাস্থল পূর্ণ হল।

দর্শকেরা একটু শান্ত হলে অশ্বঘোষ বললেন, আজ থেকে আমাদের ধর্মে দুটি ভাগ হল, হীনযান এবং মহাযান। এসবের ব্যাখ্যা তো আপনারা আগেই শুনেছেন। যাঁরা বুদ্ধের আদি উপদেশেই বিশ্বাস রাখেন তাঁরা হীনযানী, কারণ সংখ্যায় তাঁরা অল্প। আর আমরা মহাযানী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্ব ভারত, দক্ষিণ ভারত, তাম্রপর্ণী, সুবর্ণভূমি—এঁরা হীনযানী। উত্তর ও বর্হিভারত—হিমালয় সংলগ্ন দেশ অতঃপর মহাযানী সম্প্রদায়ভুক্ত হল।

সভার সকলে অশ্বঘোষকে অনুমোদন করল।

অশ্বঘোষ আসনে ফিরে যেতে বসুমিত্র উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আরও একটা কথা। এ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে। এবার থেকে আমরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করব। অতঃপর আমরা শাস্ত্র নিয়ে বিতর্কে যাব—এবং যথারীতি টিকা-টিপ্পনীও প্রস্তুত করা হবে। এই টিকা-টিপ্পনীগুলি একত্রিত করলে তা 'মহাভিভাষ্য' নামে পরিচিত হবে।

সম্রাট বললেন, এবার আমায় শিবিরে ফিরে যাবার অনুমতি দিন। কারণ,

আমি রাজনীতিক। ধর্মশাস্ত্রে আমার কোন দক্ষতা নেই। মহাপন্ডিত-দার্শনিকেরা এখানে আছেন। তাঁরাই আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসুন। তাঁদের সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাব।

সেদিন ভট্টরাই বিষ্ককে বলল, সম্রাট এখন কণিষ্কপুরে। সুতরাং প্রশাসনিক ভাবে জাষ্কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়াও অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। গূঢ়পুরুষেরা জাষ্কের ওপর কতটা লক্ষ রেখেছে—তা আমাদের অজ্ঞাত। সম্রাট বললেও, তাদের মধ্যে একটি দ্বিধার ভাব রয়েছে বলে মনে হয়। হয় তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না আর না হয় তারা জাষ্কের লোক। কিংবা ভয় পাচ্ছে জাষ্কের ক্রূরতার জন্য। প্রতিশোধ হিসাবে জাষ্ক তাদের পরিবারের কর্মক্ষম কোনও সদস্যকে মিথ্যা অভিযোগে বন্ধনাগারে ফেলে রেখে সেবা করবে। সম্রাটের কাছে আবেদন, নিষ্পত্তি সব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া নগরাধ্যক্ষ হওয়ার সুযোগে গূঢ়পুরুষেরা অধিকাংশই জাষ্কের পরিচিত। অন্যদিকে জাষ্কও জানে যে সম্রাটের এখন যে মানসিক স্থিতি—বুদ্ধকে নিয়ে তিনি যেভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁর পক্ষে সহসা হিউ-পিনানের আত্মীয় জাষ্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া একটু অসুবিধা জনক। সম্রাটকে সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। সেই তেজস্বী—দুঃসাহসী সম্রাট আর নেই! তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে।

বিষ্ক বলল, আমার মনে হয় জাষ্কের পেছনে কোন শক্তি ক্রিয়াশীল। নইলে জাষ্ক যাই হোক না কেন—এক সামান্য নগরাধ্যক্ষ ছাড়া তো কিছুই নয়। এই বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করা—ইউ-চি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগানো—এসব একার কাজ নয়। জাষ্কের কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকারী আছে নিশ্চয়—কিন্তু তারাও যথেষ্ট নয়। তবে কে বা কারা...?

ভট্টরাই বলল, একজনকে তো আমরা স্পষ্টই দেখচে পাচ্ছি—হিউ-পিনান। বল্খের রাজধানী তা-হিয়ায় বসে তিনি যে কী কলকাঠি নাড়ছেন তা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা তো এই তোরণ দ্বারেই আবদ্ধ।

আর একটা কথা দেখ, গুপ্তচরেরা জাষ্কের ওপর দিবাভাগে নজর রাখে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু জাষ্কের ক্রিয়া কলাপ যে রাতের অন্ধকারেই শুরু হয় তা তাদের জানা নেই বলে আমি মনে করি। তাই গূঢ়পুরুষেরা জাষ্কের সঙ্গে অন্য কারোর যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পারেনি।

আমাদের পক্ষেও বা ঐ ভিখারিটার দ্বারাও সেই কাজ সম্ভব নয়। অতএব...! ভট্টরাই থামল।

অতএব কী?

ভট্টরাই বলল, আমাদের সম্পূর্ণ বিষয়টি মহামিশ্রকে জানানো উচিত। ভিখারিটি আমাদের যা যা বলেছে—তা তাঁর বিবেচ্য। আসল কথা, সে হুং-চা কে কখনই রাত্রে ঐ আগন্তুকের সঙ্গে কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে বসে কথা বলতে দেখেনি। অথচ সে যে প্রায়ই কার্যালয়ে আসত এবং খানিকপরে চলে যেত এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। তাহলে ঐ আগন্তুক কার সঙ্গে দেখা করত?

দ্বিতীয়ত, হিউ-পিনান সেদিন সকলের বিদায় নেবার অনেক পরে কার্যালয় থেকে বেরিয়েছিলেন—কেন?

ও হ্যাঁ। সেই অভিশপ্ত রাতে শকটে চড়ে হুং-চা আর সেই আগন্তুক বেরিয়ে যাবার পরপরই জাষ্ক ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন। কোথায় গিয়েছিলেন জাষ্ক?

আজকাল প্রায় রাত্রেই জাষ্ক একাকী ঘোড়ায় চড়ে বার হন। কেন তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ থাকে না—কোথায় যান তিনি?

এসব ছাড়া সুকান্ত মণিকারের দোকানে আগন্তুকটিকে ধরে আনার ঘটনার সাক্ষী ঐ ভিখারিটি। কিন্তু পরদিনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়—সম্ভবত তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অভিযুক্ত হলে সে নির্ভয়ে জাষ্কের কার্যালয়ে নির্ভয়ে আসত কেমন করে? সে হুং-চা-এর মিত্রই বা হয় কী করে?

ভট্টরাই বলল, সমস্ত বিষয়টি এখন হাতের মধ্যে রয়েছে। চলুন আমরা এখনই মহামিশ্রের কাছে যাই। সম্রাট নেই। রাজসভা বসছে না। তাঁকে নিশ্চয় আমরা প্রাসাদ-কার্যালয়ে পেয়ে যাব।

ভট্টরাই আর বিষ্ক যখন মহামিশ্রের কার্যালয়ে উপস্থিত হল, তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। একজন পরিচারক তখন দেওয়ালগিরিগুলি প্রস্তুত করছিল আপনমনে। মহামিশ্র বসালেন বিষ্ক আর ভট্টরাইকে।—কী ব্যাপার? হঠাৎ তোমরা?

বিষ্ক এক এক করে সমস্ত ঘটনা বলল।

সব শোনার পর মহামিশ্র বলে উঠলেন, তাহলে ঐ ভিখারিটিই একমাত্র সাক্ষী! বা চমৎকার! আগামীকালই আমি ওকে এখানে নিয়ে এসে প্রশ্ন করব। সেরকম মনে হলে তার নিরাপত্তা দোব। সম্রাট দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে

আসছেন। তিনি এসে সব শুনে যা ব্যবস্থা নেবার নেবেন। তোমাদের ধন্যবাদ। ঘটনাগুলি সত্য প্রমাণিত হলে প্রশাসন তোমাদের কথা ভুলবে না।

বিষ্ক আর ভট্টরাই বিদায় নিলে মহামিশ্র উঠে দাঁড়িয়ে অশান্তভাবে পদচারণা শুরু করলেন।—কোথায় যেন দুর্যোগের এক কালো মেঘ!

সেদিন প্রভাতেই মহামিশ্র ঠিক করলেন, ভিখারিটি জাষ্কের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বা সাক্ষী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে—যদি তার বক্তব্যগুলি সঠিক হয়। তার উচিত ছিল গতরাত্রেই তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসা। যা হোক, আজ এখনই তাকে নিয়ে আসবেন তিনি। বিলম্বে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। তাই তিনি শয্যা ত্যাগ করেই নীলাকারকে আদেশ পাঠিয়েছিলেন ভিখারিটি তার পর্ণকুটীর ছেড়ে বেরোবার আগেই যেন তাকে নিয়ে আসা হয়।

নীলাকার এবং ভিখারিটির জন্য কার্যালয়ে অপেক্ষা করছিলেন মহামিশ্র। নীলাকারের সামনেই তিনি তাকে প্রশ্ন করতে চান। সদর্থক হলে নীলাকার ব্যবস্থা নেবে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে উৎকণ্ঠিত হলেন মহামিশ্র। তবে কি ভিখারিটিকে পাওয়া যায়নি? সে কি ভিক্ষাবৃত্তিতে বেরিয়ে গেছে? নগরে তাকে খুঁজে বার করার জন্য সময় লাগবার কথা।

একসময় নীলাকার ফিরে এলেন। মহামিশ্র প্রশ্ন করলেন, কোথায় সে?

মহামিশ্রের অনুমতি নিয়ে একটি আসনে বসে যেন দম নিলেন নীলাকার। তারপর বললেন, দুসংবাদ! গতরাত্রে কে বা কারা ভিখারিটিকে হত্যা করে তার পর্ণকুটির গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে।

জাষ্কের অভিমত কী তা জেনেছ?

হ্যাঁ। তিনি বা কার্যালয়ের কেউ বিষয়টি নীলাকার আসার আগে জানতেই পারেনি।

বিশ্বাসযোগ্য?

না। যে ভাবে তার কুটীরটি ভাঙা হয়েছে, তার দেহে একাধিক অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে—তাতে শব্দ বা চিৎকার হওয়ার কথা। সামনেই কার্যালয়। সেখানকার প্রহরারত প্রহরীরা কিছু শোনেনি বা দেখেনি তা বিশ্বাস করা যায় না।

মহামিশ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আগামী কালই সম্রাট ফিরে আসছেন। তার আগেই জাষ্ক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করল! যা হোক

তুমি অনুসন্ধান চালিয়ে যাও। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে হয়ত সাপ বেরিয়ে পড়বে। আমার মনে হয় না যে এই হত্যাকান্ড শুধুমাত্র রত্ন-পেটিকা আর দস্যু বাকাটকিকে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। পরপর তিনটি হত্যাকান্ড ঘটে গেল রাজধানীর বুকে। সম্রাট শুনলে ক্রুদ্ধ হবেন।

মহামিশ্র বললেন, আর একটা কথা নীলাকার। তোমার প্রতিনিধি বল্খের রাজধানী তা-হিয়া থেকে কী সংবাদ আনে—তা দেখ। তুমি দিনমানে জাষ্কের ওপর যেমন নজর রেখেছ—তা রাখ। কিন্তু, রাত্রে জাষ্কের চলাফেরার ওপরই দৃষ্টি রাখতে হবে। তার কাছে কে আসে যায়—সেই বা কোথায় যাতায়াত করে—এ সম্বন্ধে পুরো মাত্রায় আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ভট্টরাই আর বিষ্ক তাই বলছিল। একাজ তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, তারা গূঢ়পুরুষ নয়। তাছাড়া তোরণ দ্বারে তাদের কর্তব্য-কর্ম রয়েছে!

নীলাকার বললেন, তাই হবে ভন্তে মহামিশ্র! সম্রাটের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব—সে বিষয়েও আমি চিন্তিত।

মহামিশ্র এক সময়ে তাঁর দৈনন্দিনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে সম্রাট কালই ফিরে আসছেন যখন! বেলা গড়িয়ে গেল। অপরাহ্নের মুখে ভট্টরাই নগর তোরণের কর্তব্য সেরে মহামিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে এল। ভিখারিটির মর্মান্তিক মৃত্যুতে সে স্বভাবতই বিষণ্ণ। তাদের অসাবধানতাই যে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী এতে কোন সন্দেহ নেই।

মহামিশ্র ভট্টরাইকে বসতে বলে বললেন, তুমি যা ভাবছ—তাই ঠিক। আমি গতকালই সাবধান হলে এ মৃত্যু ঘটত না। ভিখারি হলেও কোন মানুষের অযাচিত মৃত্যু আমি কামনা করি না। আমি দুঃখিত ভট্টরাই। তোমাদের পরিশ্রমের কোনও মূল্য রইল না।

ভট্টরাই বলল, না, ভন্তে, মহামিশ্র। এই মৃত্যু অন্তত প্রমাণ করল যে আমরা সঠিক পথেই চলছিলাম।

তা অবশ্যই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জাষ্ক একথা জানল কেমন করে? তাহলে এই প্রাসাদেও কি জাষ্ক তার জাল বিছিয়ে ফেলেছে।

মহামিশ্রের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।—তাই তো! একথা তো আমি ভেবে দেখিনি। সে কোন লোক—যে আমাদের আলোচনা শুনেছে?

ভট্টরাই বলল, এ তো সোজা। যে পরিচারকটি গতকাল এখানে দেওয়াল

গিরিগুলি জ্বালাবার জন্য প্রস্তুত করছিল—তাকে ডাকলেই তো হয়। প্রথম সন্দেহের তালিকায় তারই আসার কথা।

মহামিশ্র বললেন, ঠিক। একজন প্রহরীকে দিয়ে তিনি জনাগ নামে এক পরিচারককে ডেকে পাঠালেন।

একটু পরে প্রহরীটি জানাল, জনাগ আজ আসেনি। বলে পাঠিয়েছে তার শরীর খারাপ। সে অসুস্থ।

ভট্টরাই বলল, পরিচারকেরা সবাই কি এখানে বাস করে না?

মহামিশ্র বললেন, না। কয়েকজন বাইরে থেকে আসে। জনাগ তার মধ্যে একজন।

দিন বুঝে আজই সে অসুস্থ! বিষয়টি সন্দেহজনক।

তাই তো মনে হচ্ছে।

আপনি তার বাসার বা বাসস্থানের ঠিকানা কি আমায় দিতে পারবেন?

তা পারব না কেন? কিন্তু অঞ্চলটি নগরের প্রত্যন্তপ্রান্তে। তুমি এইমাত্র কর্তব্য সেরে ফিরলে—তার চেয়ে আমি একজন প্রহরীকে পাঠাই।

ভট্টরাই বলল, ভন্তে মহামিশ্র! আমি বুঝতে পারছি, আপনি চাইছেন না যে আমি এই বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু আপনি বোধহয় আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি শুধুমাত্র কমলিকার রত্নগুলির জন্য ব্যাকুল নই। আমি ব্যাকুল সম্রাটের নিরাপত্তার জন্য। জাষ্ককে আমি বিশ্বাস করি না। ওর মতো হিংস্র মানুষ কমই আছে। নগরের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি এবং নানান ধরনের চঞ্চলতা প্রমাণ করছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আপনি অস্বীকার করতে পারবেন?

মহামিশ্র তবু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন। বললেন, দেখ ভট্টরাই। যার যা কাজ তাকেই সাজে। আমি বরং নীলাকারকে বলে পাঠাই।

ভট্টরাই বলল, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার ইচ্ছা হলে, তা আপনি করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু এই ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত—তাই আমাকে একটু সুযোগ দিন। পরে হয়ত দেরি হয়ে যাবে।

মহামিশ্র শেষপর্যন্ত অনুমতি দিয়ে বললেন, ভট্টরাই। তোমার পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। নগরের পূর্বপ্রান্তে যে বসতিটি আছে—জনাগ সেখানেই বসবাস করে। ওদের বসতিতে দু'দশ ঘর মানুষ রয়েছে। তাই তাকে খুঁজে বার করা অসুবিধা জনক হবে না। তবে সাবধান! এখন দেখছি দেওয়ালের কান আছে। দেখে যেও। তোমাকে নিষেধ করার পিছনে এটিই আমার কারণ ছিল।

ভট্টরাই তার ঘোড়া নিয়ে সন্ধান করতে করতে যখন জনাগের কুটিরের সামনে পৌঁছল—তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

দাওয়ার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে সে ডাকল, জনাগ! জনাগ বাড়ি আছ? আমি তোরণদ্বারের রক্ষী ভট্টরাই। তোমার সঙ্গে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে।

কিছুক্ষণ কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ঘর অন্ধকার। ভট্টরাই আবার ডাকল, জনাগ! থাকলে সাড়া দাও। নইলে আমি ভেতরে ঢুকব।

অতঃপর কুটীরের ভেতর থেকে হাতে একটি প্রদীপ নিয়ে একজন বেরিয়ে এসে দাওয়ায় দাঁড়াল চালের খুঁটি ধরে।—কাকে চাই?

জনাগকে। সে আছে?

না। দাদা নেই।

কোথায় গেছে সে? শুনলাম অসুস্থ!

জানি না কোথায় গেছে।

বেশ। তুমিই চল। মহামিশ্রের আদেশ, জনাগ না হলে তার ভাইকে যেন ধরে আনা হয়। মিথ্যা বলল ভট্টরাই।

স্পষ্টতই ভয় পেয়ে গেল জনাগের ভাই।—কেন? কেন? আমি কী করেছি যে আমায় নিয়ে যেতে হবে!

আবার মিথ্যে করে ভট্টরাই বলল, জনাগ কি জাষ্ককে বলে গেছে?

জাষ্কের কথা উঠতেই বিবর্ণ হয়ে গেল জনাগের ভাইয়ের মুখ। সে জাষ্কের উল্লেখে স্পষ্টতই ভেঙে পড়ল।—আমায় বাঁচান, ভট্টরাই।

কেন? তোমায় বাঁচাবার কথা আসছে কেন? তোমার নাম কী?

আমি বিনাগ। আমি কায়িক পরিশ্রম করে দিন কাটাই। কদিন আগে আমি নগরাধ্যক্ষের কার্যালয়ে এক নির্মাতার অধীনে কাজ করতে যাই। পরিচয় লিপিবদ্ধ করার সময় জাষ্ক জানতে পারেন যে আমার দাদা প্রাসাদে কাজ করে। শোনামাত্র তিনি দাদাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বলেন। কারণ কিছু বলেননি আমাকে। দাদা ভয় ভয় তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, রাজপ্রাসাদের কোন গোপনীয় কথাবার্তা শুনতে পেলেই সে যেন তাঁকে জানায়।

দাদা স্বভাবতই অস্বীকার করে। তখন জাষ্ক বলেন, বেশ। অন্য লোক দেখব। তুই গরীব মানুষ। কিছু অর্থ পেতিস—এই আর কি!

বিষয়টি ঐ দিন মিটে গেছে বলে আমরা মনে করলাম। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কাজ থেকে ফেরার কিছু পরে দেখলাম, জাষ্ক দুজন প্রহরী নিয়ে হঠাৎ উদয় হয়ে দাদাকে বললেন, চোর বিনাগটাকে আসতে বল। আমার কার্যালয় থেকে পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা চুরি করেছে।

দাদা প্রতিবাদ করলে তিনি প্রহরীদের আদেশ করলেন, যা। ভেতরে খুঁজে দেখ আর ওটাকে ধরে আন।

অচিরেই আমাকে আর একটা ছোট্ট মুদ্রাকোষ নিয়ে প্রহরী দুটি বাইরে এসে বলল, এই যে প্রভু! পেয়েছি! রান্নাঘরে চালের হাঁড়িতে রেখে দিয়েছিল।

আমি বললাম, মিথ্যা কথা। মুদ্রাকোষটি প্রহরীর কাছেই ছিল। আমি চুরি করিনি।

জাষ্ক আমাকে পদাঘাত করে প্রহরীদের আদেশ করলেন, বাঁধ এটাকে। বন্ধনাগারে এক উপযুক্ত সেবা করতে হবে। কার্যালয় থেকে চুরি! কী সাহস! পাড়া-প্রতিবেশী সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে জাষ্ক আমায় চোর সাজিয়ে মারতে মারতে কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে চলল অকথ্য অত্যাচার। দেখুন না আমি ভাল করে চলতে ফিরতেও পারছি না!

ভট্টরাই বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা ছাড়া পেলে কী করে?

আমার অবস্থা শুনে দাদা দেখা করতে যায় জাষ্কের সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রথম যেদিন একটা ভাল সংবাদ নিয়ে আসতে পারবি সেদিন তোর ভাইকে ছাড়ব। নইলে জেনে রাখ, তাকে নিত্য সেবা তো করবই, উপরন্তু হুং-চাদের হত্যাকাণ্ডে তাকে জড়িয়ে দোব। মশানে গিয়ে ওকে গলাটা দিতে হবে শেষ পর্যন্ত।

দাদা ভয় পেয়ে ফিরে গেল। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় এসে একজন ভিক্ষুক আর আপনার নামে—হ্যাঁ ভট্টরাই তো আপনারই নাম—কিছু বলল। তারপরেই আমি ছাড়া পাই এবং আজই প্রভাতে শুনি ভিক্ষুকটিকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর আমার বা আপনার পালা। আমায় বাঁচান।

জনাগ কোথায়?

সে পালিয়েছে। একদিকে মহামিশ্রের ভয় অন্যদিকে জাষ্কের। তিনি নিশ্চিতভাবে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখবেন না। দাদাই বা যে কতদিন নিরাপদে থাকতে পারবে তাও জানি না। আমার দাদার সঙ্গে পথ পাড়ি দেওয়ার অর্থ হোত তাকেই বিপদে ফেলা। তাই দাদাকে বললাম, আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হোক।—আজ রাতেই হয়ত মারবে!

ভট্টরাই বুঝল, বিনাগ সত্য কথাই বলছে। জাষ্ক কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। সেক্ষেত্রে তার নিজের কথা ছেড়ে দিলেও বিনাগের প্রাণ যে বিপন্ন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কী করা যায়? বিনাগের জন্য রাতের মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই—যেখানে বিনাগকে রাখা যাবে। নগরদ্বার এখন বন্ধ। নগর ত্যাগও সে করতে পারবে না। মহামিশ্রের কাছে পৌঁছতে সময় লাগবে। রাতে তাকে বিরক্ত করাটি কি ঠিক হবে? তিনি তো তাকে আসতে নিষেধ করেছিলেন। সে এসেই সম্ভবত বিনাগের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল। কোথায় নিয়ে যাবে সে বিনাগকে? নিজের বাড়িতে? কিন্তু সেখানেও তো জাষ্ক মিথ্যা অপরাধে তাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। হঠাৎ বিষ্কের কথা মনে পড়ে গেল ভট্টরাইয়ের। হ্যাঁ—বিষ্ক। সেখানে অন্তত রাতের মধ্যে জাষ্ক হাত গলাতে পারবে না।

উৎসাহিত হয়ে ভট্টরাই বলল, ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে। দেখি জাষ্ক কী করতে পারেন। রাতটুকু পার করতে হবে। প্রভাতেই তোমাকে মহামিশ্রের হাতে দিয়ে আসব। জাষ্কের জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাবে। যাও—তোমার যা নেবার একটি পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে এস। তারপর আমার ঘোড়ায় চড়ে বস। হাঁটতে তো পারবে না।

প্রতিবেশীদের অবাক করে ভট্টরাই আর বিনাগ ঘোড়ায় চড়ে বসল। কিন্তু একটু যেতেই ভট্টরাইয়ের মনে হল কয়েক জোড়া চোখ তাদের অনুসরণ করছে।

বিনাগও অনুভব করতে পারছিল। —ওরা আছে। ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ যেন আমি শুনতে পাচ্ছি। সামনের ঐ মাঠটি পার হওয়ার সময়েই ওরা বোধহয় ঝাঁপাবে।

ভট্টরাই বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ?

বিনাগ বলল, ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু এ মুহূর্তে নয়, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে! হাতের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় ধরে সে বলল, এখন জাষ্ক এলেও তাকে আমি হত্যা করতে ভয় পাব না। আমি প্রতিশোধ নোব। এই আধো অন্ধকারে ওদের যেমন সুবিধা—আমাদেরও। মাঠের শেষে ঐ গাছগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমার বিশ্বাস ওরা গাছের আড়ালে রয়েছে।

ওরা কজন আছে বলে তোমার মনে হয়?

পাঁচ-ছ জন তো হবেই। আসলে ওরা আমার ওপর নজর রেখেছিল। আমি আপনার আসার আগে তাদের আমার কুঁড়েঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। প্রতিবেশীরা জেগে থাকাতে তারা বোধহয় রাতের জন্য অপেক্ষা করছিল। এরমধ্যে আপনার গলা পেয়ে আমি সাহস করে বেড়িয়ে আসি।

তখন তো এসব কথা বলনি।

এমনি। বলে কী লাভ হোত? হয়ত ভয় পেয়ে আপনি আমাকে ফেলে চলে যেতেন। ঘোড়ায় চেপে ওই রাস্তাটুকু পার হবার সুযোগ আমার জুটতো না!

ও! ভট্টরাই চুপ করে থেকে বলল, তোমার দাদা কোথায় গেছে? জাষ্কের নাগালের বাইরে যেতে পেরেছে কি?

বিনাগ বলল, মনে হয় না। তবে দিন কয়েকের জন্য নিশ্চয় নিশ্চিন্ত থাকবে। সন্ধান পেয়ে সেখানে যেতে জাষ্কেরও তো সময় লাগবে।

কোথায় গেছে?

আর লুকিয়ে রাখার অর্থ হয় না।—সে গেছে আমাদের দেশের বাড়িতে। সেই গ্রাম এখান থেকে কুড়ি ক্রোশ দূরে হবে। জাষ্ক তাকে খুঁজে বার করবেই।

মাঝ মাঠে আক্রান্ত হল ভট্টরাই। রে-রে করে ছ-জন দুষ্কৃতি ছুটে এল। এরা নগর প্রধানের ঘাতকও হতে পারে। ভট্টরাই শক্ত হাতে তলোয়ার চেপে ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। আধো অন্ধকার। ছায়া ছায়া শরীর।

আক্রমণকারীরা প্রতিরোধের আশা করেনি। ভট্টরাই অব্যর্থ লক্ষ্যে সামনের আততায়ীর দিকে তলোয়ার চালাল। কাটা গাছের মতোই লুটিয়ে পড়ল সে। দুষ্কৃতিরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিমূঢ় হয়ে যাবার পর ভট্টরাই আর বিনাগকে ঘোড়া সমেত ঘিরে ধরল। একজন আততায়ী বিনাগকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতেই বিনাগ তার হাতে থাকা লাঠিটা দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত করল। আততায়াটি আর্তনাদ করে ভূমিশয্যা নিল। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা বিনাগের হাতের লাঠি সে দেখতে পায়নি।

চারজন দুষ্কৃতি এবার একযোগে ভট্টরাইকে আক্রমণ করল। ভট্টরাই দক্ষতার সঙ্গে তাদের আঘাত প্রতিহত করে প্রত্যাঘাত হানতে থাকল।

হঠাৎ আকাশে চাঁদ উঠল। আলোর বন্যায় মাঠটি ভেসে গেল। দুপক্ষেরই সুবিধা হল। ভট্টরাই ঠিক করল দ্রুত এদের শেষ করতে হবে। এরা অস্ত্রধারী ঘাতক হলেও কেউই তার মতো দক্ষ নয়। তার মতো তরুণও কেউ নয়। তারুণ্যের সুযোগ নিয়ে ভট্টরাই নিপুণভাবে তলোয়ার চালনা করতে লাগল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল আরও তিনজন চিরকালের মতো ভূমিশয্যা নিয়েছে—শেষজন পালাচ্ছে। কিন্তু পালাতে পারল না। ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে বিনাগ

অপূর্ব ক্ষিপ্রতায় হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে দিল। পলাতক দুষ্কৃতিটি মুখ থুবড়ে পড়ল। ভট্টরাই ছুটে গিয়ে তাকে চিৎ করে তলোয়ার ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল। কে পাঠিয়েছে? তোরা কারা?

প্রহরী। জাষ্ক পাঠিয়েছেন। আমায় ছেড়ে দাও। নইলে বিপদে পড়বে।

ভট্টরাই তলোয়ারটি আমূল বসিয়ে দিয়ে তা আবার বার করে মৃতের পোষাকে রক্ত মুছে নিয়ে কোষবদ্ধ করল। জাষ্ককে সংবাদ দেবার জন্য এর বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।

বিনাগ বলল, ভট্টরাই! আপনি সঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু আমাদের এখনই পালাতে হবে। অন্য কেউ এসে পড়তে পারে।

ঠিক! ভট্টরাই লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল। মাঠ পেরিয়ে গাছগুলো পার হতে গিয়ে সে দেখল ছটি ঘোড়া একটি গাছে বাঁধা রয়েছে। দুষ্টবুদ্ধি খেলা করল ভট্টরাইয়ের মাথায়। সে ঘোড়াগুলিকে মুক্ত করে তাড়িয়ে দিল।

একসময় ভট্টরাই বিষ্কের কুটিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল।— প্রধান জেগে আছেন?

বিষ্ক শোবার আয়োজন করছিলেন। একাই রয়েছেন। পরিবার-পরিজনেরা গ্রামের বাড়িতে গেছে।

ভট্টরাইয়ের গলা শুনে একটু অবাক হয়ে তিনি ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে বললেন, কে? ভট্টরাই? একটু দাঁড়াও। তারপর একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। চাঁদ উঠেছে। প্রদীপের দরকার ছিল না। চাঁদের আলোতেই তিনি রক্তাক্ত ভট্টরাইকে দেখে চমকে উঠলেন।—আহত? সঙ্গে এটি কে?

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ভট্টরাই বলল, আহত নই। ছ-ছটি হত্যা করে এলাম। এটি জনাগের ভাই বিনাগ।

সে আবার কে?

চলুন চলুন। ভেতরে চলুন। একটু স্নান করে নিই। তারপর বলছি সব। দীর্ঘ কাহিনি।

ভেতরের ঘরে সে বিনাগকে বসিয়ে বলল, একটু আহারের ব্যবস্থা দেখুন। না। আমার জন্য নয়। এই বিনাগের জন্য। বাড়িতে মা তো আহার নিয়ে বসে আছেন। দেরি দেখে ভাবছেন নিশ্চয়। যাহোক আপনার কুয়োতলাটা কোন দিকে?

বিষ্ক দেখিয়ে দিতে ভট্টরাই সেদিকে গেল।

স্নান সেরে ভট্টরাই ফিরে এসে দেখল, বিষ্ক একটি পাত্রে কিছু মুড়ি আর

গুড় নিয়ে এসেছেন।—এ সময়ে আর কিছুর ব্যবস্থা করতে পারলাম না। ঘরে কেউ নেই তো!

ভট্টরাই বসে পড়ে বলল, এতেই হবে। বিনাগ হাত চালাও। আমি দু এক গাল মুখে দিচ্ছি।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে ভট্টরাই ভিখারি হত্যা, মহামিশ্র থেকে এপর্যন্ত সব কিছু খুলে বলল বিষ্ককে। বিষ্ক বললেন, কাল সকালে তো নগরে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। ছ—ছটি প্রহরী হত্যা। জাষ্ক নিঃসন্দেহে বিষয়টি জনাগ আর বিনাগের ওপর চাপাবে। তোমার নাম হয়ত সহসা উচ্চারণ করবে না। কিন্তু তা যদি না করে তবে জনাগ-বিনাগের ওপর অভিযোগটা ঠিক মতো দাঁড়াবে না। কারণ ছ—ছটি প্রহরী হত্যা করা ওদের কর্ম বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সুতরাং, অতি প্রভাতে তুমি মহামিশ্রের শরণ নেবে এবং বিনাগকেও নিয়ে যাবে।

তা যাব। কিন্তু বিনাগ রাতের মতো আপনার কাছে থাকবে তোরণ প্রধান। আমার গৃহে বিনাগের সন্ধানে গেলেও—আপনার এখানে সহসা আসতে পারবে না।

অবশ্য তোমাকে-আমাকে বন্দি করার কথাই উঠছে না—মহামিশ্রের অনুমতি চাই। একটু থেমে বিষ্ক বললেন, আরও একটি কথা। জনাগের স্বীকারোক্তি আমাদের পক্ষে এক মূল্যবান সাক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং, জাষ্ক জনাগকে খুঁজে বার করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে তুমি মহামিশ্রকে বলে একদল সেনা জনাগের গ্রামে পাঠাবে এবং তাকে বন্দি করে আনাবার ব্যবস্থা করবে। মহামিশ্র এক্ষেত্রে যেন দেরি না করেন। নচেৎ কাল সন্ধ্যার মধ্যে জাষ্কের ঘাতক বাহিনী ঠিক পৌঁছে যাবে।

ভট্টরাই উঠে দাঁড়াল। নিজেকে ক্লান্ত লাগছিল। সামান্য মুড়ি-গুড় তার ক্ষিদেকে যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।—আসছি, তোরণ প্রধান। প্রভাতেই উপস্থিত হব। শুভরাত্রি।

ব্যঙ্গ করলেন বিষ্ক।—তুমি আবার এসবও শিখেছ! যা হোক সাবধানে যেও।

ভট্টরাই বলল, আপনার আর্শীবাদে জনা দশবারোর মহড়া আমি নিতে পারব। ওরা কালোধন উপার্জন করতে করতে তলোয়ার চালনা করা ভুলে গেছে!

রাত্রে শান্তিতে শুয়েছিলেন জাষ্ক। তিনি ভেবেছিলেন পালাক জনাগ। পালিয়ে যাবে সে কোথায়? তাঁর হাত সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছবে। নিস্তার নেই জনাগের। উপস্থিত বিনাগের ওপর নজর রেখেছেন। তার সঙ্গে যদি কেউ দেখা করতে আসে তাহলে বিনাগ আর সেই আগন্তুককেও তাঁর ঘাতকরা হয় হত্যা করবে না হয় বন্দি করে আনবে। ভট্টরাইয়ের ওপরও লক্ষ রাখা হয়েছে। তরুণটি বড় উৎসাহী। ভিখারিটিকে তার পেছনে লাগিয়েছিল। বিষ্কও কম যায় না। কিন্তু একে একে দুজনকেই তিনি দেখে নেবেন। জাষ্কের উঠোনে পা বাড়ানো যে কী ভয়ংকর! বিষ্কও বুঝবে সমাজ-উৎসবের পরই। এই ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত বিষ্কের পরিকল্পনা। কিন্তু সন্ধ্যার পরই তিনি শুনতে পান, জনৈক নগর-প্রহরী ভট্টরাইকে মহামিশ্রের কাছে যেতে এবং বার হয়ে নগরের পূর্ব প্রান্তের দিকে ঘোড়া ছোটাতে দেখেছে। জাষ্কের বুঝতে ভুল হয় নি যে ভট্টরাই জনাগের সন্ধানে যাচ্ছে। কারণ, তার গৃহ নগরের পশ্চিম অংশে—সে যাচ্ছে বিপরীতে! পূবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে জনাগ আর বিনাগ! বিনাগ মুক্ত হয়ে যাবার পর জনাগ আর তার সঙ্গে দেখা করেনি। শুনেছে আত্মগোপন করেছে আর না হয় পালিয়েছে। তাই তিনি চারজন ঘাতক প্রহরীকে পাঠিয়েছেন বিনাগের ওপর দৃষ্টি রাখতে। কে যাচ্ছে—আসছে তা তাঁর জানা প্রয়োজন। ভট্টরাইয়ের কথা শোনামাত্র তিনি আরও দুজন প্রহরীকে পাঠিয়েছিলেন—জনাগ যদি সত্যি না থাকে তাহলে বিনাগ এবং আগন্তুক বেশী ভট্টরাইকে হত্যা করতে! অন্তত দুটি শত্রু তো নিকেশ হবে। ভট্টরাই মরলে যাহোক একটা কিছু গল্প বললেই চলবে। বিনাগকে জড়িয়ে নেবেন। আর জনাগকে ধরতে পারলে তাকে দস্যু বাকাটকি বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। মণিকার পুত্রী তখন ধরা পড়ে যাবে। যে সে মিথ্যা বলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শুয়ে শুয়ে জাষ্ক অবশ্য ভাবলেন, পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বাঁধন তেমন হল না। না হোক। সামান্য কিছুদিনের তো ব্যাপার। সামনেই সমাজ-উৎসব। পাশার দান সব পালটে যাবে। মধ্যবর্তী সময়টুকু সে পরম বিনয়ী হয়ে কোন রকমে সামলে নেবে। তারপর সমাজ-উৎসবের রাতে স্বমূর্তি ধরবে।

যথাসম্ভব শান্ত মনে থাকতে চাইছিলেন জাষ্ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিউ-পিনানের নিস্তব্ধতা তাঁকে চিন্তিত করে তুলল। অনেক কিছু নির্ভর করছে তাঁর উপর। প্রথম অর্থ। আগামী কালই কিছু ধর্মীয় ও গোষ্ঠী নেতাকে কিছু কিছু অর্থ দিতে হবে। তাঁর সহকারীদেরও কিছু অর্থ দেওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, ঘাতক বাহিনী। এখানকার ঘাতকেরা অতটা দক্ষ নয়। হলেও সম্রাট সম্বন্ধে অধিকাংশের মনে একটি দুর্বলতা আছে। কোনও রকম সংশয়ের মধ্যে যেতে

চান না জাষ্ক। তাছাড়া হিউ-পিনানের ঘাতকেরা যদি ব্যর্থও হয় তবে সোজাসুজি তিনি হিউ-পিনানের ওপর দোষারোপ করবেন। মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবল তাঁকে সমর্থন করবেন। সমর্থন তাঁদের করতেই হবে। নচেৎ তাঁরা নিজেরাও যে জড়িয়ে পড়বেন একথা ভালভাবেই জানেন। তৃতীয়ত, সেনাবাহিনী প্রয়োজন। অন্তত সীমান্তে সেনা সাজিয়ে আক্রমণ করার ভয় দেখালেও কাজ হবে। তাছাড়া—তাঁর নিজেরও কিছু সেনার প্রয়োজন। রাজপ্রাসাদ এবং সেনানিবাস ঘিরতে হবে। হিউ-পিনান যদি আজ কালের মধ্যে সাড়া না দেন তবে নিজের ব্যবস্থা তাঁকে নিজেই করতে হবে। তিনি একবার যখন এগিয়েছেন তখন পিছোবেন না। হঠাৎ জাষ্কের মাথায় আর একটা পরিকল্পনা খেলা করে গেল। সেনানিবাসের সেনা হ্রাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোথাও বা নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে যদি কোনও বিদ্রোহের সৃষ্টি করা যায়? বিশাল এক সেনাবাহিনী যদি তা দমন করতে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে যায়...! ওখানকার পহ্লব ক্ষত্রপের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করা অতি জরুরি। কিন্তু কাকে পাঠাবেন? তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এর আগে সিন্ধু- বন্দরগুলির শ্রমিক অশান্তি দমনে ইউনাস, ভার্গব আর দুবল গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁরা সম্রাটের অধীনস্থ শক এবং পহ্লব ক্ষত্রপের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। তাঁরা সম্রাটের ওপর স্বাভাবিক কারণেই রুষ্ট। ঐ অঞ্চলে তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কাল প্রভাতেই তিনি ইউনাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। উজ্জীবিত জাষ্ক বেশ শান্তভাবেই চোখদুটি সবে বুঁজেছেন—ঠিক সেই সময় একজন প্রহরী এসে ডাকল—প্রভু!

মুখ-চোখ বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠলেন জাষ্ক।—কী দরকার পড়ল হঠাৎ? তোরা সামলে নিতে পারিস না একটুও। কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ যে ঢালছি তোদের পেছনে। শান্তিতে একটু শুতেও পারব না!

ভীত সন্ত্রস্ত প্রহরীটি বলল, আজ্ঞে, হিউ-পিনানের কাছ থেকে একজন এসেছেন। আপনাকে এখনই প্রয়োজন।

হিউ-পিনানের লোক! লাফ দিয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন জাষ্ক।—মূর্খ কোথাকার! আগে বলবি তো! যা নিয়ে আয় তাকে। আর হ্যাঁ, দেখবি কথাবার্তা বলার সময় এদিকে কেউ যেন না উঁকি মারে। তাহলে তার মুন্ডু যাবে।

প্রহরী সভয়ে চলে গিয়ে বাঁচল।

শেষ পর্যন্ত সম্রাট পুরুষপুরে ফিরলেন—কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের দুদিন পরে। সম্রাট হঠাৎই অসুস্থ বোধ করেন কণিষ্কপুরে। ওখানকার বৈদ্যরা তাঁকে ঔষধী দিয়ে দু-একদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাবেই তাঁর বায়ু-কফ-পিত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তাঁদের ধারণা। সম্রাট বৈদ্যের কথা মেনে নিয়ে প্রাসাদ-রমণী আর পরিচারিকাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। সত্যিই সম্রাট দু-একদিনের মধ্যে যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠে আর কণিষ্কপুরে অপেক্ষা করতে চাইলেন না। সম্মেলনে এখন ধর্ম নিয়ে কূট বিতর্ক চলছে। ওখানে তিনি এখন অপ্রয়োজনীয়। তাই তিনি পুরুষপুর যাত্রার আয়োজন করলেন। অশ্বঘোষ প্রমুখেরা বা ওখানকার প্রশাসকেরা তাঁকে আর বাধা দিলেন না।

কিন্তু পুরুষপুরে পৌঁছেই তিনি আবার অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করলেন। বাম বুকে—হৃদয়ের কাছে আবার সেই চিনচিনে ব্যাথা! কিন্তু সম্রাট তা সম্পূর্ণ গোপন করে গেলেন। ভাবলেন দীর্ঘ যাত্রাপথের জন্যেই এই বেদনার পুনরাবৃত্তি। তাঁর আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নেবেন কী করে, বুদ্ধের কথা তাঁর স্মরণ হল। শরীর থাকলেই ব্যাধি আশ্রয় করবে। মানুষের জীবনে এ এক স্বাভাবিক অবস্থা। এই ব্যাধিকে দমন করেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে।

যাহোক, তিনি সেদিনের জন্য রাজসভা স্থগিত রেখে প্রাসাদ সভাকক্ষে মহামিশ্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে যা যা ঘটে গেছে তার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে বসলেন। সম্রাট হিসাবে প্রতিটি ছোট ছোট বিষয়ও তাঁর জানা উচিত। সমস্ত ঘটনাই সম্রাটের নখদর্পণে থাকার প্রয়োজন।

মহামিশ্র বললেন, গতকাল একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। গতরাত্রে ছ-জন নগর প্রহরী নিহত হয়েছে। প্রভাতে এই সংবাদ পুরুষপুরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভট্টরাই বিনাগ নামে একজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে দেখা করে। গত পরশু নগর কার্যালয়ের সামনে একটি ভিখারি নিহত হয় এবং জাষ্ক সব দায় অস্বীকার করে। কিন্তু ভট্টরাই এবং তোরণ প্রধান বিষ্কের কাছে জানা যায় যে তারা জাষ্কের ওপর নজর রাখার জন্য ঐ ভিখারিটিকে নিয়োগ করেছিল। এবং ভিখারিটি তাদের কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যও দেয়। মহামিশ্র সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক খুলে বলার পর বললেন, ঐ রাত্রেই নিহত হয় ভিখারিটি। অর্থাৎ আমার সঙ্গে ভট্টরাইয়ের কী কথা হয়েছিল তা কেউ জাষ্ককে জানিয়েছিল। জাষ্ক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণকে স্বভাবতই বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি। যাহোক আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে জনাগ নামে যে কর্মচারিটি সেদিন দেওয়ালগিরিগুলি প্রস্তুত করছিল সে কর্মে অনুপস্থিত। সে নাকি শারীরিক ভাবে অসুস্থ। ভট্টরাই বলে,

বিষয়টি সন্দেহজনক। জনাগের কাছে এখনই যাওয়া দরকার। তাকে ধরে এনে জানতে হবে এই প্রাসাদে জাষ্কের কোন চর আছে কিনা। আমি ভেবেছিলাম, নীলাকারকে পাঠাব অনুসন্ধানের জন্য। কিন্তু ভট্টরাই অপেক্ষা করতে চায়নি। যদি ভিখারিটির মত জনাগকেও জাষ্ক সরিয়ে দেয়! কিন্তু আমি ভট্টরাইয়ের জন্য চিন্তিত ছিলাম। ভিখারিটির মৃত্যুর পর ভট্টরাইও যে জাষ্কের লক্ষ্যের মধ্যে আছে তা আমি অনুমান করেছিলাম। যাহোক, ভট্টরাইকে অনুমতি দিতে আমি বাধ্য হই। আজ প্রভাতে নগর জাগবার আগেই সে জনাগের ভাই বিনাগকে সঙ্গে নিয়ে আমার শরণে আসে এবং সমস্ত ইতিবৃত্ত খুলে বলে। আমি বিনাগকে নীলাকারের হাতে তুলে দিয়েছি তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই। অন্যদিকে জনাগের সন্ধানে একদল সেনা পাঠিয়ে দিয়েছি তার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। জাষ্কের ঘাতকরা যথাসম্ভব শিঘ্রই সেখানে উপস্থিত হবে। তার আগে জনাগকে আমাদের হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

সম্রাট বললেন, দেখছি, ভট্টরাই বেশ কুশলী এবং করিতকর্মা।

মহামিশ্র বললেন, হ্যাঁ সম্রাট। আশা করি জীবনে সে যথেষ্ট উন্নতি করবে আপনার সহায়তা পেলে। এই মুহূর্তে আমাদের বিশ্বস্ত লোকেরও প্রয়োজন।

সম্রাট বললেন, অন্য সংবাদ?

হ্যাঁ, সম্রাট। গতকালই নীলাকার গুণবর্ধনের সহায়তায় কয়েকজন ধর্মীয় ও গোষ্ঠী নেতাকে বন্দী করেছে। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা বার করেছিল। অনুসন্ধানে জানা গেছে বিপুল অর্থ পেয়ে তারা এই অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছিল।

অর্থ তারা কার মাধ্যমে পেয়েছিল, তা কী জানা গেছে?

গেছে সম্রাট। তবে কোনও লাভ হয়নি। কারণ সেই মধ্যবর্তী মানুষটিও গতকাল রাত্রে নিহত হয়েছে। ফলে উৎস মুখ জানা যায়নি।

হুঁ! বলে সম্রাট গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মহামিশ্র বললেন, প্রতি ঘটনার পেছনে জাষ্কের উপস্থিতি রয়েছে বলে আমরা বুঝতে পারলেও প্রমাণ অভাবে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

সম্রাট বললেন, নগরে হত্যাকান্ড বেড়ে চলেছে। অন্তত এই ব্যাপারে আমরা জাষ্কের কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারি। মহামিশ্র! তুমি এখনই জাষ্ক, গুণবর্ধন আর নীলাকারকে ডাকাবার ব্যবস্থা কর।

যথা আজ্ঞা সম্রাট। মহামিশ্র সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে গেলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য।

কিছু পরে মহামিশ্র যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন সম্রাট খুবই চিন্তিত। মহামিশ্র মৃদু স্বরে বললেন, সম্রাট কি কিছু চিন্তা করছেন?

সম্রাট বললেন, আচ্ছা মহামিশ্র। তোমার কি মনে হচ্ছে না, অশুভ কোন কিছু একটা ঘটতে চলেছে? আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমায় প্রতারণা করে না। তাই জীবনে বহু ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আজও আমি কুষাণ সম্রাট। সেদিনও আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমায় সাবধান করে দিয়েছিল। তাই এখনও আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি।

মৃদু স্বরে মহামিশ্র বললেন, জানি সম্রাট। তবে ওসব এখন ভুলে যান। ওসব অনেক দিনের কথা। বর্তমানে সেই রকম একটা যে পরিবেশ গজিয়ে উঠেছে—তা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। এত হত্যা...। পুরুষপুরে এমনটা হয়নি এর আগে!

আমরা কি বলতে পারি, জাষ্কের আরও কোন গুপ্তচর এই প্রাসাদে ঢুকে পড়েনি? জনাগ কি একা? আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। তোমার একার পক্ষে এই বিশাল প্রাসাদের কর্মচারিদের দায়িত্ব সামলানো সম্ভব নয়। তোমার প্রশাসনিক কাজকর্মও রয়েছে।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আপনাকে এতকাল তো কোন অভিযোগ করার সুযোগ দিইনি। আজ...!

ভুল বুঝেছ মহামিশ্র! আমি অভিযোগ করছি না। তোমার অসুবিধাটুকু অনুভব করার চেষ্টা করছি।

তা সম্রাট আমাকে কী আদেশ করতে চান?

তুমি তোমার একজন উপযুক্ত এবং একশ ভাগ বিশ্বস্ত সহকারী নিয়োগ কর। সে মূলত সমস্ত কর্মচারিদের ওপর নজর রাখবে এবং অন্যান্য কাজে সহায়তা করবে।

মহামিশ্র বললেন, এতো উত্তম প্রস্তাব, সম্রাট। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতের কাছে তেমন লোক কই? কার ওপর বিশ্বাস করব?

কেন? ঐ তরুণ ভট্টরাই? তার ওপর কি নির্ভর করা যায় না?

মহামিশ্রের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আমি ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! অতীব দক্ষ যোদ্ধা এবং যথেষ্ট সপ্রতিভ এবং বুদ্ধিমান।

সম্রাট বললেন, বেশ তুমি এখুনি আরও দুটি লোককে ডেকে পাঠাও। তারা যে যেমন অবস্থায় আছে যেন এখানে এসে উপস্থিত হয়।

কাকে কাকে সম্রাট?

ভট্টরাই আর জাষ্ককে।

ভট্টরাইকে আমি দেখতে চাই আর জাষ্ককে প্রশ্ন করতে চাই।

গূঢ়পুরুষ প্রধান আর সেনাপতি...?

ওরাও আসুক। কোন অসুবিধে নেই।

মহামিশ্র আবার কক্ষের বাইরে গেলেন। সঙ্গে গুণবর্ধন আর নীলাকারকে নিয়ে ঢুকলেন।

গুণবর্ধন আর নীলাকার আভূমি নত হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আশাকরি সম্রাট সুস্থ এবং কুশলে আছেন!

কণিষ্ক কথার উত্তর না দিয়ে দুজনকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। এরপর সম্রাট বললেন, আমি মহামিশ্রের কাছ থেকে সব শুনেছি। কিছু বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ইউ-চি গোষ্ঠীর স্বপ্রচারিত নেতাদের তোমরা বন্দী করেছ—তাতে কিছু কি জানা গেল—নেপথ্যে কে?

না সম্রাট! মধ্যবর্তী মানুষটি যে নিহত হয়েছে—এও নিশ্চয় আপনি শুনেছেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবে আমরা উৎসে এখনও পৌঁছতে পারিনি। তবে আমরা অনুসন্ধান শিথিল করিনি। আশা করছি অচিরেই সে ধরা পড়বে।

জনাগকে উদ্ধার করা গেছে?

গুণবর্ধন বললেন, প্রভাতেই একদল অশ্বারোহী সৈনিককে পাঠানো হয়েছে জনাগের গ্রামে। আশা করছি, কোন ক্ষতি হবার আগেই তাকে নিয়ে সেনারা আগামিকাল প্রভাতের মধ্যে ফিরে আসবে।

জনাগ আর বিনাগকে সাবধানে রাখতে হবে। ওরা আমাদের বহুমূল্য সাক্ষী!

নীলাকার! হিউ-পিনানের সংবাদ কী?

সম্রাট উপ-মহাক্ষত্রপ সোরোড়ানকে জানানো হয়েছে। সেনাবাহিনী সম্রাটের পক্ষে। প্রজারা আপনার পক্ষে। তবে সেখানে চিন সম্রাটকে নিয়ে সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ওরা কাশগড়—খোটান আর ইয়ারকন্দের রেশম পথ নিজেদের অধিকারে আনতে চায়। মহাক্ষত্রপ হিউ-পিনান যাতে চিনা প্রতিরোধের অছিলায় অন্য কিছু না করে বসতে পারেন—সেদিকে গূঢ়পুরুষ বিভাগ উপ-মহাক্ষত্রপ সোরোডানের নেতৃত্বে গোপনে লক্ষ্য রেখেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, গূঢ়পুরুষ বিভাগটির অধিকর্তা সোরোডান নিজেই।

মহামিশ্রের মনে হল সম্রাট যেন ক্লান্তি অনুভব করছেন। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিচ্ছে। নিজের অজান্তেই তিনি তাঁর বাম বুকে মাঝে মধ্যে হাত বোলাচ্ছেন। মহামিশ্র আসন ছেড়ে সম্রাটের কাছে উঠে গেলেন। তারপর ফিসফিস স্বরে প্রশ্ন করলেন।—সম্রাট কি অসুস্থ বোধ করছেন?

কণিষ্ক হাসবার চেষ্টা করে বললেন, না। ও কিছু নয়। পরিপাক ক্রিয়ার কিছু গণ্ডোগোল হচ্ছে। মনে হয়, পুরুষপুরের জল আমার ঠিক সহ্য হয়নি।

মহামিশ্র একজন পরিচারককে শীতল জল আনতে বললেন। জলপান করে সম্রাট কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন।

একজন দ্বাররক্ষী এসে জানাল নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক সম্রাটের দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

সম্রাট হাত নেড়ে তাকে আসার অনুমতি দিলেন।

সন্তর্পণে জাষ্ক প্রবেশ করে প্রথমে সম্রাট ও পরে অন্যান্য সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বিগলিত ভাবে বললেন, সম্রাট! আমাকে আদেশ করেছেন?

কণিষ্ক স্থির দৃষ্টে জাষ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই নগরের প্রধান কে?

আজ্ঞে, আমি!

নগরে দিনের পর দিন কী ঘটে চলেছে সে সম্বন্ধে কিছু খোঁজ রাখ?

কী সম্রাট? কী ঘটছে?

মহামিশ্র লক্ষ করলেন, সম্রাট তাঁর ক্রোধ পরিপাক করে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললেন, নগরে একের পর এক হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে। একজন অপরাধীও এ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। কেন?

জাষ্ক বিনীত স্বরে বললেন, ক্ষমা করলেন, সম্রাট। আমি অনুসন্ধান করছি। কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতি এই কান্ডগুলি সংঘটিত করছে। তবে তারা আমার জাল থেকে বেরোতে পারবে না। ধরা পড়বেই।

সম্রাট প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করে বললেন, খুশি হলাম। কিন্তু ধর্মীয় গোষ্ঠীরা যে অশান্তির চেষ্টা করছে তার কোন সংবাদ রাখ কি?

নিশ্চয় সম্রাট। নীলাকার তো কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই বন্দী করেছেন। বাকিরাও নিশ্চয় ধরা পড়বে।

সম্রাট মনের ভাব গোপন করে এবার শেষ কথায় এলেন, সেই দস্যুর কী হল? রত্নগুলি উদ্ধারেরই বা কী হল? অনেক দিন তো হয়ে গেল।

জাষ্ক এবার বেশ দৃঢ় স্বরে বললেন, সম্রাট! আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে —তবু বলছি, সমাজ-উৎসবের দিন পর্যন্ত আমায় সময় দিন। যদি এর মধ্যে আমি সব সমস্যার সমাধান করতে না পারি—তাহলে সমাজ-উৎসবের পরের দিনই আমি পদত্যাগ করব। আপনাকে আর কষ্ট করে আমাকে পদত্যাগ করাতে হবে না।

সম্রাটের সঙ্গে উপস্থিত সবাই জাষ্কের এই দৃঢ় মনোভাবে বিস্মিত হলেন। শুধু সম্রাট প্রশ্ন করলেন, সমাজ-উৎসব পর্যন্ত কেন?

কারণ আছে, সম্রাট। ঐ দিন জনতার মনের আগল খুলে যাবে। আজ যারা মুখ খুলতে চাইছে না সেদিন মদ্যের প্রভাবে এবং খুশির জোয়ারে ভেসে গিয়ে হুড় হুড় করে সব বলে দেবে। আমার জাল ছড়ানো হয়ে গেছে। প্রতিদিন উৎসব কেন্দ্রে আমার সাদা পোশাকের প্রহরীরা ঘুরে বেড়াবে...সে বিস্তৃত ব্যাপার। সম্রাট যখন এতদিন আমার অপদার্থতা সহ্য করেছেন—তখন এই কটা দিনের সময় আমায় ভিক্ষা দিন। এটিই আমার শেষ সুযোগ...!

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন অবাক হয়ে। জাষ্ককে তাঁরা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। জাষ্ক কি সত্যিই স্বইচ্ছায় অপদার্থতার গ্লানি নিয়ে পদত্যাগ করবে? বাধ্য তো সে হবেই, কারণ নিজেই সে অপরাধী।

সভায় নিস্তব্ধতা ঘনাল।

সম্রাট যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, উত্তম। তাই হোক। তুমি এবার আসতে পার।

জাষ্ক বিদায় নিলে সম্রাট বললেন, তোমরা কি কিছু বুঝতে পারলে?

গুণবর্ধন আর নীলাকার বললেন, না সম্রাট। এটা যদি জাষ্কের অভিনয় হয়—তবে সে সফল অভিনয় করেছে।

মহামিশ্র! তোমার কী অভিমত!

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! জাষ্কের আচরণ রহস্যময়! আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমাদের সমাজ-উৎসব পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর গতি নেই। তবে আমাদের সব দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। আপাতত আমি একথাটুকুই বলতে পারি।

সম্রাট বললেন, তোমার অনুমান সত্য, মহামিশ্র। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়ও আমাকে এই কথাই বলছে। নীলাকার...? গুণবর্ধন?

নীলাকার আর গুণবর্ধন বললেন, সম্রাট! অস্বীকার করব না যে আমরা

একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জাষ্ক সময় ক্রয় করতে চাইছে। কেন? হয় সে দেশত্যাগ করে পূর্বাঞ্চলে বা দক্ষিণাঞ্চলে পালাবার মনস্থির করেছে—আর না হয় এর মধ্যে সে কোন অশান্তির পরিকল্পনা করেছে। জাষ্কের প্রতিশ্রুতি যদি সত্য হয় তবে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অসত্য হলে—আমরা অপ্রস্তুত থাকলে সমূহ বিপদ! আমাদের আজ থেকেই সমস্ত রকম প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। জাষ্কের কথায় এক রহস্যময়তা রয়েছে।

সম্রাটের কপালে আবার বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। উৎকণ্ঠিত মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আরও একটু জলপান করে আপনি বিশ্রাম নিতে চলুন!

মৃদু কণ্ঠে সম্রাট বললেন, একটু অপেক্ষা কর। জল দাও। জলপান করে সম্রাট একটু সুস্থ বোধ করলেন।—সেই বিষ্ক আর ভট্টরাই কোথায়? তাদের সমস্যাটা মিটিয়ে দিই।

সেই মুহূর্তে দ্বাররক্ষী আবার ঘোষণা করল, সম্রাট! তোরণ-প্রধান ও উপ-প্রধান আপনার দর্শনের অভিলাষী।

গুণবর্ধন আর নীলাকার বিষ্ক আর ভট্টরাইকে দেখে বিস্মিত হলেন।—এরা!

সম্রাট বললেন, আমি আদেশ করেছি। তোমরা চেন নতুন উপ-তোরণ প্রধানকে?

হ্যাঁ সম্রাট। আপনার আদেশে সম্প্রতি এর পদোন্নতি ঘটানো হয়েছে।

এর সম্বন্ধে তোমরা কিছু কি জানো?

সব কিছুই জানি সম্রাট। এর উদ্যোগে আমাদের সাক্ষী বিনাগ বেঁচে গেছে। জনাগও নিশ্চয় বেঁচে যাবে।

এর বিরুদ্ধে তোমাদের বলার মতো কিছু আছে?

না, সম্রাট। এ এক সপ্রতিভ যুবক। কর্মঠ। অস্ত্র দক্ষ। বিশ্বস্ত বলেই মনে করি। কোন বিরুদ্ধ মতামত নেই।

সম্রাট বললেন, আমি একে আগামীকাল থেকেই মহামিশ্রের অধীনে প্রাসাদের এক বিশেষ অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করতে চাই। মহামিশ্র অধিক চাপে বিব্রত। এই সম্ভাব্য আপৎকালীন অবস্থায় মহামিশ্রের একজন যোগ্য সহকারীর প্রয়োজন।

আমরা তা স্বীকার করি।

সম্রাট এবার বিষ্কের দিকে তাকালেন।—বিষ্ক!

আদেশ করুন সম্রাট!

আমি জানি ভট্টরাই চলে গেলে তোমার অসুবিধা হবে—বিশেষ করে এই মুহূর্তে। তোমরা যৌথভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলে। সেজন্য আমি তোমার ওপর প্রীত। তোমার পদোন্নতি ঘটাবার বিষয়টি মহামিশ্র, গুণবর্ধন আর নীলাকার বিবেচনা করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার প্রশ্ন, ভট্টরাইকে তুমি ছাড়তে পারবে কি না?

সম্রাটের স্বার্থে আমি সব কিছুই ছাড়তে প্রস্তুত। কর্মের অতিরিক্ত বোঝা আমি বহন করতে সম্মত আছি সম্রাট।

সম্রাট বললেন, না। একজনের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোয় প্রশাসকের হয়ত কিছু কিছু সুবিধা হয়—কিন্তু পরিণাম ভাল হয় না। গুণবর্ধন...!

গুণবর্ধন সম্রাটের বক্তব্য মুহূর্তে বুঝে নিলেন। বললেন, কোন অসুবিধা নেই সম্রাট! আমার বিভাগের পদ্মলোচন বলে এক তরুণকে আমি উপ-প্রধানের পদে পূর্বেই মনোনীত করেছিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশে তা রোধ করতে বাধ্য হই। এখন আমি স্বচ্ছন্দে তাকে বিষ্কের অধীনে পাঠাতে পারি—অবশ্য বিষ্ক যদি তাকে গ্রহণ করতে চায়।

পদ্মলোচনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। চমৎকার তরুণ। তবে...!

তবে কী?

ভট্টরাইয়ের পরিবর্ত হলেও সে ভট্টরাই নয়!

সম্রাট বললেন, আমি দুঃখিত বিষ্ক। কিন্তু তোমাকে...!

বিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, আমাকে ক্ষমা করবেন, সম্রাট। আমায় ভুল বুঝবেন না। আসলে আমি ভট্টরাইয়ের সঙ্গে আত্মীকভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম...!

সম্রাট বললেন, তোমায় বুঝতে আমার ভুল হয়নি, বিষ্ক। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে সহকারীদের সঙ্গে এই আত্মীক সম্পর্কেরই প্রয়োজন। তবে এই জগতে কেউ কারোর যথার্থ পরিবর্ত হতে পারে না। ব্যক্তিগত দোষগুণ নিয়েই এক একটি ব্যক্তিগত মানুষ। এ জগতে কোন ধর্ম প্রচারক কি বুদ্ধের পরিবর্ত হতে পারেন? তবু মানুষ অন্যান্য ধর্মগুরুদেরও তো শ্রদ্ধা করেন।

বিষ্ক বললেন, জানি সম্রাট! তাই আপনার মুদ্রায় ভারতীয়-অভারতীয় সব ধর্মগুরুদেরই মূর্তি খোদিত হয়। আমি ধন্য সম্রাট! আপনি হয়ত সম্রাট অশোকের সঠিক পরিবর্ত নন। কিন্তু আপনার কীর্তি-কলাপে আপনি আর এক অশোক হয়ে উঠেছেন। সুদূর বল্খ থেকে কোংকন উপকূল, পূর্বে পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী

অঞ্চল, এদিকে অমরাবতী—আপনার ছত্রছায়ায়। প্রজারা আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আমায় মার্জনা করবেন।

সম্রাট কথা বললেন না। হাত নেড়ে বিষ্ককে প্রশস্তি থেকে বিরত করলেন। তারপর কোন রকমে বললেন, কাল প্রভাতেই ভট্টরাই তোমার দায়িত্ব বুঝে নিও।

সম্রাটের অসুস্থতা এবার সকলের চোখে পড়ল! মহামিশ্র বললেন, আর নয়, সম্রাট! সভা ভঙ্গ হোক। আমরা আছি। আপনি বিশ্রাম নেবেন চলুন।

গুণবর্ধন আর নীলাকারও বলে উঠলেন, হ্যাঁ সম্রাট। আপনি বিশ্রাম নিন।

সম্রাট অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মথুরা থেকে এক গুপ্তচরের আগমনে তিনি বসে পড়লেন, কী সংবাদ?

গুপ্তচরটি অভিবাদন জানিয়ে বলল, সম্রাট! সংবাদটি অশুভ হলেও বর্তমানে তত অশুভ নয়।

মহামিশ্র কঠোর গলায় বললেন, ভণিতা রেখে স্পষ্ট করে বল।

গূঢ়পুরুষটি বলল, মথুরায় নাগ-বংশীয়েরা এক উত্থানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে! যুবরাজ বাসিস্ক তাদের সফলভাবে দমন করেছেন। কিন্তু তিনি আহত হয়েছিলেন। তবে...!

কণিষ্ক একটি চাপা আর্তনাদ করে বাম বুক চেপে ধরলেন।

গুপ্তচরটি ভীত হয়ে দ্রুত বলল, বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

সম্রাটের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া না পেয়ে মহামিশ্র চিৎকার করে পরিচারকদের ডাক দিলেন।—শিঘ্র এস!

সম্রাট অসুস্থ হবার পূর্ব মুহূর্তে বিষ্ক সভাকক্ষ ছেড়ে নগর-তোরণের দিকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু ভট্টরাই পরিচিত একজনকে দেখে কথা জুড়েছিল। মহামিশ্রের চিৎকারে সেও ভেতরে ছুটে এল।—ভন্তে মহামিশ্র...!

মহামিশ্র তখন গূঢ়পুরুষটির সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, তুমি সম্রাটের অসুস্থতার কথা কারোর কাছে প্রকাশ করবে না। এমনকি যুবরাজের কাছেও নয়। যাও। বিশ্রামাগারে যাও।

এবার মহামিশ্র দ্রুত ভট্টরাইয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।—ভট্টরাই! তুমি তোমার অশ্ব নিয়ে দ্রুত আচার্য চরকের কাছে ছুটে যাও। তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তাঁকে নিয়ে এস। বলবে সম্রাট বামবক্ষে বেদনা অনুভব করছেন —হয়ত হৃৎপিন্ডের কোন ব্যাধি! সম্রাট জ্ঞান হারিয়েছেন।

পরিচারকরা সম্রাটকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। গুণবর্ধন আর নীলাকার তখনও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মহামিশ্র বললেন, আপনারা আপনাদের কর্মস্থলে ফিরে যান। আমি আচার্য চরককে আনতে পাঠিয়েছি। আমি যোগাযোগ রাখব। আর হ্যাঁ, ভন্তে নীলাকার। মথুরার গূঢ়পুরুষটির দিকে লক্ষ রাখবেন সে যেন কোনও ক্রমেই সম্রাটের অসুস্থতার কথা কারোর কাছে প্রকাশ না করে। দ্বিতীয়ত, পরিচারকদের মধ্যে দু একজন যারা প্রাসাদের বাইরে থাকে—তাদের গৃহে ফেরা আজ স্থগিত থাকবে। আমার কার্যালয়ের করণীকদের কাছ থেকে তাদের বাসস্থান জেনে নিয়ে তাদের গৃহে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। কারণ, একটা কিছু দেখিয়ে দেবেন। সম্রাটের শারীরিক পরিস্থিতি যথার্থ কী তা না জানা পর্যন্ত সম্রাটের অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদটি গোপন থাকাই ভাল বলে আমি বিবেচনা করি।

গুণবর্ধন আর নীলাকার বললেন, যথার্থ।

গুণবর্ধন চলে গেলে নীলাকার কার্যালয়ের করণিকদের সন্ধানে এগোলেন। মহামিশ্র দোতলায় সম্রাটের কাছে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা রাখলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। আচার্যের আশ্রমে দেওয়ালগিরিগুলি এক এক করে জ্বলে উঠছিল। নতুন কিছু কুটীর নির্মিত হচ্ছিল—কমলিকার বদান্যতায়। আচার্য তাঁর আরোগ্য নিকেতনের কাজকর্ম পরিদর্শন করে সবে তাঁর কুটিরের দাওয়ায় বসে জলপান করছিলেন, ঠিক সেই সময় অশ্ব ছুটিয়ে ভট্টরাইকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তিনি দাওয়া থেকে নেমে পড়লেন।

ভট্টরাই আচার্যের সামনে বল্গা আকর্ষণ করে ঘোড়াটিকে থামাল। তীব্র চিঁ-ইঁ-ইঁ শব্দ করে সামনের দুটি পা কয়েক মুহূর্তের জন্য ওপরে তুলে ঘোড়াটি থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নামল ভট্টরাই।

ভট্টরাই! তুমি! কি হয়েছে? এতকাল পর! কমলিকার...!

ভট্টরাই আচার্যের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, সম্রাট অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। বাম বুকে হৃদপিন্ডের কাছে বেদনা বোধ করছেন। আপনি এখনই চলুন।

চরকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হৃদপিণ্ডে বেদনা! তুমি একটু অপেক্ষা কর ভট্টরাই। আমি প্রয়োজনীয় ঔষধীর থলিকাটি নিয়ে আসি।

ভট্টরাই আবার ফিসফিস করে বলল, খুব গোপনীয়।

আচার্য চরক আরোগ্যশালার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভট্টরাইয়ের গলার স্বর শুনে আচার্য গৃহিণী দাওয়ায় বেরিয়ে এলেন।—কী সংবাদ, ভট্ট? এতদিন পরে—হঠাৎ? কমলিকা...?

ভট্টরাই সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, ভাল আছে, মা।

আচার্যকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

প্রাসাদে!

কেন? কার ব্যাধি?

এই মুহূর্তে বলা নিষেধ রয়েছে, মা। ক্ষমা করবেন। কমলিকার সঙ্গে মাঝে একদিন আমার দেখা হয়েছিল। অনেক কথা হল।

আচার্য অতি দ্রুত ফিরে এলেন।—আমি প্রস্তুত ভট্টরাই।

তবে আসুন আমরা যাই।

কিন্তু...!

কিসের কিন্তু—আচার্য?

যাবে কিসে? ঔষধী নিয়ে জঙ্গল থেকে তো ওরা এখনও ফেরেনি। একটু অপেক্ষা কর। এখুনি ওরা ফিরবে।

না আচার্য! ক্ষমা করবেন। অপেক্ষা করার জন্য এক মুহূর্তেরও সময় নেই। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। আপনি আমার অশ্বে উঠে পড়ুন। আর হ্যাঁ। উত্তরীয়ে মুখটি ঢেকে নিন। পথে কারোর কৌতূহল আকর্ষণ করতে চাই না। দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছোটাল ভট্টরাই।

মহামিশ্র আচার্যের জন্য তাঁর কার্যালয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ভট্টরাই আচার্যকে নিয়ে আসামাত্র মহামিশ্র উঠে পড়লেন।—ভট্টরাই তুমি এই মুহূর্ত থেকে দায়িত্বভার নাও। কোন পরিচারক-পরিচারিকা যারা বাইরে থেকে আসে —তারা আজ বাড়ি যেতে পারবে না। তাদের গৃহে নীলাকার সংবাদ পাঠিয়ে দেবে। তাদের রাতের আহারের ব্যবস্থা এখানেই হবে। আমি আচার্যকে নিয়ে সম্রাটের কাছে যাচ্ছি। না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

ভট্টরাই বলল, চিন্তা করবেন না। আমি আছি।

ভট্টরাই তার কাজ শুরু করে দিল। করণীকের কাছ থেকে জেনে নিল ক-জন বাইরে থেকে আসে। তারপর তাদের ডেকে পাঠাল। এক সময় সে কাজ শেষ করে আসনে আরাম করে বসে চোখ বন্ধ করল। আশ্চর্য! ঠিক সেই মুহূর্তে কমলিকা যেন তার বন্ধ চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।—সম্রাট

তোমাকে বিশেষ অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেছেন! আমার প্রাণ রক্ষার দায়িত্বও কি তোমার হাতে?

শুধু তোমার কেন? সম্রাট এবং আরও সকলের।

চোখ খুলে ফেলল ভট্টরাই। মনের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে যাওয়া এক চঞ্চলতা আবার জেগে উঠল।—কমলিকা তার মাথার ওপরই রয়েছে। হয়ত শুয়ে আছে। নয়ত কারোর সঙ্গে গল্প করছে। না-না। তা সম্ভব নয়। সে এখন উৎকণ্ঠিত ভাবে সম্রাটের কক্ষে রয়েছে। দেখছে আচার্য চরকের চিকিৎসা!

সম্রাটের শয্যার কিনারায় একটি আসনে দন্ড খানেকের অধিক সময় ধরে বসে আচার্য চরক সম্রাটের দিকে চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে ছিলেন। ঔষধী প্রয়োগ করেছেন জ্ঞান ফেরাবার জন্য।

এক সময় সম্রাটের জ্ঞান ফিরে এল। আচার্যকে সামনে বসে থাকতে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন সম্রাট।—আমার কী হয়েছে আচার্য? আপনি!

আচার্য সম্রাটকে চেপে ধরে শুইয়ে দিয়ে বললেন, চুপ। কোনও কথা নয়। তারপর তাঁর হাতের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা শুরু করলেন। এক সময়ে তাঁর মুখে সন্তোষের রেখা ফুটে উঠল। চরক এবার কক্ষে উপস্থিত পরিচারিকা, প্রাসাদ-রমণীদের দেখে নিয়ে মহামিশ্রকে কাছে ডাকলেন। মহামিশ্র কাছে আসতেই তিনি বললেন, সম্রাট এখন কম করে তিন সপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন এবং ঔষধী সেবন করে যাবেন। শয্যা থেকে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ওঠানামা করবেন না। তাও একা নয়। কারোর সাহায্য নিয়ে তিনি স্নান-ঘর ইত্যাদিতে যাবেন।

সম্রাট হঠাৎ বলে উঠলেন, মহামিশ্র—বাসিষ্ক?

মহামিশ্র বললেন, গূঢ়পুরুষটি তো বলল, যুবরাজ সুস্থ আছেন।

সমাজ-উৎসবে তাকে ডেকে পাঠাব। উদ্বোধনের দিনে সে থাকতে পারেনি।

কথাবার্তা একেবারে বলার চেষ্টা করবেন না। ভুলে যাবেন না, আপনি সম্রাট হতে পারেন, কিন্তু এখন আয়ুর্বেদাচার্য চরকের এক রোগী মাত্র। আমার আদেশ আপনাকে মান্য করতেই হবে। চরক বললেন।

সম্রাট আবার কিছু বলার চেষ্টা করতেই আচার্য চরক আবার বলে উঠলেন, সম্রাট! ভুলবেন না যে প্রাণটা আপনার নিজস্ব নয়। এই প্রাণের ওপর সাম্রাজ্যের শত শহস্র মানুষের প্রাণও নির্ভর করছে। আপনার যোগ্য লোকের অভাব নেই। মহামিশ্র রয়েছেন, মন্ত্রীরা রয়েছেন, গুণবর্ধন, নীলাকার রয়েছেন। মথুরায় পুত্র বাসিষ্ক রয়েছে। সম্প্রতি আর একটি সেবককে তো এনেছেন দেখছি —ভট্টরাই। সবাই মিলে আপনার কিছুদিনের অনুপস্থিতি সামলে নিতে পারবে। ক-দিন পর থেকেই আপনি শয্যায় শুয়ে শুয়েই নির্দেশ দিতে পারবেন। তাঁরা সব যথাযথ ভাবে পালন করবেন। কি মহামিশ্র? কিছু ভুল বললাম কি?

মহামিশ্র বললেন, মোটেও নয়।

সম্রাট হতাশ হয়ে চোখ বুঁজলেন। চরক উঠে দাঁড়িয়ে মহামিশ্রকে ডেকে বাতায়নের দিকে নিয়ে গেলেন।—একটু কথা আছে।

একটু একান্তে গিয়ে চরক প্রশ্ন করলেন, কণিষ্কপুরে বৈদ্যরা সম্রাটের রোগ লক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলেছিল?

হ্যাঁ। সান্নিপাতিক।

মূর্খ! শুনুন মহামিশ্র! সম্রাটের হৃৎপিন্ডের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। হৃৎপিন্ডে একটু মৃদু আঘাত তিনি পেয়ে গেছেন। ভয়ানক পুনরাবৃত্তি যেকোন সময় ঘটতে পারে। অবশ্য ঔষধীতে এর প্রতিকার রয়েছে। সম্রাটের নাড়ির গতি পরিমাপ করলাম। এ যাত্রায় তিনি বেঁচে যাবেন—অবশ্য কিছুদিন তাঁকে সাবধানে রাখতে হবে। উত্তেজনা বা চিন্তা করার কোন ঘটনাই যেন না ঘটে।

স্মরণ থাকবে আচার্য। কিন্তু সামনেই সমাজ-উৎসব। এ সময়েই সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়লেন!

আচার্য বললেন, সমাজ-উৎসব প্রতি বছরই হবে। তবে উৎসবের আগে সম্রাট আশাকরি যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠবেন। বাইরে না হোক, প্রাসাদের ভেতরে কিছু হাঁটা-চলা এবং প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে পারবেন—অবশ্য যদি নিয়মিত ঔষধীগুলি সেবন করিয়ে তাঁর নিপুণ সেবা করা যায়। প্রাসাদ-রমণীদের মধ্য থেকে দু-একজন কি সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের সেবার দায়িত্ব নিতে পারবে? বিশেষ করে আজ রাত্রে? আমি সম্রাটকে নিদ্রার ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, তাঁর গভীর ঘুমের প্রয়োজন।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট সব প্রাসাদ রমণীদের পছন্দ করেন। অন্তত কারোর বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিনি। তবে ইদানিং মণিকার পুত্রীকে একটু বেশি পছন্দ করছেন বলে মনে হয়।

কমলিকা পছন্দ করারই যোগ্য। তবে তাকেই আজ রাত্রে সম্রাটের পরিচর্যার জন্য রাখুন। কাল সকালে, পরপর কয়েকটি নামের তালিকা তৈরি করে ফেলুন। এই তালিকায় চার-পাঁচজনের বেশি নাম না রাখাই ভাল।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাটের এই অসুস্থতার সংবাদ তো গোপন রাখা সম্ভব নয়। রাজসভায় কালই প্রশ্ন উঠবে।

চরক বললেন, কেন? অসুবিধা কোথায়? বলবেন সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন সম্রাট। কণিষ্কপুরের বৈদ্যদের কথাই মেনে নিন। ঐ কথাই সবাই জানে।

সবাই তো দেখা করতে চাইবেন।

এই অবরোধে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোনও পুরুষের প্রবেশ তো নিষেধ। তাছাড়া বলবেন, চরক নির্দেশ দিয়েছেন, সম্রাটের পক্ষে কথা বলা বারণ। শয্যা ত্যাগও নিষিদ্ধ। তবে দূর থেকে দেখেই তাঁরা যেন চলে যান। কাছে যেতে দেবেন না। তারপর একটু সুস্থ হলে দেখা যাবে।

চরক সম্রাটের শয্যার কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে বললেন, আর একটা কথা। মণিকার পুত্রীকে ডেকে দিন। রাতের ঔষুধীগুলি আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য আমি ফিরে গিয়ে আমার দেবল নামে এক যোগ্য শিষ্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতের ঔষুধীর দায়িত্ব সে নিয়ে নেবে। শুধু সম্রাটের ঘরের কাছাকাছি কোথাও তার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। রাতটি একটু বিপজ্জনক হয়ে উঠতেও পারে। একজন বার্তাবাহককে প্রস্তুত রাখবেন যাতে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আমায় নিয়ে আসতে পারে। তবে হ্যাঁ, ভট্টরাইয়ের অশ্ব চড়তে আমি আর প্রস্তুত নই। অশ্ব না ঝড়!

মহামিশ্র হাসলেন।—চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটি অশ্বশকট আমি সদা প্রস্তুত রাখছি আপনাকে দিয়ে আসা—নিয়ে আসা করার জন্য।

চরক বললেন, হ্যাঁ। ভট্টরাই বা আমাকে কেন আনতে গেল?

ও! আজই সম্রাট তাঁকে আমার সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। সে এখন প্রাসাদের বিশেষ অধিকর্তা।

আনন্দ সংবাদ! আশীর্বাদ করি সে আরও উন্নতি করুক!

সম্রাটের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদে কমলিকা কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। তার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে সম্রাটের মাথায়—বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সম্রাট তার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। তাই সম্রাটের ঘরে অন্যান্য প্রাসাদ-রমণীদের সঙ্গে সে ছুটে গেলেও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। উপায় নেই। ইতিমধ্যেই তো সে অধিকাংশের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠে সময় বিশেষে নানান বক্রোক্তি শুনছে। কমলিকা অবশ্য প্রতিবাদ করে না। শুনে যায় আর মনে মনে আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিজ্ঞা করে—সম্রাটকে সে অধিকার করবেই। এমনই এক বলিষ্ঠ, ক্ষমতাবান, স্থিতধী মানুষকে সে মনের গভীরে লালন করে এসেছে। সম্রাটের কিছু গুণ ভট্টরাইয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হলেও পরিমাণগত ভাবে তা অতি ক্ষীণ। সম্রাট বিশাল, বিপুল! তাই সম্রাট—সম্রাটই আর ভট্টরাই এক সেনানী মাত্র। বাধা তো আরও—বৈভবের! সুতরাং স্বার্থবাদী হতেই হয়েছে কমলিকাকে। না। ভট্টরাইকে সে ভুলবে না। সাধ্য মতো উপকার করবে। সে প্রতিষ্ঠিত হোক। তার যোগ্যতা রয়েছে। ভট্টরাইয়ের প্রয়োজন শুধু কিছু যোগাযোগের। বন্ধু হয়েই থাক ভট্টরাই। মাঝে মাঝে নিজের ব্যবহারেই নিজে অবাক হয় কমলিকা। জীবনে দু-চারজন তরুণের সঙ্গে তার আলাপ হয়নি এমন নয়। কিন্তু তারা কেউই তো ভট্টরাইয়ের মতো মনে দাগ ফেলেনি! তার চিন্তার খোরাক হয়নি। আশ্চর্য! কতটুকুই বা তাদের আলাপ! কেন সে ভট্টরাই সম্পর্কে এক অপরাধবোধ অনুভব করে?

সম্রাটের এক মৃদু আর্তনাদে সচকিত হয়ে উঠল কমলিকা। সম্রাটের বুকে কষ্ট হচ্ছে—যদিও আচার্য চরকের ঘুমের ঔষধীতে তিনি গাঢ় আচ্ছন্ন! কমলিকা ভাবল, সম্রাটের যন্ত্রণা তার বুকে বাজছে কেন? সে কি সত্যই সম্রাটকে ভালবেসে ফেলেছে? কিন্তু সম্রাট যে তাঁর প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করছেন—সেটা সম্ভবত বাহ্যিক। কারণ, কণিষ্কপুরেও সে লক্ষ্য করেছে, সম্রাট যে সাগরে ডুব দিয়েছেন সেখান থেকে তাঁর আবার পাড়ে এসে ওঠা মুশকিল। সম্রাট যদি সত্যিই আশু সংসার জীবনে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ না করেন তাহলে তার এই ভালবাসার পরিণামই বা কী হবে? সে কি অনূঢ়া থেকে যাবে? তার দেহের কামনা কি নীরবে-নিভৃতে মাথা কুটে মরবে? সে পুরুষ নয়—নারী। যতদিন দেহে যৌবন পূর্ণমাত্রায় থাকবে ততদিন পুরুষের চোখে তার মূল্য। সে সৌন্দর্যও যদি অপেক্ষা করতে করতে মিলিয়ে যায় শূন্যে তবে তার আর কী থাকবে? সম্পদ গেছে। ভালোবাসাটুকুও যাবে? হ্যাঁ সে সম্রাটকে—ঐ পত্নীহীনা অসহায়

পুরুষটিকে ভালবেসে ফেলেছে। না। ধনসম্পদ নয়, ক্ষমতা—বৈভবও নয়। সে চায় তার কল্পলোকের মানুষটির কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। সম্রাটের কক্ষে পা দিয়েই তার মনে হয়, এ তার নিজের কক্ষ। এ তার নিজের শয্যা! তাই তো মনপ্রাণ দিয়ে সে এই কক্ষ-সজ্জা করে। সম্রাটের আলিঙ্গনকে অনুভব করার চেষ্টা করে। এই মুমূর্ষু সম্রাটকে সে নিজের দায়িত্বে সেবা করতে চায়। কিন্তু তার সুযোগ কোথায়? সে সম্রাট-দখল-প্রতিযোগী দলের এক সদস্যা ভিন্ন তো আর কেউ নয়! নিলর্জের মতো সে সেই অধিকার প্রার্থনা করতেও পারে না—যদিও কমলিকা জানে, অন্যান্য প্রাসাদ-রমণীদের বেশির ভাগ সম্রাটের শয্যায় অংশ গ্রহণ করতে যতটা উৎসাহী—তাঁর সেবার জন্য ততটা নয়। দোষও দেওয়া যায় না, এরা সবাই বিত্তশালী ঘরের মেয়ে। সেবা নিতে অভ্যস্ত—করতে নয়। যদিও তারাও ছিল এক উচ্চশ্রেণির পরিবার। কিন্তু এদের তুলনায় কিছু নয়। বাবার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রত্নরাশির কোনও বাস্তব মূল্য ছিল না—যতক্ষণ না তা অর্থে পরিণত করা যেত। পেটিকাবদ্ধ হয়ে তারা ছিল মূল্যহীন। বাবা জীবিত থাকলেও বোধহয় একই হোত। বাবা ওই রত্ন বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতেন না। তাই ব্যবসার কল্যাণে তারা হয়ত যথেষ্ট ধনী ছিল। কিন্তু বিপুল ধনী নয়। ফলে, তাদের গৃহে প্রয়োজনীয় দাসদাসী থাকলেও 'সেবা' নামক জিনিসিটির দিক থেকে তারা দূরে ছিল না। বাবা অসুস্থ হয়েছেন, মা অসুস্থ হয়েছেন—সে নিজেও হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে সেবা করে সুস্থ করে তুলত। রাত্রি জাগরণও হোত কখনও কখনও। মোটকথা—এসব কিছু তার কাছে নতুন নয়।

মহামিশ্রের মৃদু ডাকে চমক ভাঙল কমলিকার, নিঃশব্দে সে এগিয়ে গিয়ে সম্রাটের শয্যার কাছাকাছি দাঁড়াল।—আজ্ঞা করুন, মহামিশ্র।

তুমি কি একটি গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত?

কী দায়িত্ব, ভন্তে?

আজ রাতে সম্রাটের পরিচর্যার ভার তোমাকে দিতে চাই।

কেঁপে উঠল কমলিকা। বুদ্ধের করুণাঘন মুখ যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।—আমি প্রস্তুত, মহামিশ্র। বলুন, আমায় কী করতে হবে? কিন্তু আমার অন্য সহকর্মিণীরা?

সবাই এক এক করে সুযোগ পাবে। অবশ্য তারা যদি কেউ রাজি থাকে। সম্রাট ইদানিং তোমাকে পছন্দ করছেন, তাই প্রথম সুযোগটা তোমাকেই দিতে চাই।

আচার্য চরক নীরবে লক্ষ করছিলেন কমলিকাকে।—ভয় কী, মা? এস, আমি করণীয় কর্ম ও ঔষধীগুলি তোমায় বুঝিয়ে দিই। অবশ্য আমি আশ্রমে গিয়ে আমার এক শিষ্য দেবলকে পাঠিয়ে দোব। সে তোমার পাশের ঘরেই থাকবে। সুতরাং, চিন্তার কিছু নেই মা!

কমলিকা মৃদু হেসে বলল, আমি চিন্তা করছি না আচার্য। ভাবছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি বুঝিয়ে দিন।

সেদিন রাত্রে কার্যালয়ের নিভৃত কক্ষে বসে ছিলেন জাষ্ক আর হিউ-পিনানের প্রতিনিধি। তিনি নিয়ে এসেছিলেন প্রভূত অর্থ। সঙ্গে দশ জন ঘাতকের একটি দল। তারা বৌদ্ধ শ্রমণের বেশে বল্খের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রয়েছে। অবস্থান করছে পুরুষপুরের সঙ্ঘারামে। বল্খের মূল প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই ফিরে গেছে। কিন্তু শ্রমণবেশী ঘাতকের দল বলেছে এত পরিশ্রম করে তারা এদেশে এসেছে। তাই, বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি না দেখে তারা ফিরবে না।

সঙ্ঘারামের আচার্য সংঘরক্ষিত অনুমতি দিয়েছেন।

ঘাতকের দল বলছে নগরাধ্যক্ষ জাষ্ক তাদের দেশের মানুষ—পরমাত্মীয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করে—কয়েকদিন কাটিয়ে তবেই আমরা অন্য জায়গায় যাব। তবে শুনেছি, দেশজুড়ে আসন্ন সমাজ-উৎসবের কথা। সেই উৎসব না দেখে আমরা নড়ছি না।

সংঘরক্ষিত বলেছেন, নিশ্চয়! সেই উৎসব না দেখলে জীবনই বৃথা। দেশের আপামর জনসাধারণ সেই উৎসব নিয়ে সকাল থেকে মাতবে। সনাতনপন্থীরা ঘৃণ্য পশুবলি উৎসব পালন করবে। সম্রাট অশোক—সমাজ-উৎসবে এই ঘৃণ্য বলিদান প্রথা রদ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সময় আর রাজনীতির সুযোগ নিয়ে তারা আবার মেতে উঠেছে। আমরা শীঘ্রই সম্রাটকে এই পশুবলি প্রথা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাব। সম্রাট অ-ভারতীয় হবার জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট দৃঢ় হতে পারছেন না। ভারতীয় হবার কল্যাণে যা সম্রাট অশোকের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল—সম্রাট কণিষ্কের পক্ষে সেটা ততই দুরূহ। আরও অসুবিধা হচ্ছে, পূর্বতন দুই সম্রাট ছিলেন শৈবধর্মী। তাঁদের সময়েই সনাতনপন্থীরা সুযোগ পেয়ে গেছে!

হিউ-পিনানের প্রতিনিধিই জাষ্ককে ঘাতকদের কথাগুলি বলল।—শুনলে

তো—তারা বলেছে তুমি তাদের পরমাত্মীয়। সুতরাং তোমার, সঙ্গে সময়-অসময় তাদের দেখা করতে কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়।

জাষ্ক বললেন, সে তো নিশ্চয়। যাহোক, মন্ত্রী ইউনাস প্রাসাদের একটি নকশা আমার কাছে কাল পাঠিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন। ঘাতকেরা তা এখানে বুঝে নিয়ে কণ্ঠস্থ করে নেবে।

হিউ-পিনানের প্রতিনিধি বলল, ধর্মীয়গোষ্ঠীর নেতারা তো ব্যর্থ হল। তাদের গোষ্ঠীর সমর্থকেরাই এই অশান্তি পছন্দ করেনি। যা হোক, আমি মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবলের কাছে শুনেছি, তোমার কথা মতো নিম্ন-সিন্ধুর পহ্লব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। তারা বন্দরগুলি অধিকার করে সসৈন্যে পুরুষপুরের দিকে এগিয়ে আসবেন। তাঁদেরই একটি দল, পাশ দিয়ে পূব দিকে সরে গিয়ে প্রয়াগের রাস্তা অবরুদ্ধ করবে যাতে বাসিস্ক মথুরা থেকে পুরুষপুরে আসতে না পারে। ওদিকে চৈনিক অভিযানের নামে হিউ-পিনান নিজে সেনা সজ্জিত করে হিন্দুকুশের কাছে এগিয়ে আসবেন। প্রয়োজনে সেই সেনারা দুভাগ হয়ে গিয়ে—একদল হিন্দুকুশ পার করে কপিশা, তক্ষশিলা-পুষ্কলাবতী হয়ে পুরুষপুরের দিকে এগিয়ে আসবে। অন্যদিকে আর একদল পামির পার করে কশ্যাপপুরা হয়ে দক্ষিণে বাসিষ্ক-প্রতিরোধকারী সেনাদের সঙ্গে মিলবে। এসব ঘটনার সূত্রপাত ঘটবে সমাজ-উৎসবের কদিন আগেই। হ্যাঁ, তোমাকে সহায়তা করার জন্য সমাজ-উৎসবের দিন দশেক আগে থাকতেই প্রায় দু-সহস্র সেনা, ছোটখাট দলে বিভক্ত হয়ে কাঠুরিয়া এবং কৃষিজীবির ছদ্মবেশে পুরুষপুরের উত্তর-পাহাড়ের বুকে ঐ গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। সমাজ-উৎসবের দিন এক জ্বলন্ত তির রাতে পাহাড় লক্ষ্য করে ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পাহাড় থেকে নেমে এসে নগর তোরণ এবং নগর প্রাচীর পার করে নগরে ঢুকে পড়বে নিঃসন্দেহে। তারা এগিয়ে যাবে সৈন্যাবাসের দিকে। সমাজ-উৎসবের রাত্রে প্রতিবছর যা হয়—এবারেও তা হবে নিশ্চয়। সবাই মদ্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকবে—নয়ত নারী-ক্রীড়ায় মত্ত থাকবে। কিন্তু একটা কথা!

কী কথা!

সৈন্যাবাসে এখন সৈন্য সংখ্যা কেমন?

হাজার তিরিশেক হবে। বাকি সবই পুরুষপুরের বাইরে বিভিন্ন নগরে রয়েছে।

চিন্তিত প্রতিনিধি বলল, না। হাজার তিরিশ সৈন্য আমাদের দু'হাজার সেনার পক্ষে যথেষ্ট ভারি হয়ে যাবে। আমাদের এক উপায় অবলম্বন করতে হবে।

কী উপায়? জাষ্ক বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

উপায় খুব সরল ও সোজা। সম্রাট আজই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সান্নিপাতিক! চরক বলেছেন প্রায় তিন সপ্তা যেন সম্রাট শয্যা ছেড়ে না ওঠেন। অর্থাৎ রাজকাজ তিনি এসময়ে প্রায় দেখতেই পারবেন না। সম্রাট বিহীন রাজসভা চলবে। দায়িত্ব বর্তাবে মন্ত্রী পরিষদের ওপর।

হ্যাঁ। তাতে কী?

সিন্ধুর বিদ্রোহটা আমাদের এমন সময় করতে হবে যেন রাজকীয় সেনার সিংহভাগ সেই বিদ্রোহ দমন করতে সমাজ-উৎসবের আগেই বেরিয়ে যায়।

জাষ্ক বললেন, চমৎকার! কিন্তু গুণবর্ধন যদি অন্যস্থানের সেনাদের পাঠায়? কোংকন, সৌরাষ্ট্র থেকেও তো সেনারা যেতে পারে।

এখানেই কাজ করতে হবে ইউনাস, ভার্গব আর দুবলকে। মন্ত্রী পরিষদকে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে হবে যেন পুরুষপুর থেকেই সেনা যায়। কারণ, ঐ সব স্থানেও শক-পহ্লবেরা বিদ্রোহ করতে পারে। মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হলে অসুস্থ সম্রাটের সাক্ষর আদায় করা কোনও কঠিন কাজ হবে না। মন্ত্রী পরিষদের এই সিদ্ধান্ত সম্রাট ঐ অবস্থায় গ্রহণ না করে পারবেনও না।

জাষ্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—চমৎকার! চমৎকার! কণিষ্ক এই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আমাদের সুবিধাই করে দিল। বাকি রইল রাজপ্রাসাদ অধিকার করা। সে আমি আমার নগর প্রহরীদের বাহিনী নিয়েই পারব। সম্রাট নিহত হয়েছেন শুনলে তারা আর আমার অমতে যেতে সাহস করবে না! সম্রাটকে আমি বলেছিলাম, সমাজ-উৎসবের দিন আমি আমার সব হিসাব মিটিয়ে দোব! পরপার থেকে কণিষ্ক সব হিসেব বুঝে নেবে। অট্টহাস্য করে উঠলেন জাষ্ক।

হিউ-পিনানের প্রতিনিধি বলল, ধীরে। জাষ্ক ধীরে। আর সামান্য কটা দিন। এই সময়েই আমাদের ভীষণ সতর্কতার প্রয়োজন!

রাত তখন নিস্তব্ধ। পুরুষপুরের জনসাধারণ তখন শয্যায়। অবশ্য যাদের জেগে থাকার কথা তারা জেগে রয়েছেন জীবিকার প্রয়োজনে। তাদের নিয়মিত জাগতেই হয়। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ এমনই জাগে—কর্তব্যের জন্য। যেমন আজ এই প্রাসাদে সম্রাটের কক্ষে জেগে রয়েছে কমলিকা। রাত্রি জাগরণ তার জীবিকার মধ্যে পড়ে না। সে জেগে রয়েছে হৃদয়ের টানে। কর্তব্যের জন্য। সম্রাটের শয্যার ধারে একটা আসনে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল। ঔষধীর

প্রভাবে সম্রাট গভীর ঘুমে মগ্ন। কক্ষের বাইরে চারজন রক্ষিণীর পদচারণা। অলিন্দের এক কোণায় কয়েকজন পরিচারিকা গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। যদি সম্রাটের কোন প্রয়োজন পড়ে!

কমলিকা ভাবছিল, এ কী বিকার? সে কি বিকারগ্রস্ত হয়েছে? মহামিশ্রের কাছে সে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি নিরাপদ কর্ম প্রার্থনা করেছিল। সম্রাট তখন তার কল্পনাতেও ছিলেন না। কিন্তু মহাবিহার উদ্বোধনের সময় সম্রাট তাকে প্রথম দর্শনেই জয় করে নিলেন! সে সম্রাটের ব্যক্তিত্বে—অবয়বে মুগ্ধ হল। মনের আঙিনায় ভট্টরাই নামে যে বীজ সবে তার জীবপত্র মেলার উপক্রম করছিল—সম্রাটের বিপুল বিশালতার ছায়ায় তা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু তখনও সে ঠিক স্বপ্ন দেখা শুরু করেনি। সে যথেষ্ট বাস্তবধর্মী। কোথায় সম্রাট—আর কোথায় সে! শত যোজনের পার্থক্য। পরে মহামিশ্র যখন তাকে প্রাসাদ-রমণীদের দলে স্থান করে দিলেন—সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সম্রাটের এত কাছে! সম্রাটের সেবা করতে হবে তাকে? কিন্তু অচিরেই সে অন্যান্যদের মতো হতাশ হল। সম্রাট যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন। প্রাসাদ-রমণীরা তাঁর চারপাশে থেকেও যেন নেই! তিনি বিশেষ দৃষ্টিতে কারোর দিকে তাকান না। হাসেন না। কারোকে ধন্যবাদও জানান না। নিজেদের কেমন যেন অবান্তর—অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। তবু প্রাসাদ-রমণীরা যেন আলোক মুগ্ধ পতঙ্গের মতো। সম্রাটের ঐ দীপ্ত অবয়ব তাদের আকর্ষণ করে। নিজেদের মধ্যে চলে এক নীরব প্রতিযোগিতা। কে সম্রাটকে ধ্যান মুক্ত করতে সফল হবে? কে সম্রাটের ঐ প্রশস্ত বুকে ঝাঁপ দেবে বা তাঁর বাহুবন্ধনে ধরা দেবার সুযোগ লাভ করে রমণী জীবন সার্থক করবে! কে আশ্রয় পাবে তাঁর শয্যায়। কমলিকা জানে, সম্রাট যদি কোনদিন বুদ্ধ আর সংসারজীবনকে পৃথকভাবে মেনে নিতে পারেন—সেদিনও সম্রাটের স্ত্রীর মর্যাদা বা সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা একজনের ভাগ্যেই জুটবে। আশা হত হয়ে রণে ভঙ্গে দিয়ে অনেকেই হয়ত গৃহে ফিরে যাবে। আবার অনেকে সম্রাটের উপপত্নীর সম্মানে সম্মানিত হতে দ্বিধা করবে না। সেটাও হবে তাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু সে অসম্মানের জীবন কমলিকা কামনা করে না। সে শুধু সম্রাটকে পাবার সাধনা করে যায়। সম্রাটের কক্ষ সাজায়। কায়মনোবাক্যে নিজেকে নিয়োজিত করে। ক্রমে একটু সফলতার আভাষ সে পায়। কিন্তু কণিষ্কপুরে সে দেখেছে, সম্রাট হয়ত তার প্রতি প্রসন্ন—কিন্তু বুদ্ধসাধনার যে গভীরে তিনি প্রবেশ করে গেছেন—সেখান থেকে তাঁকে বার করে আনা অতি কঠিন কাজ!

সম্রাটের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা অস্ফুট এক শব্দে সচকিত হয়ে কমলিকা

সম্রাটের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল, সম্রাট যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। ঘুমের ঘোরে অস্পষ্টভাবে কিছু বললেন। নিজের অজ্ঞাতেই নিজের বাম বুকে হাত বোলাচ্ছেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে কমলিকা এক পরিচারিকাকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে আচার্যের শিষ্য দেবলকে ডেকে আনতে বলল। তারপর তাঁর আসনটিকে শয্যার আরও কাছে নিয়ে গেল। সম্রাট কষ্ট পাচ্ছেন। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে কমলিকা সম্রাটের বক্ষে হাত বোলানো শুরু করল। সম্রাটের দেহ স্পর্শ করে প্রথমেই সে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করল। ক্রমে সহজ হয়ে এল। তার ভালবাসার মানুষ আজ কত কাছে! প্রবল এক মমতায় কমলিকা সম্রাটের বক্ষ সেবার কাজ করতে থাকল।

দেবল কমলিকার পরিচিত, আশ্রমে পরিচয়। সে এসে বলল, কী হয়েছে, দেবী?

সম্রাটের বুকে বোধহয় যন্ত্রণা হচ্ছে। মৃদু আর্তনাদ করে ঘুমের মধ্যেই নিজের বুকে হাত বোলাচ্ছেন। এখন আমি হাত বোলাতে একটু শান্ত হয়েছেন।

চিন্তিত মুখে দেবল বলল, নাড়িটা একটু দেখি। এক সময় তার মুখ সহজ হয়ে এল। সম্রাটের হাতটি নামিয়ে রেখে দেবল বলল, না। চিন্তার কিছু নেই। আচার্যের ঔষধীগুলো খাইয়ে দিয়েছিলেন তো?

হ্যাঁ।

সম্রাট এখন প্রভাত পর্যন্ত ঘুমোবেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। ঔষধীগুলো ধীরে ধীরে কাজ করছে। আপনি প্রয়োজন বোধ করলে সম্রাটের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে পারেন। তাতে উনি স্বস্তিই পাবেন।

নতুন কোনও ঔষধি? কমলিকা প্রশ্ন করল।

না। এখন নতুন কোনও ঔষধীর প্রয়োজন নেই। আচার্য যা দিয়ে গিয়েছিলেন—তাতো খাওয়ান হয়ে গেছে। প্রভাতে আবার আচার্য আসবেন। তিনি যা ব্যবস্থা নেবার তা নেবেন। দেবল চলে গেল।

কমলিকা আবার পরম মমতায় সম্রাটের বুকে-মাথায় হাত বোলাতে থাকল। সে ভাবল, জীবনের পরম ধর্ম আজ তার মুঠির মধ্যে। সেবার মধ্য দিয়ে সম্রাটকে সে জয় করবে। তাকে টেনে নিয়ে আসবে জীবনের আঙিনায়।

প্রভাতে সত্যই সম্রাটের নিদ্রাভঙ্গ হল। কিন্তু সম্রাট চোখ মেলে আশ্চর্য হলেন। তাঁর শয্যার পাশে এক আসনে মণিকার পুত্রী বসে রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়। মণিকার পুত্রীর একটি হাত তখনও তাঁর বুকের ওপর পড়ে রয়েছে। সম্রাট

দ্বিধাগ্রস্ত হলেন—হাতটি সরাবেন কি না। সারারাত নিশ্চয় সে এভাবে তাঁর সেবা করেছে। ঘুমের মধ্যেও তিনি যেন অনুভব করেছিলেন কারোর কোমল হাতের স্পর্শ! সম্রাট মনস্থির করতে না পেরে অসহায় ভাবে কমলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, এই মুখ বড় নিষ্পাপ। পবিত্র ফুলের মতো! সম্রাট এ মুহূর্তে নিজের মনের কাছে অকপট হলেন। ইদানিং তাঁর মণিকার পুত্রীর জন্য মনের মধ্যে যেন এক মোহ জন্মাচ্ছিল। সংসার জীবনে আবার ফিরে আসার এক সুর্বণ হাতছানি যেন তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। মহাপন্ডিত অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, সংঘরক্ষিত কে না তাকে সংসার জীবনে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন! গৃহী শিষ্য হতে বাধা কোথায়? সম্রাট রয়েছেন, অথচ সম্রাজ্ঞী নেই—এ যেন সাম্রাজ্যের পক্ষে অপূর্ণতা। তাই প্রজাদেরও দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে—সম্রাট দার পরিগ্রহ করুন। সেইজন্য সম্রাট নিজের ওপর চাপ কমাবার জন্য প্রাসাদ-রমণী নাট্যের সূচনার সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা সবাই শুধু প্রতীক্ষায় রয়েছেন। সম্রাট কবে সম্রাজ্ঞী নির্বাচন করবেন? জাগতিক ভোগ বিলাসের মধ্যে ফিরে আসবেন? সম্রাট এতকাল মনে মনে হাসতেন। ভাবতেন, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা একদিন হতাশ হয়ে চাপ কমিয়ে নেবে। প্রাসাদ-রমণীরা গৃহে ফিরে যাবে। তিনি তখন আরও প্রগাঢ়ভাবে বুদ্ধের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু মণিকার পুত্রীকে প্রথম দেখা এবং তার প্রাসাদ-রমণী দলে অর্ন্তভূক্তি—অতি ধীর ভাবে সম্রাটের মনে গোপনে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। মণিকার পুত্রী কেমন করে তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করে জানলো—তিনি কেমন কক্ষ-সজ্জা পছন্দ করেন? তবে এতদিন এসব নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তা করেননি। ভাল লাগছে—লাগছে। এই পর্যন্তই। কিন্তু আজ প্রভাতে মণিকার পুত্রীকে হাত তাঁর বুকের ওপর পড়ে থাকার ব্যাপারটি যেন তাঁর মনের অনেক কিছুই ওলট-পালট করে দিল। মণিকার পুত্রীর রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত মুখটির মধ্যে তিনি যেন এক সেবিকার মূর্তি আবিষ্কার করলেন।—না! মণিকার পুত্রীর কক্ষ-সজ্জায় কোন খুঁত নেই। সেবাতেও কোন খুঁত নেই। কাল রাত্রে হতচেতন হয়ে থেকেও তিনি যেন অনুভব করেছেন সস্নেহে এক কোমল হাতের স্পর্শ। সম্রাট যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তাঁর প্রয়োজন ছিল স্নান-ঘরে যাওয়ার। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হলেন তাঁর বুকের ওপর পড়ে থাকা হাতটিকে সন্তর্পণে সরিয়ে দিতে।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল কমলিকা। উঠে দাঁড়িয়ে সলজ্জভাবে বলল, ক্ষমা করবেন সম্রাট। একটু চোখ লেগে গিয়েছিল।

সম্রাট বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা না করে বললেন, ঠিক আছে। ও

কিছু নয়। আমি একটু স্নান-ঘরে যাব।

না-না সম্রাট। একা উঠবেন না। আমি পরিচারিকাদের ডাকছি। ওরা নিয়ে যাবে আপনাকে।

সম্রাট উঠে বসে নামবার উপক্রম করলেন, না থাক। আমি একাই পারব।

সম্রাট আর কমলিকার গলার স্বর শুনে দুজন পরিচারিকার সতর্ক নিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল। তারা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াতেই কমলিকা ইশারায় তাদের ডেকে বলল, সম্রাটকে ধরে স্নান-ঘরে নিয়ে যাও।

সম্রাট যেন একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, বলছি তো আমি একাই যাব।

গম্ভীর মুখে কমলিকা বলল, সম্রাট! ক্ষমা করবেন। আপনার এই আদেশ আমি মানতে পারছি না। বাস্তবে আপনি সম্রাট হলেও বর্তমানে আচার্য চরকের এক রোগী মাত্র। আচার্য আমাকে আপনার সেবিকা হিসাবে নিযুক্ত করে গেছেন। আমার ওপর তাঁর নির্দেশ রয়েছে। আমি তা অমান্য করতে পারি না।

সম্রাট জ্বলে উঠতে গিয়েও সংযত হয়ে গেলেন।—বেশ! আচার্য এলে আমি অভিযোগ করব।

নিশ্চয় করবেন সম্রাট। একটু পরেই তিনি এসে যাবেন।

পরিচারিকা দুজন সম্রাটকে ধরে ধরে স্নান-ঘর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

কমলিকা তাদের সম্রাটের পোষাক নিয়ে আসতে বলে, নির্দেশ দিল, সম্রাটের পোশাক পালটে দিও। অতঃপর কমলিকা সরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেটি খুলে রেখে কমলিকা বাতায়নে পা দিল। উদ্যানের মাঝে—বাতায়নের অনতিদূরে রক্ষীগৃহ। সেখানে ব্যস্ততা। নৈশ প্রহরীরা চলে যাচ্ছে। প্রভাতের প্রহরীরা এসে গেছে। সারারাত ধরে অতন্দ্র ভাবে তারা সম্রাটের কক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখে। কঠোর সে প্রহরা। বাইরের অলিন্দে জাগ্রত থাকে দশজন কঠোরদেহী রক্ষিণী। কমলিকা ভাবে, একজন মানুষের শান্তির ঘুমের জন্য কত মানুষকে জাগরণে কাটাতে হয়! অবশ্য এ স্বাভাবিক। তিনি ঐ বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি। কত চিন্তা তাঁর মাথায় রয়েছে অহর্নিশ। তাঁর নিরুপদ্রব নিদ্রার প্রয়োজন—নয়ত উন্মাদ হয়ে যাবেন। একটা নাম না জানা এক পাখি মিষ্টি সুরের আবেশ তুলে উড়ে গেল। হঠাৎ কমলিকার বুক যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। —এ কী তার দুর্মতি! সম্রাটের মুখের ওপর সে তর্ক করেছে! সে কি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল? একটি ভীতির ভাব চেপে বসল কমলিকার মনে। স্থির করল, প্রথম

সুযোগেই সে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সে নিশ্চয় তার অবস্থান ভুলে গিয়েছিল!

আচার্য চরক হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সম্রাটকে শয্যায় না দেখে জানলার দিকে তাকালেন। কমলিকাকে বাতায়নে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে মা? সম্রাট কোথায়?

কমলিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে চরকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।—সম্রাট স্নান-ঘরে। কিন্তু...!

চরক কমলিকার বিবর্ণ মুখ দেখে আবার বিস্ময় বোধ করলেন, কী হয়েছে মা? সম্রাট...!

আমি সম্রাটের সঙ্গে তর্ক করেছি। সম্রাট বোধহয় রুষ্ট হয়েছেন।

কেন? কী তর্ক?

সেই মুহূর্তে সম্রাট স্নান-ঘর ছেড়ে পোষাক বদল করে কক্ষে পা রাখলেন। দুজন পরিচারিকা সম্রাটের দুই বাহুমূল ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসছিল। চরককে দেখে সম্রাট গম্ভীর হয়ে বললেন, আচার্য! সেবিকার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে। সে সম্রাটকেও অস্বীকার করেছে।

আচার্য চরক যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি তীর্যকভাবে কমলিকাকে দেখলেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে মুখ নীচু করে রয়েছে। সম্রাটকে দেখলেন, তিনি গিয়ে শয্যায় উপবেশন করেছেন।

চরক বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, সম্রাট যদি বিষয়টি পরিষ্কার করেন...।

আমি একা শয্যা ত্যাগ করে স্নান-ঘরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেবিকাটি আমার সেই আদেশ গ্রাহ্য না করে পরিচারিকাদের আহ্বান করেছে। সেবিকা সম্রাটের ইচ্ছার মর্যাদা না দিয়ে আপনার নির্দেশ পালন করতেই বেশি উৎসাহী।

চরক বিষয়টি এবার বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।—বুঝেছি সম্রাট। সেবিকাটি যথার্থ কাজই করেছে। আপনার শয্যাত্যাগ আমি নিষেধ করে গিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে আমিই আপনার সম্রাট। আমার আদেশ আপনাকে মানতে হবে। আপনি এখন মোটেও সুস্থ নন। আপনার নাড়ি পরীক্ষা করব।

সম্রাট শুয়ে পড়ে কমলিকার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, বেশ। আপনি আপনার সেবিকাকে বলুন, যদি সম্ভব হয়, তবে সে যেন আজও রাত্রে আসে। আমি একজন কঠোর সেবিকাকেই চাই।

কমলিকার মুখে রক্তাভ হয়ে উঠল। তার হৃৎপিন্ডে যেন প্লাবন।

প্রভাতেই ছুটে এসেছে ভট্টরাই। তার নতুন দায়িত্বশীল কাজের আজ থেকেই সূচনা। মনে আরও এক উল্লাস। এই প্রাসাদেই—তার মাথার ওপর বসবাস করে কমলিকা! হোক না সে প্রাসাদ-রমণী। দূর থেকে দু-একবার দেখেও তো তৃপ্তি পেতে পারবে। কমলিকার সান্নিধ্যেই তো সে থাকবে। প্রাসাদে পা রেখেই সে কার্যালয়ে বসে থাকা মহামিশ্রকে প্রশ্ন করল, সম্রাট কেমন আছেন?

মহামিশ্র তাকে বসতে বলে বললেন, আচার্য এসেছিলেন। এমনই ঠিক আছেন—কিন্তু বিপদমুক্ত নন। বেশ কয়েকটা দিন তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হবে। আচার্যের এই বিধান! তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, এবার তোমার দায়িত্ব বুঝে নাও। তোমার প্রাথমিক দায়িত্ব—এই প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এর সঙ্গে জড়িত থাকা প্রতিটি কর্মচারি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা। আমরা আশা করব জনাগই জাঙ্কের প্রথম ও শেষ লোক এই প্রাসাদে।

হ্যাঁ। জনাগ কোথায়? তাকে কি বাঁচানো গেছে?

সৌভাগ্যবশত তাকে উদ্ধার করা গেছে। আর কিছু দেরি হলে জাঙ্কের ঘাতক বাহিনী পৌঁছে যেত। রাজকীয় বাহিনীকে দেখে তারা পালায়। জনাগ আর বিনাগকে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে সেনানিবাসের বন্দীশালায় রাখা হয়েছে। যা হোক, আমি করণীকদের বলে দিয়েছি, তারা এই প্রাসাদের প্রতিটি অধিবাসীর তালিকা তোমার হাতে তুলে দেবে—এমন কি প্রাসাদ-রমণীদেরও।

কমলিকার নামটিও সেখানে আছে কিনা—তা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল ভট্টরাই।—বোকার মতো প্রশ্ন হোত। বরং জিজ্ঞাসা করা যায়, তার বিশেষ প্রাসাদ অধিকর্তা হিসাবে নির্বাচনের কথা কমলিকা জানে কিনা? এই প্রশ্নটিও অনুচিত বলে মনে হল ভট্টরাইয়ের। প্রাসাদ-রমণীদের সম্পর্কে তার কৌতূহল প্রকাশ না করাই ভাল। তারা এক বিশেষ জগতের বাসিন্দা। ভট্টরাই তাই শেষপর্যন্ত বলল, ভন্তে মহামিশ্র! প্রাসাদের প্রতিরক্ষার কাজে যেহেতু নিয়োজিত হলাম তাই প্রাসাদটিকে আমার বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। কোথায় কার অবস্থিতি—কিসের অবস্থিতি—এটা আমার দেখে নেওয়া উচিত।

নিশ্চয়। তবে সব কিছু দেখিয়ে দেবার আগে তুমি জেনে রাখ, প্রাসাদের রন্ধনশালা থেকে শুরু করে প্রতিটি অধিবাসীই বাস করে নীচের তলায়। এখানে অসংখ্য কক্ষ। এখানে পরিচারক-পরিচারিকা—রক্ষিণী থেকে শুরু করে আমি

পর্যন্ত এই একতলায় থাকি। তোমার জন্যও একটি ঘর রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে এখানেই বসবাস করতে পার।

ভট্টরাই বলল, থাকার বিষয়টি আমি এখনও চিন্তা করিনি। তবে রাত হয়ে গেলে বা রাতে থেকে যেতে হলে ঘরটি নিশ্চয় ব্যবহার করতে পারব।

স্বচ্ছন্দে। ওটি তোমার ঘর। আমার ঘরের পাশেই। কিন্তু দোতলাটি ভীষণ ভাবে সংরক্ষিত। সম্রাটের অন্দর-মহল বলে এখন আর কিছু না থাকলেও ওপর তলাটি অন্দর-মহল বলেই বিবেচিত হয়। ওপরে বাস করে বারোজন প্রাসাদ রমণী। দশ জন রক্ষিণী আর সম্রাট স্বয়ং। ওপরে বিশেষ কয়েকজন পুরুষ ছাড়া অন্য কারোর যাওয়ার অনুমতি নেই। কোনও যুক্তিসম্মত কারণ ছাড়া অন্য কেউই ঐ সোপানে পা রাখতে পারে না। এমন কি তুমিও পারবে না।

মনের মধ্যে একটা হতাশার ভাব গোপন করে ভট্টরাই বলল, এর অন্যথা হবে না।

মহামিশ্র বললেন, আরও একটি কথা জেনে রাখ, যদিও সচরাচর কোন প্রাসাদ-রমণী কোন প্রয়োজনে কার্যালয়ে আসে না, তবে প্রয়োজনে আসতেও পারে। কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে। কারণ, এঁরা সকলেই সম্মানিত। এঁদের মধ্যে থেকেই হয়ত কেউ ভবিষ্যতের সম্রাজ্ঞী হবেন।

ভট্টরাই বলল, আমি বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ত্রুটি-মুক্ত থাকার চেষ্টা করব।

এবার তাহলে ওঠা যাক। মহামিশ্র উঠে দাঁড়ালেন।

ভট্টরাই বিশাল প্রাসাদের এক তলার প্রতিটি ঘর, রন্ধনশালা, অস্ত্রাগার সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত দোতলায় ওঠবার সোপানের কাছে এসে দাঁড়াল। শ্বেত মর্মরের সেই সোপান। মহামিশ্রের পেছন পেছন সে ওপরে উঠতে থাকল। মনের মধ্যে কেমন যেন এক খুশির ভাব। হয়ত কমলিকার মুখোমুখি হয়ে যাবে। তার এই পদোন্নতিতে বিস্ময় প্রকাশ করবে সে। বলবে, কই! মহামিশ্র তো আমায় জানান নি! অথবা বলবে, শুনেছি। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম!

দোতলায় পা রেখে বিস্ময়ের সঙ্গে ভট্টরাই দেখল, প্রশস্ত—দীর্ঘ এক অলিন্দপথ। মাঝ বরাবর সুদৃশ্য পাথর মোড়া থামের সারি! অলিন্দের দু'পাশে সার সার কক্ষ। সব কয়টির কপাট বন্ধ।

মহামিশ্র বললেন, এই ঘরগুলিতে থাকেন প্রাসাদ-রমণীরা। কয়েকটিতে রক্ষিণী এবং পরিচারিকারা। অধিকাংশ কক্ষই খালি।

ভট্টরাইয়ের হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল।—এরই কোনও এক কক্ষে থাকে কমলিকা! কয়েকজন প্রাসাদ-রমণী তাদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে অন্য কক্ষে গেল। যাবার সময় ভট্টরাইকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখেও গেল। রোমাঞ্চিত হল ভট্টরাই। ভাবল, এই বুঝি সে কমলিকাকে দেখতে পাবে। কিন্তু না। কমলিকা এল না। তার জানার কথাও নয় যে রাত্রি জাগরণের পর কমলিকা স্নান সেরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আজ রাত্রেও তাকে সেবিকার কার্যে যোগদান করতে হবে। ভট্টরাই মহামিশ্রকেও প্রশ্ন করতে পারল না—কারণ, শর্ত হিসাবে এই বিষয়ে তার কৌতূহল প্রকাশ করাও উচিত নয়!

দীর্ঘ অলিন্দ পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ভট্টরাই। দেখল, জনা ছয়েক রক্ষিণী একটি কপাট-বন্ধ কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে। তারা ভট্টরাইকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল।

মহামিশ্র তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠলেন, একে চিনে রাখ। নিচে আমার কার্যালয়ে বসবেন আমার সহকারী হয়ে। এই প্রাসাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এর ওপর।

রক্ষিণীরা অভিবাদন জানাল।

মহামিশ্র সাবধানে কক্ষের কপাট ঠেললেন। প্রশস্ত এক কক্ষ। সুসজ্জিত। মধ্যবর্তী অংশে সম্রাটের বিশাল পালঙ্ক। সম্রাট শুয়ে আছেন। বোধহয় নিদ্রিত। দুটি প্রাসাদ-রমণী দূরবর্তী দুটি আসনে বসে আছে।

মহামিশ্র কক্ষে প্রবেশ না করে ইংগিতে প্রাসাদ-রমণী দুজনকে কাছে ডাকলেন। তারা এগিয়ে এল।

মহামিশ্র প্রশ্ন করলেন, সম্রাট কি জেগে আছেন?

না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ও!

ইনি?

আমার সহকারী। এই প্রাসাদের প্রতিরক্ষার বিষয়ে বিশেষ অধিকর্তা। আমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের প্রয়োজনের কথা একেও জানাতে পার। এ আমার কার্যালয়েই বসবে।

ভট্টরাই প্রাসাদ-রমণীদের থেকে মনোযোগ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।—বাতায়নের ঐ দ্বারটি কি রাত্রে খোলা থাকে?

না। বন্ধ থাকে ইদানিং।

ভাল। বাতায়নের নীচেই তো উদ্যান?

হ্যাঁ।

বেশ চলুন। উদ্যানটিও আমি একবার দেখতে চাই।

মহামিশ্র আর ভট্টরাই এগিয়ে গেলেন।

ভট্টরাই উদ্যানটি দেখে নিল। প্রাসাদের প্রবেশ পথ পশ্চিমে। উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্বে উদ্যান প্রাসাদটিকে ঘিরে রেখেছে। সম্রাটের কক্ষের নিচে একটি রক্ষী ঘর। রাত্রে প্রায় পনেরজন রক্ষী এইখানে সম্রাটের কক্ষের দিকে তাকিয়ে প্রহরা দেয়। পশ্চিম দুয়ারে থাকে জনা কুড়ি সেনা। পশ্চিমের প্রবেশ পথের অদূরেই সম্রাটের দেহরক্ষীদের আবাসস্থল। প্রায় একশত দেহরক্ষী সেখানে থাকে। প্রাসাদ থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সেনানিবাস।

ভট্টরাই কার্যালয়ে ফিরে এল। মহামিশ্র রাজসভার দিকে এগোলেন। সম্রাটের অসুস্থতার কথা সেখানে ঘোষণা করতে হবে।

একজন পরিচারিকা ভট্টরাইকে জলপান দিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত বোধ করায় সে সঙ্গে সঙ্গে তা গলাধঃকরণ করা শুরু করে দিল। আহার করতে করতেই ভট্টরাই প্রাসাদ-রমণীদের তালিকাটিতে চোখ বোলাতে শুরু করল। দুটি নামে তার দৃষ্টি আটকে গেল। এক, মন্ত্রী ইউনাসের কন্যা জানুকা ও দুই, দুবলের কন্যা বল্লভী। দুইজনেই কুই-সাং গোষ্ঠীর অর্থাৎ জাল্কের গোষ্ঠী।

পরিচারিকাটি খালি পাত্রগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এল। ভট্টরাই তাকে প্রশ্ন করল, তুমি কি এখানেই থাক—না ঘর থেকে যাতায়াত কর?

পরিচারিকাটি বলল, না। আমি এখানেই থাকি। ঘর থেকে ঠিক সময়ে যাতায়াত করার অসুবিধা হয়। তবে আমাদের পদ্ম, রোমা, সুতপা এরা যাতায়াত করে। ওদের ঘরবাড়ি কাছে।

বেশ। ওদের তিনজনকে আমার কাছে একটু পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই তিনজন পরিচারিকা এসে উপস্থিত হল।—আমাদের ডেকেছেন?

হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমরা প্রাসাদে বাস কর না কেন?

অসুবিধে আছে। ঘরে ছেলে-মেয়েরা আছে। অবিবাহিত। তাদেরও দেখাশোনা করতে হয়।

সবাই ছোট—না বয়স্কও আছে?

পদ্মা বলল, আমার ছেলেটা পূর্ত বিভাগে কাজ-কর্ম করে।

ও! আচ্ছা, জাষ্ককে তোমরা চেন?

চিনি। বড় ভয়ংকর লোক। ওর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখিনা।

তাহলে ভয়ংকর বলে জানলে কেমন করে?

আমার ছেলে নগর-কার্যালয়ে একটি বড় ঘর নির্মাণে নিযুক্ত। সমাজ-উৎসবের আগেই ওই ঘর নির্মাণ শেষ করতে হবে। সমাজ-উৎসবের রাতে ওখানে নাকি এক মহোৎসব হবে। ঐদিনই নাকি জাষ্ক অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। দু-হাতে সে তখন ধন বিলোবে। পুরুষপুর তার পায়ে লুটোবে।

ভট্টরাইয়ের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলেও সে তা গোপন করে গিয়ে বলল, জাষ্ক পাগল হয়ে গেছে নাকি? সম্রাটের আদেশে সে সমাজ-উৎসবের পরের দিনই পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কারণ, সম্রাটের কাছে প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে পারবে না। যাহোক। সে যে ভয়ংকর তা তুমি জানলে কেমন করে?

ছেলে বলছিল, যাদের সে ধরে আনে—তাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করে। একটি বন্দী নাকি সেদিন চেঁচিয়ে বলছিল, আপনার সমাজ-উৎসবের রাতের কথা সবাইকে জানিয়ে দোব। আপনি কী করতে চাইছেন তা সবাইকে বলে দোব।

মনের ভাব গোপন করে ভট্টরাই জানতে চাইল, তারপর?

ছেলে বলে, সে রাত্রে বন্দীটি কারাগারের ভেতরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। প্রহরীরা বলছিল, সে নাকি অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। তাই...।

অন্য এক প্রহরী তর্ক করছিল চাপা স্বরে। জাষ্ক নাকি দাঁড়িয়ে থেকে তাদের দুজনকে ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে!

ভট্টরাই মৃত্যুর ঘটনাটিকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, আসলে জাষ্ক সমাজ-উৎসবের রাতে কীসের মহোৎসব করতে চেয়েছে—জান কিছু?

পদ্ম বলল, জানিনা। কিন্তু সেদিন সব প্রহরীকে কার্যালয়ে উপস্থিত হতে বলেছে। জাষ্ক বলেছে, সমাজ-উৎসবের রাতে নগরে কোনও প্রহরী থাকবে না। সবাই কার্যালয় এসে মহোৎসবে যোগ দেবে। বিশাল খাওয়া দাওয়ারও নাকি ব্যবস্থা হবে। ঐ রাতেই নাকি বলি দেওয়া হবে একটি বড় ষন্ডকে! নগরের সব প্রহরীর নিমন্ত্রণ থাকবে।

বলি!

হ্যাঁ, বলি!

মহামিশ্র রাজসভা থেকে ফিরে এলেন। ভট্টরাই পরিচারিকাদের বলল, তোমরা যাও। পরে কথা বলব।

মহামিশ্র চিন্তিতভাবে আসনে দেহ এলিয়ে দিলেন। তারপর ভট্টরাইকে প্রশ্ন করলেন, পরিচারিকাদের সঙ্গে কী কথা বলছিলে?

ভট্টরাই এক এক করে সব খুলে বলল।

মহামিশ্র বললেন, কিছু মনে হচ্ছে না তোমার?

হচ্ছে। জাষ্ক সমাজ-উৎসবের রাতে কিছু একটা করতে চলেছে। কিন্তু কী সেটা? সেদিন সম্রাটের সামনেও তো সে সমাজ-উৎসবের দিনের কথা বলে গেছে।

মহামিশ্র বললেন, আশ্চর্যের কথা, বিনাগকে প্রশ্ন করা হলে সে বলেছে সমাজ-উৎসব নাকি জাষ্কের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য দিন হবে—একথা প্রহরীরা বিস্মিত ভাবে বলে বেড়াচ্ছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু তারা জানে না কেন?

মহামিশ্র আরও কিছু বলতে গেলেন—কিন্তু এক গূঢ়পুরুষের আগমনে থেমে গেলেন।—বল, সুনাতা, কী সংবাদ?

গূঢ়পুরুষটি ইতঃস্তত করল!

বল।

আজ্ঞে, গোপনীয়।

বেশ! বেশ। তারপর ভট্টরাইকে দেখিয়ে বললেন, এ আমার সহকারী। প্রাসাদ প্রতিরক্ষক। বল।

আজ্ঞে—আমি নিম্নসিন্ধুর বন্দর এলাকা থেকে ফিরছি। ভন্তে নীলাকারের সঙ্গেও এখনও সাক্ষাৎ হয়নি। ভাবলাম, আপনার কানে অর্থাৎ সম্রাটের কানে সংবাদটি তুলে দিয়ে যাই।

কী সংবাদ?

সিন্ধুর মোহনা অঞ্চলে পহ্লব-ক্ষত্রপ বিদ্রোহের আয়োজন করছে। এখুনি তা দমন করা না গেলে বিপদ! তারা পুরুষপুরে পৌঁছে যাবে সমাজ উৎসবের দিন!

চিন্তিত মহামিশ্র বললেন, ঠিক আছে। তুমি নীলাকার আর গুণবর্ধনের কাছে যাও। তাদের এখানে পাঠিয়ে দেবে। আলোচনা আছে।

গূঢ়পুরুষটি চলে যেতেই মহামিশ্র ভট্টরাইকে বললেন, বুঝতে পারছ, সম্রাট কী ভীষণ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন? জাষ্ক সম্ভবত এই বিষয়টি নিয়েই

উল্লসিত। পহ্লব-ক্ষত্রপ পুরুষপুর আক্রমণে আসছে। কিন্তু সম্রাটের যে শারীরিক অবস্থা—তাতে তাঁকে এসব কথা বলব কেমন করে? মথুরায় সংবাদ পাঠালেও সেখান থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতে বাসিষ্কের বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। অন্যদিকে সে নিজেও অসুস্থ। তার আঘাত প্রকৃতপক্ষে এখনও নিরাময় হয়নি। সম্রাটকে নিশ্চিন্ত করতে গূঢ়পুরুষটিকে পাঠিয়েছিল বাসিষ্ক।

ভট্টরাই বলল, এ বিষয়ে আমি আর কী বলতে পারি? এ আমার অধিকারভুক্ত এলাকা নয়। সম্রাট পূর্বের তুলনায় কিছুটা সুস্থ বলে শুনেছি। কিন্তু আচার্য চান না, তিনি কোনভাবে উৎকণ্ঠিত হন। পুনরাবৃত্তি ঘটার এখনও যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। তিনি চান সম্রাট আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিন। এখন আপনারা অর্থাৎ প্রশাসনের উর্ধ্বতম পুরুষেরাই ঠিক করুন কী করা উচিত আর কী নয়।

মহামিশ্র বললেন, ঠিকই বলেছ। গুণবর্ধন আর নীলাকার আসুক। তাদের সঙ্গে আগে কথাবার্তা সেরে নিই। এরপর মন্ত্রী পরিষদের সভা আহ্বান করতে হবে। মন্ত্রী পরিষদ যা সিদ্ধান্ত নেবে—সম্রাটের অনুপস্থিতিতে আমাদেরও তাই স্বীকার করতে হবে! মহামিশ্র উঠে পড়লেন—ভট্টরাই! আবার আমি সভাগৃহে যাচ্ছি। গুণবর্ধন আর নীলাকার এখনই হয়ত এসে পড়বে।

ভট্টরাই বলল, চিন্তা করবেন না। আমি আছি। অপেক্ষা করতে বলব।

আরও বেশ কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। সম্রাট এখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু আচার্য চরক তাঁকে আরও কিছুদিনের জন্য শয্যাশায়ী করে রেখেছেন। তাঁর বক্তব্য—এ হৃৎপিন্ডের অসুখ। সামান্য অনিয়মে সম্রাট আবার ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। অগত্যা...।

পরপর কয়েকদিন অনভ্যস্ত রাত্রিজাগরণে কমলিকা একটু ক্লান্ত। সম্রাট তাঁর ক্লান্তি লক্ষ করে মুখে বললেন, তুমি কয়েকদিন বিশ্রাম নাও। কিন্তু কমলিকা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারল এটি এ সম্রাটের মুখের কথা—মনের নয়। কারণ, কমলিকার পরিবর্তে যে সব প্রাসাদ-রমণীরা রাত্রিকালীন সেবায় আসে—তাদের বিরুদ্ধে সম্রাট সরাসরি কিছু অভিযোগ না করলেও, মহামিশ্রকে প্রশ্ন করেন, মণিকার পুত্রী সুস্থ তো?

মহামিশ্রের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সম্রাট কমলিকাকেই কামনা করছেন। কমলিকার প্রতি তাঁর এই আকর্ষণে খুশি হন মহামিশ্র। ভাবেন, কমলিকা শেষ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞী হলে, তাঁরই লাভ। তাই তিনি বলেন, সে সুস্থই আছে। আজ রাত্রে সেই আসবে আপনার পরিচর্যায়।

অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে কমলিকার দেহমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে কয়েকদিন। যে সম্রাট ফিরেও তাকাতেন না—সেই সম্রাট আজ কত কাছের মানুষ! ঔষধী খেয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার আগে কত কথাই বলেন—কত যুদ্ধের, কত পাহাড়-পর্বত-হিমচূড়ার কথা। সম্রাট স্বীকার করেন, বুদ্ধের পায়ে নিজেকে নিবেদন করার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ। সর্বদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে থাকতে ভালবাসতেন। এখন তিনি শান্ত—নির্বিকার। তবু কখনও কখনও তৃণভূমির সেই আদিম আহ্বান শুনতে পান। তিনি বলেন, আমি কোন দিনই সম্রাট অশোক হতে পারব না। আমার রক্তে সেই ভারতীয় শীতলতা, ধৈর্য নেই। তবু আমি চেষ্টা করব সেই মহান সম্রাটকে অনুসরণ করতে—তাঁর আরাধ্য কাজ শেষ করতে!

সম্রাট বলেন, কমলিকা! তোমার আঙ্গুলের ছোঁয়ায় আমার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা কণিষ্ক জেগে উঠেছে। তোমার সেবা না পেলেও হয়ত আমি সুস্থ হয়ে উঠতাম। কিন্তু তা হোত শারীরিক—মানসিক ভাবে নয়। আমি বুদ্ধের পায়ে নিবেদিত ছিলাম—এখনও নিবেদিতই আছি। তবু আমার মনের মধ্যে যেন এক অভাব বোধ করতাম। জানতাম না তার সরূপ। এরপর তোমাকে মহাবিহারে প্রথম দেখলাম। আমার মধ্যে অতি ধীর এক পরিবর্তন আসতে থাকল। আমি অসুস্থ না হয়ে পড়লে বোধহয় কিছুই বুঝতাম না। নিজের কাছেও এত অকপট হতে পারতাম না।

কমলিকা বলত, সম্রাট! আপনার অনুগ্রহে আমি ধন্য! আপনি আর কথা বলবেন না। আমি জাতক কাহিনি পাঠ করছি—আপনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ুন। নচেৎ আচার্য রাগ করবেন।

সম্রাট বলেন, আমাকে বলতে দাও কমলিকা। এতদিন পরদার আড়ালে বসে তোমাদের জাতক-কাহিনি পাঠ শুনতাম। আমি তোমাদের দেখতামও না। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে প্রভাবিত করত। যেদিন তুমি পাঠ করতে আসতে সেইদিন তোমাকে সামনে বসিয়ে পাঠ শোনার ইচ্ছে হোত। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারিনি। আমার অসুখ আমায় সুযোগ করে দিল। অনেক প্রাসাদ-রমণীই আছে। কিন্তু তুমি ছাড়া আমি কোথাও প্রাণের ছোঁয়াচ পাই না।

সম্রাট এবার ঘুমের চেষ্টা করুন। আমি তো আছি। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। কমলিকা কত সহজ হয়ে উঠেছে সম্রাটের কাছে!

কমলিকা শুনেছে ভট্টরাইয়ের কথা। তাদের মধ্যে অনেকেরই সুদর্শন ঐ যুবক সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছে। সম্রাটের স্বপ্ন তাদের কাছে মলিন হয়ে উঠছে। সম্রাটের স্থান অধিকার করছে ভট্টরাই। বিশেষ করে ইউনাস কন্যা জানুকা যেন একটু বেশি মাত্রায় উৎসাহিত হয়েছে ভট্টরাইকে নিয়ে। সে ইতিমধ্যে ভট্টরাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাও শুরু করে দিয়েছে। সে বলে, সমাজ-উৎসবের পরপরই সে অধিকার করবে ভট্টরাইকে। কোন শক্তিই তার কাছ থেকে ভট্টরাইকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কমলিকা আশ্বস্ত হয়, ভট্টরাই যে তার বিশেষ পরিচিত একথা প্রকাশ হয়নি। ভট্টরাইয়ের যে স্বভাব, তাতে সে নিজেও এসব কথা বলবে না কখনও। তার সঙ্গে সে দেখা করার চেষ্টাও করেনি। এ বরং ভাল হল, জানুকার দৃষ্টি পড়েছে ভট্টরাইয়ের ওপর। জানুকার বাবা এক প্রভাবশালী মন্ত্রী। হয়ত জানুকা সমাজ-উৎসবের পরপরই ভট্টরাইকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে। ভট্টরাইয়ের অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। বরং ভালই হবে—সে আরও উন্নতির পথে হাঁটবে। কমলিকা কল্পনার চোখে দেখতে পায় ভট্টরাই জানুকাকে আদর করছে। জানুকা ভট্টরাইয়ের বুকে মাথা রেখেছে। কিন্তু তখনই অদ্ভুত এক জ্বালা কমলিকার মনকে গ্রাস করতে চায়।— না—না। সতর্ক হয় কমলিকা। সম্রাটের দিকে তাকায় সে। সম্রাট ঘুমিয়ে পড়েছেন। কমলিকার ইচ্ছে হয় সম্রাটের বুকে মাথা রাখে। পরক্ষণেই সে নিজেকে শাসন করে।—না-না। অসুস্থ সম্রাটকে উত্তেজিত করাটা অন্যায় হবে। তারচেয়ে বরং সে সম্রাটের বুকে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিক। কমলিকা সম্রাটের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করল। সোনা ছেড়ে রূপো কেন সে নিতে যাবে? জানুকা পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে—সুতরাং তার তো একটা অবলম্বন চাই। হোক না ভট্টরাই সেই অবলম্বন। ক্ষতি কী?

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। প্রাসাদ আবাসিকদের নাম-ধাম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে ভট্টরাইয়ের। দেহরক্ষীদের সঙ্গে পরিচয়ও সমাপ্ত। রাজউদ্যানে গেলে কখনও সখনও বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাসাদ-রমণীদের সঙ্গে তার চোখাচোখিও হয়ে যায়। কিন্তু কোথায় কমলিকা? কোনটি তার ঘর? মহামিশ্র কি জানাননি কমলিকাকে? হতাশ হয় ভট্টরাই।

অন্যদিকে কয়েকজন প্রাসাদ-রমণী নানান প্রয়োজনে ভট্টরাইয়ের কার্যালয়ে আসে। তার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করে। সতর্ক থাকে ভট্টরাই। তাকে নিয়ে প্রাসাদ-রমণীদের মধ্যে আলোচনা হয়—এ সে বুঝতে পারে। সবচেয়ে আগ্রাসী বলে মনে হয় জানুকাকে। এই রমণীটি যেন একটু বেশি সাহসী।

সম্রাটের অসুস্থতার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিদিনই শয়ে শয়ে মানুষ আসে সম্রাটের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। ফলে মহামিশ্রের পরামর্শে একজন করণীককে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বসানো হয়েছে।—প্রজাদের সম্রাটের শারীরিক অবস্থা জানাবার জন্য।

সে দিন বেলার দিকে ভট্টরাইয়ের হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। তাই কার্যালয়ে ছেড়ে প্রাঙ্গণে চলে এসে একটি কোণায় চারজন গুপ্তচরের সঙ্গে নানান কথাবার্তা বলছিল। শয়ে শয়ে জনতা করণিকটিকে একই প্রশ্ন করে বিরক্ত করছিল। শেষ পর্যন্ত করণিকটি বুদ্ধি করে একটি লেখা তোরণদ্বারে ঝুলিয়ে দিল, সম্রাট ভাল আছেন।

ভট্টরাইয়ের চঞ্চল চোখ চারদিকে কথাবার্তার মাঝেও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ দুজন ভিনদেশীয় শ্রমণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শ্রমণবেশী হলেও তাদের দৈহিক ভাবভঙ্গির ভেতর কোথায় যেন অসংগতি ছিল। তাদের দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শ্রমণরা কেউ আসে না। অপরাহ্নে অশ্বঘোষ, বসুমিত্র আর সংঘরক্ষিত এসে সম্রাটকে একবার দেখে যান। সামান্য দু-একটি কথাও বলেন। পরে—চৈত্যে সমবেত বুদ্ধজনের কাছে তাঁরাই সম্রাটের শারীরিক অবস্থার কথা প্রচার করেন। ভট্টরাই চারজন গুপ্তচরকে শ্রমণ দুটির দিকে লক্ষ করতে বলে বলল, এদের সন্দেহজনক হাবভাব। তোমরা দু'জনে দুটি দল করে এগিয়ে গিয়ে কোথাও অপেক্ষা কর। পরে এই দু'জনকে অনুসরণ করে রাত্রে আমাকে এদের গতিবিধির সম্পর্কে জানাবে। এদের এখানে আসার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য রয়েছে বলে আমার অনুমান। সামনেই সমাজ-উৎসব। আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। জাষ্ক যে কী খেলা খেলতে চলেছে—তা কে জানে! সে তো সম্রাটকে কথা দিয়েছে—সমাজ-উৎসবের দিন সে সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। নিজের প্রহরীদের কাছেও সে নানান অসংলগ্ন কথা বলেছে। ঐ দিন নগরের প্রহরীদের প্রহরা ছেড়ে তার মহোৎসবে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে। সেখানে নাকি মাংসের জন্য একটি ষন্ডকে বলিদান করা হবে!

একজন গূঢ়পুরুষ বলল, জাষ্ক উন্মাদ হয়ে গেছে।

ভট্টরাই বলল, বেশ। তোমরা এস।

সেদিন রাতে সম্রাটের সেবা করতে যাবার আগে কমলিকা সাজল। অনেকদিন পরে তার এই দেহসজ্জা। কণ্ঠে দোলাল সেই হীরক খচিত হার। অঙ্গে নানান গহনা। দর্পণে তার সেই রূপ প্রতিফলিত হতে সারা ঘর যেন আনন্দে হেসে উঠল। তার হাতে একগুচ্ছ সুগন্ধী রক্তগোলাপের গুচ্ছ। রক্ষিণী আর পরিচারিকাদের অবাক করে সে সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করল। সম্রাটও অবাক বিস্ময়ে তাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর সামনে এসে বসতে বললেন। তাঁর অসুস্থ হৃদয়েও যেন প্লাবন জাগল।

সলজ্জ পায়ে কমলিকা এগিয়ে গিয়ে সম্রাটের হাতে গোলাপের গুচ্ছটি দিয়ে বলল, আপনার জীবনও এমন সুগন্ধীত হয়ে উঠুক।

সম্রাট সাগ্রহে গোলাপের গুচ্ছটি হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নিলেন।—চমৎকার! তবে আজ হঠাৎ তোমার এই সজ্জা—গোলাপ গুচ্ছ উপহার?

সপ্রতিভ ভাবে কমলিকা বলল, রক্তগোলাপ হৃদয়ের প্রতীক। আজ তাই আপনাকে উপহার দিলাম।

সম্রাট যেন একটু উদাস হয়ে গেলেন। তারপর এক সময় বিষণ্ণস্বরে বললেন, তুমি কি জানো, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেন আমি সংসার বিমুখ?

সম্রাট নিশ্চয় সম্রাজ্ঞীকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন।

সম্রাট কমলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।—এই কথাটাই তো সকলে বিশ্বাস করে। কিন্তু না। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসল সত্যটা কেবল জানে মহামিশ্র। তারই অনুরোধে প্রাসাদ-রমণীদের আগমন। আমাকে যৌবনের ধর্ম পালন করানোর আপ্রাণ প্রয়াস!

হতবাক কণ্ঠে কমলিকা বলল, তাহলে সবই কি নাটক? আসল সত্যটা কী, সম্রাট?

সম্রাট বললেন, আমি নারীজাতিকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম। তাই বুদ্ধের পায়ে নিজেকে এই সমর্পণ।

বিবর্ণ কমলিকা বলল, সেই ঘৃণা কি এখনও আপনি বহন করে চলেছেন?

না। ঠিক তা নয়। প্রাসাদ-রমণীরা সেই ঘৃণার অনেকাংশ দূর করে দিচ্ছিল।

আমি সহজ হয়ে উঠছিলাম একটু একটু করে। তারপর তোমাকে একদিন দেখলাম। আমি শিহরিত হলাম। আমার মনের বাঁধন খুলে গেল। আজ তোমার গোলাপ-গুচ্ছের উপহার বাঁধনের শেষ অবশিষ্টটুকুও উড়িয়ে দিল! আমি তোমাকে চাই। নতুন করে জীবনকে ভোগ করতে চাই। গৃহী শিষ্য হতে বুদ্ধ কোনও বাধা দেননি। তুমি আমার হবে, কমলিকা?

সলজ্জভাবে কমলিকা বলল, আমায় লজ্জা দেবেন না, সম্রাট। ঐ গোলাপ-গুচ্ছই তো আমার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করছে। কিন্তু আমি সত্য জানতে চাই। কেন আপনি নারী বিমুখ হয়েছিলেন? সম্রাজ্ঞীকে কি আপনি তাহলে ভালবাসতেন না? সবাইকে ছলনা করে এসেছিলেন? তারা এতদিন মিথ্যার স্বর্গেই বাস করছিল?

সম্রাট বললেন, কমলিকা! আমি সব বলব। তারপর তুমিই বিচার করবে আমি তাকে ভালবাসতাম কি না। তার আগে তোমার এই গোলাপ-গুচ্ছের বিনিময়ে আমিও তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই। আমি তোমাকে নিম্নসিন্ধুর বন্দরগুলির আয়ের এক চতুর্থাংশ দিতে পারি—দিতে পারি তক্ষশিলার বাৎসরিক রাজস্ব—বা আমার সাম্রাজ্যের কোন ভূখন্ড। বল, তুমি কোনটা নিয়ে আমাকে ধন্য করবে? সম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিগত ব্যায়ের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়।

কমলিকা বলল, সম্রাট! ক্ষমা করবেন। অর্থে আমার লোভ নেই। ক্ষমতাও আমি চাই না। প্রথম দর্শনেই আমি আমার দেহমন-প্রাণ আপনাকে সঁপে দিয়েছি। আপনি আমার কল্পনার বীরপুরুষ। আমি শুধু আপনাকেই চাই। আর কিছু চাই না। আপনি সম্রাট না হলেও আপনাকে আমি কামনা করতাম!

সম্রাট কণিষ্ক কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন কমলিকাকে। তারপর ধীর স্বরে বললেন, তোমায় যতই দেখছি—ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আমি তোমায় পেতে চাই কমলিকা। বল, তুমি প্রস্তুত কি না?

কমলিকা বলল, তা কী করে সম্ভব, সম্রাট? আমি আপনার উপপত্নী হতে প্রস্তুত নই। আমি আপনাকে চাই—সম্পূর্ণভাবে, নিজের করে।

সম্রাট কণিষ্ক বললেন, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ, কমলিকা?

কেন? আমি গর্হিত কিছু কি দাবি করলাম?

না। তোমাকে আমি উপপত্নী করব এ চিন্তা তোমার মাথায় কেমন করে এল? তুমি আমার বৈধ স্ত্রী—তথা এই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবে। তোমাকে পাশে

পেলে আমি ধন্য হব। তোমার মত নির্লোভ এক প্রেমিকার সঙ্গে আমার যদি আগে সাক্ষাৎ হোত—তবে আমি স্ত্রী জাতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে বসতাম না! তোমাদের প্রাসাদ-রমণীদের মধ্যে আমি অনেককেই প্রশ্ন করেছিলাম—তারা কি চায়? উত্তরে সকলেই আমার রাজ্যদান, বন্দর শুল্ক দান, ইত্যাদি প্রস্তাব সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম, একমাত্র তুমি। তুমি শুধু আমাকে চেয়েছ। সম্রাট কণিষ্ককে পর্যন্ত নয়। সত্যি! তোমার সঙ্গে আমার আগে কেন দেখা হল না!

বুদ্ধের ইচ্ছা, সম্রাট! কিন্তু, এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন। বলুন, কেন আপনি সম্রাজ্ঞীকে ভালবাসতেন না? কেন আপনি স্ত্রী-জাতির প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন?

সম্রাট শয্যায় উঠে বসেছিলেন, গম্ভীরভাবে বললেন, অতি সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলছি, স্ত্রীকে আমি ভালই বাসতাম। কিন্তু, আমার সম্রাট হওয়ার পর থেকে ক্রমে তার মধ্যে এক পরিবর্তন এল। সে অর্থলোভী, ক্ষমতা লোভী —এমন কি সাম্রাজ্যলোভী হয়ে উঠল। সে চাইল আমাকে হত্যা করে সাম্রাজ্য অধিকার করতে। মহামিশ্রের মতো সেবক আমি আর পাব না। তার সতর্ক দৃষ্টিতে সেই ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচিত হল। সম্রাজ্ঞী অপরাধ স্বীকার করলেন। না। আমি প্রতিশোধ নিইনি। জনসাধারণের সামনে দাঁড় করিয়ে সম্রাজ্ঞীর অবমাননা আমি করতে চাইনি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেল সে। আমার কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করতে পারিনি। অথচ, মহামিশ্র ছাড়া একথা আর কেউ জানে না। এমনকি আচার্য চরকও। তাঁর হাতেই সম্রাজ্ঞী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

কিন্তু অন্য ষড়যন্ত্রীরা?

তাদের আমি বিচার করিনি—পাছে সমস্ত বিষয়টি জনসমক্ষে এসে যায়।

তবে তাদের কি ক্ষমা করেছিলেন?

না। গুপ্তঘাতকেরা একে একে তাদের হত্যা করেছিল। তাই সাম্রাজ্যের সবাই জানে, সম্রাট কণিষ্ক পত্নীপ্রাণ। পত্নীর মৃত্যুর শোক ভুলতে তিনি বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। সংসার বিরাগী হয়েছেন।

কমলিকা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, সম্রাট! আমি বুঝতে পারছি, মানসিকভাবে আপনি কী ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন! আমি বুঝতে পারছি, জগৎ

শুদ্ধু সকলে জানে, আপনি পত্নীপ্রেমী ছিলেন। সেই রুদ্ধ যন্ত্রণাই আজ আপনার হৃৎপিন্ডের ব্যধি ডেকে এনেছে। সম্রাট! এবার আপনি ঘুমের ঔষুধীটি খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আমি তো আছি আপনার পাশে। আমি আপনার সব দুঃখ মুছে দোব।

সম্রাট ক্লিষ্টভাবে হাসলেন।—দাও। ঔষধী দাও!

এই সংবাদ রাজপ্রাসাদ পার করে সারা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল—সম্রাট আবার সংসার জীবনে প্রবেশ করছেন। অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, সংঘরক্ষিত বলেছেন, এ খুব আনন্দের কথা। সম্রাট বলেছেন জনসাধারণের পিতা রয়েছে। মাতারও প্রয়োজন।

সম্রাটের আসন্ন বিবাহের কথায় সারা দেশে—নগরে এখন আন্দোচ্ছ্বাস। কিন্তু প্রাসাদ-রমণীকুলে তিক্ততার সৃষ্টি হল। ক্ষিপ্ত জানুকা কমলিকাকে বলল, তুই একটা ডাইনী! সম্রাটকে বশ করেছিস যাদুমন্ত্রে। আর এই প্রাসাদে থাকা অর্থহীন। আজই আমি বাড়ি ফিরে যাব। তবে সমাজ-উৎসবের সকালে নিশ্চয় ফিরে আসব। তোদের বাগদানের পর্বটা দেখব না! তোর সম্রাটের উপপত্নী হবারও যোগ্যতা নেই। আর তুই হবি কি না সম্রাজ্ঞী! আমি বেঁচে থাকতে?

বল্লভী ব্যঙ্গ করে বলল, আমায় ভুলিস না কমলিকা। উপপত্নীর স্বীকৃতিটা অন্তত দিস। কতদিন একসঙ্গে রইলাম! তোর শরীর খারাপের সময় আমি না হয় তোর জায়গাটা নোব, সম্রাট অনেক দিন উপোসী হয়ে আছেন! সুতরাং উপবাস আর তার সহ্য হবে না!

অশ্লীল কথাবার্তা শুনে কমলিকার মুখচোখ রক্তাভ হয়ে উঠছিল। তবু সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। বলল, আগে বিয়েটা তো হোক। সম্রাটের মতিগতি! তারপর না হয় তোর কথা ভাবা যাবে। সত্যিই তো! এতদিন একসঙ্গে রইলাম। মায়া পড়ে গেছে!

জানুকা উঠে দাঁড়াল।—আমি মহামিশ্রের কাছে চললাম। আজই আমি বাড়ি যাব। বাবাকে সব বলব।

বল্লভী বলল, আমিও যাব। দাঁড়া। আমিও বাবাকে বলব। কোথাকার কে এসে জুড়ে বসল...!

জানুকা আর বল্লভী দুরদাড় করে বেরিয়ে গেল। সত্যা চুপ করে বসেছিল। কমলিকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই যে কিছু বলছিস না আমাকে!

সত্যা বলল, ওরা পাগল হয়েছে বলে আমিও পাগল হব? তুই আমার কত উপকার করলি, তা কি জানিস?

উপকার করলাম! কীসের উপকার?

কেন? আমার মুক্তির। জানিস তো আমার এক পাগল প্রেমিক রয়েছে। তাড়াতড়ি বিয়েটা সেরে নে। তাহলে আমিও মুক্ত হয়ে যাব।

কমলিকা বলল, সম্রাট এখন অসুস্থ। আচার্য চরকও ছাড়পত্র দেননি। তবে বাগদান পর্বটা সমাজ-উৎসবের মধ্যে মিটে গেলেই ভাল। রাজা রাজড়ার বিয়ে! সময় লাগবেই।

সত্যা কমলিকাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কমলি! তোর তো একজন পুরুষ জুটে গেল। তাড়াতাড়ি কর। নইলে, গিয়ে দেখব আমার পুরুষটা বিরহ যন্ত্রণায় শুক্ল হয়ে গেছে!

কমলিকা হেসে ফেলল—পারিসও বটে তুই!

ভট্টরাই নিজের কার্যালয়ে চুপচাপ বসেছিল। বাগদানের কথাটা তার কানেও এসেছিল। মনকে সে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিল, এটাই ঠিক হয়েছে। সম্রাজ্ঞীর পদই কমলিকার উপযুক্ত পদ। হঠাৎ জানুকা আর বল্লভীর আগমনে ভট্টরাইয়ের চিন্তা ব্যহত হল। সে সতর্ক হয়ে উঠল।—আজ্ঞে! বলুন কী করতে হবে?

ভট্টরাইয়ের সন্ত্রস্ত ভাব দেখে জানুকা আর বল্লভী হেসে উঠল।—কী হল? অমন করছেন কেন? ভয়? তা আমাদের নয়। এ প্রাসাদে এক ডাইনী রয়েছে। ভয় তো তাকেই পাবার কথা। শুনেছেন তো, সম্রাটকে সে বশ করেছে!

আজ্ঞে শুনেছি। তবে, আমি সামান্য লোক। আমার ওসবে কান দিয়ে কী লাভ?

জানুকা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি ওকে দেখে নোব—সমাজ-উৎসবের রাতে। সম্রাজ্ঞী সে হতে পারবে না।

ভট্টরাই এবার ইচ্ছে করেই বলল, তবে আপনি যদি সম্রাজ্ঞী হন তাহলে...।

গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে জানুকা বলল, আপনাকে নিয়েই হব। আপনাকে এসব ছোটখাট পদে মানায় না। জানুকা সমাজ-উৎসবের রাতে আপনার ভাগ্য খুলে দেবে! আপনার মতো রূপবান পুরুষ এই প্রাসাদে নেই।

পালাবেন না তো? খিলখিল করে হেসে উঠল জানুকা।

ভট্টরাই বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি আপনাদের ঠাট্টার যোগ্য নই। সামান্য এক সেনা।

জানুকা বল্লভীকে ইশারা করে বলল, লজ্জা পাচ্ছে! তারপর হঠাৎ আবার গলার স্বর নামিয়ে বলল, সত্যিই বলছি। আপনাকে দেখার পর থেকে আমি সম্রাটকে ভুলে গেছি। তবে ঐ ডাইনীকে ছাড়ব না! সমাজ-উৎসব পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ভট্টরাই অনুভব করছিল যে জানুকার মনে কমলিকার বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করছে। সে ভাবল, এটা স্বাভাবিক। মন্ত্রী ইউনাসের কন্যা নিশ্চয় আশা করেছিল যে সেই সম্রাজ্ঞী হবে। স্বর্গচ্যুত হওয়ার মধ্যে বেদনা নিশ্চয় আছে। সেই জ্বালায় সে। আর মেয়েরা যে তাকে পছন্দ করে একথা সে প্রাসাদে এসেই বুঝে গেছে। তাই জানুকার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রশ্ন করল, আজ্ঞে বললেন না তো আপনাদের কী চাই? আমি এখুনি...।

না। কিছু চাই না। আমরা পিতৃগৃহে যেতে চাই ক'দিনের জন্য। সমাজ-উৎসবের দিনই ফিরব। আমাদের যাওয়ার আয়োজন করে দিন।

নিশ্চয়। আপনারা আপনাদের কক্ষে অপেক্ষা করুন। আমি মহামিশ্রকে জানিয়ে আপনাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জানুকা আর বল্লভী ওপরে চলে গেলে ভট্টরাই মহামিশ্রের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানাল। মহামিশ্র বললেন, বেশ তো, তাদের রাজকীয় শকটে করে পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে চারজন সেনা এবং দু-জনের দুজন পরিচারিকা যাবে। এটি রাজকীয় সম্মান রক্ষার বিষয়।

ভট্টরাই বলল, এসব আমি জানি। তাই আমি চাই পরিচারিকা দু'জন গূঢ়পুরুষ বিভাগের কেউ হোক। তারা ছায়ার মতো প্রাসাদ-রমণীদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। প্রতিটি কথা শোনার চেষ্টা করবে।

কেন? মহামিশ্র প্রশ্ন করলেন।

কারণ, তারা ইউনাস আর দুবলের কন্যা, এরা জাষ্কের আত্মীয়া। এদের সঙ্গে জাষ্কের যোগাযোগ রয়েছে। অনেকের মুখে সমাজ-উৎসবের কথা শুনে আমার মনে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় ঐ দিনে একটা কিছু ঘটতে চলেছে। নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে পহ্লব বিদ্রোহীরা ঐ দিনই পুরুষপুর অভিযান করবে। হিউ-পিনান ঐ দিনই চৈনিকদের বিরুদ্ধে সেনা পরিচালিত করবেন বলেও কথা।

মহামিশ্রকে চিন্তিত দেখাল।—সমাজ-উৎসবের তো আর বেশি দেরি নেই। সম্রাট এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ নন। মন্ত্রী পরিষদের সভা শেষ হয়ে গেছে। সেখানকার সিদ্ধান্ত তো শুনেছ। বিদ্রোহীরা পুরুষপুর আক্রমণ করার আগেই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে হবে। ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার সেনা আজকালের মধ্যেই যাত্রা করবে নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে।

ভট্টরাই প্রশ্ন করল, কিন্তু পুরুষপুরের প্রতিরক্ষার জন্য কত সেনা থেকে যাবে?

অতি কম। পাঁচ থেকে সাত হাজার মাত্র!

সম্রাট সম্মতি দিয়েছেন?

উপায় কী? তিনি নিজে অসুস্থ। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত! তিনি সম্মতি না দিয়ে কী করবেন? সবটাই তিনি ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অবশ্য আমরা গুণবর্ধন আর নীলাকারের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি। তাঁদের ঐকান্তিকতা সন্দেহের উর্ধে। তারা পুরুষপুরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা একটা কিছু নিশ্চয় করবেন। তুমি এদিকটায় লক্ষ রাখ। গুণবর্ধন আর নীলাকারকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। রাজপ্রাসাদের সভাগৃহেই আমরা কিছু পরামর্শে বসব। ওরা এখনই এসে যাবে।

মহামিশ্র চলে গেলেন। ভট্টরাই এর মনে দুটি শব্দ শুধু বাজতে থাকল, সমাজ-উৎসব! সমাজ-উৎসবের দিন কী হতে চলেছে? হঠাৎ ভট্টরাইয়ের মনে পড়ে গেল গতকাল রাত্রে শ্রমণ-অনুসরণকারী গূঢ়পুরুষদের কথা। ঐ দুজন নাকি সমস্ত দিন পুরুষপুর পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করে। উত্তরের নগর প্রাচীর বিশেষ ভাবে লক্ষ করে। বারবার দেখে উত্তরের পাহাড়কে। এরপর সন্ধ্যাবেলায় প্রবেশ করে জাঙ্কের কার্যালয়ে। অনেক রাতে তারা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে। দেখা যায় সেখানে তারা দুজন নয়—দশজন। অর্থাৎ আরও আটজন বল্ক্ষ দেশীয় শ্রমণ আগে থাকতেই সেখানে উপস্থিত ছিল। এখন প্রশ্ন হল, অত রাত পর্যন্ত তাদের সেখানে কী কাজ ছিল? কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তারা সঙ্ঘারামে ফিরে যায়। সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষের সঙ্গে তাদের তর্কাতর্কি শুরু হয় এত রাতে ফেরার জন্য। অতপর অধ্যক্ষ তাদের ঢুকতে দিতে বাধ্য হন। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তাদের হয়নি। কারণ প্রবেশ-দ্বার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া, সঙ্ঘারাম রাজশক্তির অধিকারের বাইরে। সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব নয়। দিনের বেলায় নীলাকার যদি কোন অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে পারেন তো ভাল হয়। ভট্টরাইয়ের মনে হল, প্রতিবেদনটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এখনই উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনা প্রয়োজন। অসুবিধার কোন কারণ নেই।

সেনাপতি, গুপ্তচর প্রধান এবং মহামিশ্র ইতিমধ্যেই সভাগৃহে মন্ত্রণার আয়োজন করতে চলেছেন।

ভট্টরাই উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জানুকা আর বল্লভী এসে আবার উপস্থিত হল।

বিনয়ের সঙ্গে ভট্টরাই বলল, আপনাদের শকট, রক্ষক এবং পরিচারিকারা বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনারা আসতে পারেন।

ধন্যবাদ। বলে জানুকা আর বল্লভী এগিয়ে গিয়েও থামল। জানুকা আবার পিছিয়ে ভট্টরাইয়ের কাছে এসে বিলোল কটাক্ষে হাসল। তারপর আবার ফিসফিস করে বলল, একটি সত্য কথা বলে যাই। আমাদের দুজনকে গৃহে ডেকে পাঠানো হয়েছে কোন এক বিশেষ প্রয়োজনে। নচেৎ তোমাকে ছেড়ে আমি যেতাম না।

'তোমাকে'! প্রমাদ গুনল ভট্টরাই। তারপর বলল, ভয় কি, দেবী? আমি তো আছি। কর্মত্যাগ করে আর কোথায় যাব? আহার জুটবে কেমন করে?

তোমাকে আর আহার জোটাতে হবে না। তোমার আহার এবার আমিই জুটিয়ে যাব। আমার ছত্রছায়ায় আমার প্রেমিক হয়ে তুমি থাকবে।

ভট্টরাই বলল, অত সৌভাগ্য কি আমার হবে? আপনার মত ধনী, ক্ষমতাবান—রূপসী যে আমাকে গ্রহণ করবে এ আমি ভাবতেও পারছি না, দেবী! আমি সামান্য এক সেনা মাত্র!

তুমি জানো না ভট্টরাই! তোমার ভেতর কী সম্পদ রয়েছে। প্রথম দর্শনেই তা আমি আবিষ্কার করেছি!

ভট্টরাই বলল, আমার ভাগ্য ভাল। অন্য কারোর চোখে আগে পড়িনি। নইলে সবাই মিলে আমায় টানাটানি করলে...!

ঠাট্টা নয় ভট্ট! ঐ বল্লভীরই কি কম লোভ? নেহাৎ আমি তোমার দাবিদার বলে ও চুপ করে রয়েছে। আর ভাগ্যিস—ডাইনীটার চোখে তুমি পড়নি!

ভট্টরাই বলল, একটা কথা বলব?

কী? বল। স্বচ্ছন্দে বল।

আপনি যখন সম্রাটের মোহ ত্যাগ করেছেন—তখন আর এখানে সমাজ-উৎসরে দিন ফিরে আসার কী প্রয়োজন? আমাকে আপনার গৃহে ডেকে নিলেই তো আমি এখানকার কর্ম পরিত্যাগ করে চলে যেতাম।

চিন্তিত হয়ে জানুকা বলল, সেটাই ভাল হোত। কিন্তু উপায় নেই। কোন

একটা মজা দেখার জন্য আমায় অন্তত ঐ দিনটার জন্য ফিরতে হবেই। হ্যাঁ। তুমি ঐদিন রাতে প্রস্তুত থেকো। সুবিধা মতো সময়ে আমি তোমাকে ওপরে ডেকে নোব। বাধাবন্ধহীন ভাবে রাতটা আমরা এক কক্ষে ব্যয় করে সমাজ-উৎসব পালন করব। এরপর জানুকা একটু থেমে বল্লভীর দিকে তাকিয়ে এক টুকরো রহস্যময় হাসি ছুঁড়ে দিয়ে আবার ফিস্‌ফিস করে বলল, বল্লভী বা অন্য আরও কয়েকজন প্রাসাদ-রমণীও ঐ আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে। মেয়েদের জন্য মেয়েরাই যথেষ্ট নয় বলে আজ মনে হচ্ছে, একজন তোমার মতো পুরুষ চাই! সুন্দর! শক্ত! সমর্থ!

বল্লভী একটু দূর থেকেই বলল, আয় জানুকা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আসি। আবার এক রহস্যপূর্ণ হাসি উপহার দিয়ে এগোল জানুকা।

ভট্টরাইয়ের গা শিরশির করে উঠল। মনে মনে সে ভেবে অবাক হল, এই উত্তাপ নিয়ে জানুকা বা বল্লভীরা পুরুষসঙ্গ বিবর্জিত হয়ে কেমন করে ছিল এতদিন? পরক্ষণেই সে ভাবল, কেমন করে ছিল—তার ইংগিত তো দিয়ে গেল জানুকা! সব ঠিক আছে। কিন্তু জানুকা ঐরাত্রে বাধাবন্ধহীন হবার কথা চিন্তা করছে কী ভাবে? তাদের আগলই খুলে যাবে কী করে? কী মজা দেখবার জন্য সে ঐ দিনই ফিরে আসবে? আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে ভট্টরাই মন্ত্রণা সভাগৃহের দিকে এগোল। তাকে প্রতিটি আশংকার কথা ব্যক্ত করতে হবে মহামিশ্রের কাছে।

সমাজ-উৎসবের আগের দিন দুটি রাজাদেশ প্রচারিত হল। এক, সম্রাট উৎসবের দিন থেকে স্বাভাবিক আহার করা শুরু করবেন। অর্থাৎ আচার্য চরকের নির্দেশে ঐ দিন থেকে তিনি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবেন। দুই, সমাজ-উৎসবের প্রভাতে সম্রাট তাঁর প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে প্রজাদের দর্শন দেবেন। তাঁর পাশে থাকবেন ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞী। অর্থাৎ, সত্যিই সম্রাট আবার স্বাভাবিক সংসার-জীবনে ফিরতে চলেছেন! সমাজ-উৎসবের দিনে প্রশাসন মদ্যের ওপর থেকে শুল্কও প্রত্যাহার করে নেবে।

এরই মধ্যে নগরে আরও দুটি ঘটনা ঘটে গেছে। একটি প্রকাশ্যে, অন্যটি অপ্রকাশ্যে। অপ্রকাশ্য বলার অর্থ, ঘটনাটি মুষ্টিমেয় কয়েকজনই জানেন।

প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে, দিন-দুয়েক আগে উপসেনাপতি সোনাপতের নেতৃত্বে প্রায় চল্লিশ হাজারের এক বাহিনী নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে পহ্লব অভ্যুত্থান প্রতিহত করার জন্য নগর থেকে বেরিয়ে গেছে। মন্ত্রী পরিষদের তিন মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবলের প্রবল চাপে পরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। নগর প্রায় অরক্ষিত। সর্ব সাকুল্যে প্রায় হাজার সাতেক সেনা রয়ে গেছে। সুতরাং, নগর যদি অন্য কোনও শক্তি দ্বারা বা অন্য কোনদিক দিয়ে আক্রান্ত হয় তবে বিপদ ঘটতে পারে। জনসাধারণ অবশ্য এসব কথা জানে না। তাদের অযথা আশংকিত করে প্রতীক্ষিত সমাজ-উৎসবের আনন্দ নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। সম্রাটকে মহামিশ্র সবই জানিয়েছেন। সম্রাট সম্মতি দিয়েছেন অনন্যোপায় হয়ে। মথুরায় এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাঠানো হয়নি। কারণ, মন্ত্রী ইউনাসের মতে বিদ্রোহীদের শক্তি অতি ক্ষীণ। তারা সহজেই পুরুষপুরের বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হবে। অন্য দিক দিয়ে নগর আক্রমণের সম্ভাবনাও নেই। অপরদিকে বল্খের বাহিনী চৈনিক দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে—রাজধানী তা-হিয়া থেকে। চৈনিক সম্রাট ঘোষণা করেছেন, তা-হিয়ার পণবন্দী চৈনিক রাজকুমারকে কুষাণরা হত্যা করতে পারে—কিন্তু তারা রেশম-পথের অধিকার ছাড়বে না। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তবে, বল্খ সম্পর্কে আরও একটি গোপন সংবাদ পুরুষপুরের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে এসে পৌঁছেছে। সংবাদটি জানেন, মহামিশ্র, গুণবর্ধন, নীলাকার আর স্বয়ং সম্রাট। মন্ত্রী পরিষদের কাছে সংবাদটি সাময়িকভাবে গোপন রাখাই হয়েছে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে।

বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরে ভট্টরাই যেন খানিকটা নির্জীব হয়ে বসেছিল তার কার্যালয়ে। তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ন। হঠাৎই চরক আশ্রমের ঔষধী বোঝাই শকটটি প্রাসাদের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়াল। প্রহরীরা আশ্চর্য হল।—সম্রাটের কী এত ঔষধী লাগবে?

শকট থেকে দেবলকে নামতে দেখে প্রহরীরা তাকে চিনতে পেরে অভিবাদন জানাল। তারপর প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার ভন্তে দেবল?

দেবল বলল, কার্যালয়ে কে আছেন? মহামিশ্র—না ভট্টরাই?

প্রহরী বলল, মহামিশ্র সেনানিবাসে গেছেন। ভট্টরাই রয়েছে।

আমি তার সঙ্গে এখনই দেখা করব। বিশেষ প্রয়োজন।

আপনি প্রাসাদের পরিচিত। আপনি স্বচ্ছন্দে ভেতরে যেতে পারেন।

দেবলকে দেখে ভট্টরাইও বিস্মিত হল, কী ব্যাপার, দেবল! সম্রাট...

না-না। অন্য ব্যাপার। সময় কম। আচার্য চিন্তা করছেন। সুতরাং তোমাকেই

ঘটনাটি বলে যাই। যথাস্থানে পৌঁছে দিও।

বল।

আজ সকালে আমরা উত্তর পাহাড়ে গিয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। সচরাচর আমাদের প্রয়োজন পাহাড়ের পাদদেশে বা সামান্য উঁচুতেই মিটে যায়। কখনও সখনও ওপরে উঠি। আজও তেমন ওঠবার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ওপরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বেশ কয়েক শত মানুষ শুয়ে আছে। দু'একজন সশস্ত্র প্রহরী জেগে ছিল। সৌভাগ্যবশত তারা আমাদের দেখতে পায়নি। আমরাও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি। তারা বোধহয় ভীষণ ক্লান্ত।

ভট্টরাই বলল, দেখতেই যখন পেলে, তখন তাদের প্রশ্ন করে খোঁজ খবর নিয়ে এলেই বোধহয় ভাল করতে।

দেবল বলল, না। তাতে হয়ত আমাদের প্রাণ সংশয় হোত। তারা কেউই সাধারণ নাগরিক বলে মনে হল না। নিঃসন্দেহে বল্খবাসী। যোদ্ধা শ্রেণির। অস্ত্রও রয়েছে তাদের কাছে।

অস্ত্র রয়েছে! ভট্টরাই এবার চিন্তিত হল।—বল্খের অস্ত্রধারীরা পাহাড়ের মাথায়! কেন? তারপর সে দেবলকে আবার প্রশ্ন করল, কত মানুষ হবে?

ওই ঢালে তো কয়েকশত জনকে দেখলাম অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অপর ঢালে কত জন আছে—কে জানে?

ভট্টরাইয়ের কপালে চিন্তার রেখা গভীর হল।—তুমি তোরণদ্বারে বা অন্য কারোর কাছে এ বিষয়ে কিছু বলনি তো?

না—ভট্টরাই। বিষয়টির গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করেছি। এমন কি আচার্যও জানেন না। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

দেবল! এই ঘটনা তোমার সাথীদের কেউ জানে?

না। আমিই আগে আগে ওপরে উঠছিলাম। তারপর, হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে সব দেখেশুনে সাবধানে আবার নিচের পথ ধরি। সাথীদেরও নিচে নেমে আসতে বলি। তারা অবশ্য প্রশ্ন করে। উত্তরে আমি বলি, যে বিশেষ লতাটি সংগ্রহ করব বলে ঠিক করেছিলাম—তা যথেষ্ট লম্বা হয়নি। পরের বার নিয়ে যাব। কাল উৎসব। আজ একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া ভাল। তারা আর কিছু প্রশ্ন করেনি বা সন্দেহও করেনি।

ভট্টরাই বলল।—ঠিক আছে দেবল। তুমি এখন আশ্রমে ফিরে যাও। সংবাদটি গুরুতর। দস্যুদলও হতে পারে। কাল উৎসব। মানুষজন অসতর্ক থাকবে। মদিরায় আচ্ছন্ন হবে প্রভাত থেকেই—নাগরিক, সেনা-প্রহরী সবাই।

নগরের বেশির ভাগ সেনাও তো বিদ্রোহ দমনে গেছে। সময় থাকলে নাগরিকদের সতর্ক করা যেত! এখন তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। যাহোক, দেবল তুমি যাও। সংবাদটির জন্য ধন্যবাদ।

দেবল চলে গেল।

ভট্টরাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।—কী করা উচিত? বিষয়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ! দস্যুদল হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারা নিশ্চয় জানে, নগরে পর্যাপ্ত সেনা নেই। নাগরিকরা উৎসবে মত্ত থাকবে। আনন্দের সঙ্গেই তারা এই অতি সমৃদ্ধ নগরকে লুণ্ঠন করবে! আবার এ জাল্কের কোনও পরিকল্পনাও হতে পারে। এই বাহিনীর ভরসাতেই সে বোধহয় সমস্ত সমস্যা সমাজ-উৎসবের রাতে সমাধান করবে বলে সম্রাটকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মহোৎসবের অছিলায়—ষণ্ড বলিদানের প্রতিশ্রুতিতে সে তার সমস্ত প্রহরীকে কার্যালয়ে সমবেত হওয়ার গোপন আদেশ দিয়েছে! ভট্টরাই অশান্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল। তিনজনকে তার বিষয়টি এই মুহূর্তে জানানো প্রয়োজন। আক্রমণ যদি আজ রাতেই নেমে আসে! কিন্তু মহামিশ্র না আসা অবধি সে এই প্রাসাদ ছেড়ে তাঁদের খোঁজে কেমন করে যাবে? অন্যদিকে তিনজনকে একত্রে প্রাসাদে উপস্থিত হতে বলাটাও তার পক্ষে ধৃষ্টতা মূলক হবে। অগত্যা সে একটি পত্র লিখে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এক পরিচারকের হাতে দিয়ে সেই পত্র সেনানিবাসে পাঠিয়ে দিল। তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেও—তাঁরা এলে ভট্টরাই ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বোঝাবে।

সত্যি। ভট্টরাইয়ের পত্র পেয়ে সেনাপতি আর নীলাকার ক্ষুব্ধ হলেন। গুণবর্ধন বললেন, এভাবে আমাদের আহ্বান করাটা ভট্টরাইয়ের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। সে তার অধিকারের সীমারেখা ভুলে গেছে। প্রয়োজন হলে যে নিজে আসতে পারত।

মহামিশ্র বললেন, আমরা বোধহয় একটু ভুল বুঝছি তাকে। কোন অবস্থাতেই প্রাসাদে সম্রাটকে একা রেখে তার এখানে আসা সম্ভব ছিল না। আবার বিষয়টি নিশ্চয় এত গুরুতর যে আমার ফেরা পর্যন্তও সে অপেক্ষা করতে পারছিল না। চল, আমরা গিয়েই দেখি না বিষয়টা। ভট্টরাইকে অত বুদ্ধিহীন বলে ভাববার কোনও কারণ নেই।

তিনজন উর্ধতন আধিকারিককে দেখে ভট্টরাই বুঝতে পারল যে তাঁরা যথেষ্টই ক্ষুব্ধ। তাই তাঁরা কিছু বলার আগেই সে বলল, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। সম্রাটকে প্রাসাদে রেখে আমার পক্ষে যাওয়াটা গর্হিত অপরাধ হোত। মহামিশ্রের আগমনের সময়ও অনিশ্চিত। অথচ বিষয়টি সময়ের অপেক্ষা নাও করতে পারে।

মহামিশ্র গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার? কাকে নিয়ে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? সম্রাট নিশ্চয় নন। তাহলে অবশ্যই তুমি তা উল্লেখ করতে। তবে?

ভট্টরাই মহামিশ্রের উষ্মা গলাঃধকরণ করে দেবলের কাহিনিটি খুলে বলল। তারপর তিন প্রধান যখন হতচকিত হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন তখন ভট্টরাই বলল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রাত নেমে আসছে—যদিও আমার অনুমান—কিছু ঘটলে আগামীকালই ঘটবে। তবু...!

গুণবর্ধন এবার সহজ হলেন। বললেন, তোমায় ভুল বোঝার জন্য দুঃখিত। নিঃসন্দেহে বিষয়টি গুরুতর। তোমার অনুমানই হয়ত সঠিক। উৎসবের অসর্তকতার সুযোগই তারা নিতে চাইবে। আজকের সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও—আমি নগর তোরণে হাজার খানেক সেনা পাঠিয়ে তোরণের শক্তিবৃদ্ধি করছি। শুধু তাই নয়। নগরের উত্তর প্রাচীর পার করেও তারা প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং কয়েক হাজার সেনা ঐ প্রাচীর রক্ষায়ও পাঠিয়ে দোব। বাকি সেনা সেনানিবাসে থাকবে।

মহামিশ্র বললেন, গুণবর্ধন যা কিছু করবে সংগোপনে এবং শত্রু পক্ষের আর নাগরিকদের দৃষ্টি এড়িয়েই করতে হবে। নাগরিকদের মধ্যে আতংকের ভাব কোন রকমেই সৃষ্টি করা যাবে না।

গুণবর্ধন বললেন, আপনার উপদেশ মনে থাকবে। সেনারা কিছু পর থেকেই ছোট ছোট দলে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেনানিবাস থেকে বার হবে। তাদের ঘোড়ার চাল খুবই ধীর গতিতে হবে—যাতে যে কেউ ভাবতে পারে যে এরা নগর ভ্রমণে বেরিয়েছে। অবশ্য নগর জেগে থাকতে থাকতেই এই চলাচল শেষ করতে হবে। রাত্রে নির্জন রাস্তায় তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আগামী প্রভাত থেকেই আমরা শংকা মুক্ত হব। শুধু, আজ রাত্রে সোনাপতের কাছে নির্দিষ্ট সংবাদটি পাঠিয়ে দিতে হবে।

গুণবর্ধন আর নীলাকার চলে গেলেন। ভারমুক্ত হল ভট্টরাই। সে বলল, আমি তাহলে প্রাসাদ-প্রহরী আর অঙ্গরক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে আসছি। আজ আর কাল আমাকে এখানেই অবস্থান করতে হবে।

সে তো নিশ্চয়। আবার আগামী প্রভাতে সম্রাট আর ভাবী সম্রাজ্ঞী জন সাধারণকে দর্শন দেবেন। আমি সম্রাটের কাছে যাচ্ছি!

ঠিক আছে, ভন্তে মহামিশ্র!

প্রভাতে প্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে শত শত মানুষ সম্রাটের দর্শন দানের আশায় অপেক্ষা করছে। একটু পরেই সম্রাট আর ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞী অলিন্দে দাঁড়িয়ে জনতার অভিবাদন—শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। জনসাধারণ এবং সকলেই

বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে নিয়েছে। মথুরায়ও সংবাদ গেছে। বাসিষ্কের রুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, সেই-ই এই সাম্রাজ্যের যুবরাজ। তার অধিকার খর্ব হচ্ছে না। সম্রাটের অবর্তমানে সেই-ই এই বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী হবে। কমলিকার পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

ঘোষক এক সময়ে ঘোষণা করল, সম্রাট আর ভাবী সম্রাজ্ঞী অলিন্দে আসছেন। পরক্ষণেই সম্রাট আর কমলিকা এসে অলিন্দে দাঁড়ালেন। জনতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সম্রাট আর ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞী হাত তুলে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। সম্রাট জনতার সম্মুখেই অঙ্গুরী বিনিময় করলেন কমলিকার সঙ্গে। জয়ধ্বনি উঠল।

হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে ভট্টরাই দূর থেকে কমলিকাকে দেখল। তার মুখ দিয়ে 'অপূর্ব' শব্দটা আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। কিন্তু একটা জ্বালা যেন তার বুক ছুঁয়ে গেল। নিজের ওপরই রুষ্ট হয়ে উঠল ভট্টরাই। নিজেকে সে প্রশ্ন করল, এই আনন্দের দিনে কেন তার বুকে জ্বালা? সে কি কমলিকার ভাগ্যে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছে? এটাই তো স্বাভাবিক—কমলিকা সম্রাজ্ঞী হবার যোগ্য। সম্রাট প্রাসাদ-রমণীদের ভেতর থেকে উৎকৃষ্ট রত্নটিকেই বেছে নিয়েছেন। তার বরং গর্ব হওয়া উচিত। এই সম্রাজ্ঞীর জীবন সে একদিন রক্ষা করেছে। এই সম্রাজ্ঞীর করুণায় সামান্য ক-দিনে সে কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছে! সম্রাজ্ঞী যদি কৃপা করেন, তবে ভবিষ্যতে সে আরও কোথায় গিয়ে পৌঁছবে! জাষ্ক পর্যন্ত আজ তাকে সমীহ করে কথা বলে। এ তো কমলিকার দান! সে না হয় বাকি জীবন তার বুকের মাঝে এই দানটুকুই ধরে রাখবে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, জানুকা আর বল্লভীর আজ ফিরে আসার কথা। জানুকা আজ রাতে তাকে নিয়ে তার কক্ষে মহোৎসব করবে! নারীদেহ কখনও স্পর্শ করেনি ভট্টরাই। করতেও চায় না। অন্তত যাকে সে না ভালবাসে—তার দেহ সে কখনই ছোঁবে না। তাছাড়া, ভট্টরাইকে একদিন হয়ত সংসার ধর্ম পালন করতে হবে। সেক্ষেত্রেও সে জানুকা বা বল্লভী বা অন্য কোনও প্রাসাদ- রমণীকে কামনা করতে পারে না। কারণ, সেই একই দূরত্ব। আবার ঐসব বুভুক্ষু প্রাসাদ-রমণীদের কথা তো উঠতেই পারে না। তারা যে তাকে প্রমোদ সামগ্রী হিসাবেই গ্রহণ করতে চায় তা বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে। এই প্রাসাদে পুরুষহীন হয়ে থেকে তাদের মতো যৌনতাপ্রিয় নারীদের সমকামীতার পথ গ্রহণ করতে হয়েছে এতকাল—এ বিষয় তার কোন সন্দেহ নেই। আর প্রাসাদে সে পা রাখতেই তাদের বাসনার পথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা এখন তাদের তৃপ্ত করার জন্য তার মতো একজন বলিষ্ঠ পুরুষের প্রয়োজন অনুভব করছে। আজকের রাত বাধাবন্ধহীন! কারণ আজ সব জায়গায় সতর্কতার

অভাব থাকবে। কুঞ্জে-কুঞ্জে-উদ্যানে, ঝোপঝাড়ে চলবে গোপন রতি-বিলাস। কত নারী যে অবৈধভাবে আজ গর্ভবতী হয়ে পড়বে তার হিসাব কে রাখবে? কিন্তু জানুকা কি সত্যিই রতি-বাসনা নিয়ে ফিরে এসেছে প্রাসাদে? তার প্রতিজ্ঞাগুলো? ডাইনীকে সে মজা দেখাবে! তাকে সম্রাজ্ঞী হতে দেবে না। তবে কি জানুকা কোনও গোপন অভিসন্ধী নিয়ে ফিরে আসছে? সম্রাটের প্রতি তার কোন মোহ নেই—সে কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে?

ভট্টরাই কার্যালয়ের দিকে এগোল। পরিচারিকা দু'টির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত এই 'তবে'-এর সন্ধান সে পাবে না। পরিচারিকাদের এবং জানুকা ও বল্লভীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে!

ভট্টরাইকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। প্রাঙ্গণের ভিড় কমে গেলেই দেখা গেল দুটি শকট এসে থামল। কার্যালয়ের ভেতর থেকে তোরণ পর্যন্ত দেখা যায়। ভট্টরাই দেখল, জানুকা আর বল্লভী বেশ উৎফুল্ল ভাবেই তার দিকে এগিয়ে আসছে। হাসি মুখে ভট্টরাই তাদের দিকে তাকাল। জানুকা একটু এগিয়ে এসে বলল, তোমার জন্য আর থাকতে পারছিলাম না!

পারলেন তো?

কী করব? বাবা ছাড়লেও মা ছাড়ছিলেন না। বল্লভীরও এক দশা। হ্যাঁ। সম্রাটের পাশে ডাইনীটা কি আজ দর্শন দিয়েছে?

হ্যাঁ।

আমার সহ্য হবে না ভেবেই একটু দেরি করে এলাম। আজ রাতের কথা কি মনে আছে?

নিশ্চয় আছে। আমার মতো মানুষ কি এই সুযোগ হারাতে পারে?

আমি কিন্তু একা নই। একাধিক। ভয় করছে না তো?

ভয়? কিসের ভয়? আজ সবাই তো প্রায় হতচেতন হয়ে থাকবে। পথে ঘাটে—আনাচে-কানাচে তো রতি লীলায় ব্যস্ত থাকবে। আমরা তো থাকব বন্ধ ঘরে। কে দেখছে? চেঁচামেচি না করলেই হল।

জানুকা বলল, তা হলেই বা ক্ষতি কী? ছুটে এলে তো আসবে আর কয়েকজন প্রাসাদ-রমণী। এরকম তো তারা প্রায়ই আসে। আজ তোমাকে দেখে সবায়ের রসনা দিয়ে জল গড়াবে। কেউ নাক সিঁটকে চলে যাবে বলে ভাবছ?

বাবা! অত জন...পারব?

দূর বোকা! তুমি আমার। বড় জোর বল্লভীরও। সবাইকে আমি বিলোতে যাব নাকি তোমায়? ওরা নিজেরা যে কাজ করে নিজেদের সঙ্গে তাই করবে। বরং তাতে আমাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে।

ভট্টরাইয়ের গা ঘিনঘিন করে উঠল। এদের মধ্যে কেউ সম্রাজ্ঞী হলে দেশে আর শক্ত সমর্থ পুরুষ থাকবে না।—বেশ! তাহলে তো ভালই হল। কিন্তু কখন যাব? প্রাসাদের ঘন্টাধ্বনি তো হবেই। কোন দিকে কত সংখ্যার ঘর?

বল্লভীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জানুকা বলল, ওসবের কোনও প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রহরের পর যে কোন মূহূর্তে আমি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আসলে, ওপরে রক্ষীরা কখন ঘুমিয়ে পড়ে তার ওপরই সময়টা নির্ভর করছে। তাদের জন্য সমাজ-উৎসবের উপহার হিসাবে কিছু মদ্য নিয়ে এসেছি। তাতে ঘুমের ঔষধী মিশিয়ে পান করাবো। পরিচারিকাগুলোরও একই অবস্থা করব। ওরা ঘুমিয়ে পড়লেই আমরা বাধাবন্ধহীন।

চমৎকার পরিকল্পনা।

কিন্তু একটা শর্ত।

কী শর্ত?

তুমি প্রথম প্রহরের ঘণ্টাধ্বনির পর এখান থেকে এক পাও কোথাও যাবে না। কারণ, আমি বা অন্য কেউ এসে তোমায় খুঁজে বেড়াতে পারবে না। তোমার কার্যালয়ের সকলকে উৎসবের জন্য ছেড়ে দিও। সাক্ষীও রাখতে চাই না। একটু থেমে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে জানুকা ভট্টরাইয়ের থুতনি স্পর্শ করে বলল, কথা দিচ্ছ? যা বললাম, তা বর্ণে বর্ণে পালন করবে?

করব।

যদি না কর—আমাদের মহোৎসব যদি নষ্ট হয়ে যায়—তাহলে ফল কিন্তু ভাল হবে না। জানুকা প্রতিশোধ নিতে জানে!

ভট্টরাই হাল্কা ভাবে হেসে বলল, তুমি কি আমাকে এতই মুর্খ ভাব? তারপর সে ফিসফিস করে বলল, মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবলের রূপসী কন্যাদের আমন্ত্রণ আমি ভুলে যাব? জীবনে কি আমি তোমাদের মতো রূপসীদের সংস্পর্শে আসতে পারব? আজ আমি ধন্য হয়ে যাব। দেখনা, আমার শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে!

বিলোল কটাক্ষে জানুকা বলল, তাহলে 'তুমি' বললে! অসহ্য লাগছিল 'আপনি—আজ্ঞে'! শরীর হিম করা দৃষ্টিবাণ হেনে জানুকা আর বল্লভী সোপানের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রাসাদ-রমণী দুজন চলে যাবার পর আসনে গা এলিয়ে দিয়ে ভট্টরাই ভাবতে বসল। তার গুরু বিষ্ক তাকে বলেছেন, মেয়েদের প্রতিটি কথা সর্তকতার সঙ্গে বিচার করবি—বিশেষ করে যখন ওরা দৈহিক প্রলোভন দেখাবে। মেয়েরা কার্য উদ্ধারের জন্য পুরুষকে প্রলোভিত করে। ভট্টরাইয়ের জীবনে এরকম ভয়ংকর প্রলোভন এই প্রথম। কমলিকার ক্ষেত্রে প্রলোভনের কোনও কথাই ওঠে

না। তাকে দিয়ে কমলিকার কার্য-সিদ্ধি করার মতো কোনও ব্যাপারই ছিল না! জানুকার ক'টি কথা ভট্টরাইয়ের মনে সন্দেহের উদ্রেক করল। তাদের দৈহিক ক্ষুধার কথা হয়ত সত্য হতে পারে। তারা দৈহিক ভাবে উত্তপ্ত হতেই পারে। কিন্তু কমলিকার সম্রাজ্ঞী হবার ঘোষণার আভাষ পেয়েই কেন তাদের এই পরিবর্তন? তাকে নিয়ে টানাটানি? তারা তো অনেকেই স্থির করেছিল—সম্রাজ্ঞী না হতে পারলেও উপপত্নী হতে তারা রাজি। সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হবার বাসনা ত্যাগ করে তার মতো তুচ্ছ এক মানুষকে নিয়ে কেন রতি ক্রীড়ার বাসনা? এত সহজে তাদের মোহমুক্তি কী করে ঘটল? তাকে প্রথম প্রহরের ঘণ্টা ধ্বনির পর কেন একই জায়গায় বসে থাকার কথা বলা হল? তাদের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু ভট্টরাই সন্তুষ্ট হতে পারল না।—কেন প্রথম প্রহরের ঘণ্টার পর থেকে? অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে। মনে সন্দেহের উদ্রেক হোত না—আসলে তাকে প্রথম প্রহরের পর এক জায়গায় বসিয়ে রাখার জন্য যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা—সেটাই সন্দেহের উদ্রেক করছে। প্রাসাদের প্রায় সকলেই জানে, আজ কয়েকদিন যাবৎ ভট্টরাই রাতের যে কোনও সময়ে প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। অনেক প্রাসাদ-রমণী তাকে বাতায়ন পথে চাঁদের আলোতে দেখেছে, আসলে তারা ভুল বুঝেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না, দুটি উদ্দেশ্যে নিয়ে ভট্টরাই ঘুরে বেড়ায়। এক, প্রাসাদের নিরাপত্তা দেখা তো আছেই। দুই, তার আশা, কোন না কোনদিন বাতায়নে সে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা কমলিকাকে দেখতে পাবে। তাকে দেখাও তার কাছে সুখের। হোক না সে প্রাসাদ-রমণী—হোক না সে ভাবী সম্রাজ্ঞী। তার মনের মধ্যে সে কমলিকা হয়েই চিরকাল বিরাজ করবে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল ভট্টরাই। সে ভাবল যৌন উত্তেজনায় সে তার কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না। বিশেষ করে উত্তরের পাহাড়ের মাথায় যখন সন্দেহজনক বল্লবাসীদের দেখা গেছে! অনুমান মতো গতরাতে কিছু ঘটেনি—কিন্তু আজ রাতে কিছু ঘটতে বাধা কী? বেশ কিছুদিন ধরে সমাজ-উৎসবের কথা শত্রুদের মুখে শোনা গেছে। কেন? এ কি কাকতালীয়?

জানুকা আর বল্লভী চলে যেতেই কোথা থেকে যেন দুই গুপ্তচর দুই পরিচারিকার উদয় ঘটল।—ভন্তে ভট্টরাই!

হাসি মুখে ভট্টরাই জিজ্ঞেস করল, কী? কোন সংবাদ আছে?

তারা বলল, না। তেমন কিছু নয়। জাষ্ক এসেছিল। গভীর কিছু আলোচনা হচ্ছিল। কানে বারবার একটা কথাই এসেছে। সমাজ-উৎসবের রাত। জাষ্ক ইউনাস আর দুবলের বাড়িতে জানুকা আর বল্লভীকে সম্ভবত একই কথা বলেছেন—সমাজ-উৎসবের রাত!

ভট্টরাই বলল, আর কিছু?

জানুকার পরিচারিকা বলল, আর একটি কথা আমার কানে এসেছে। জাষ্ক প্রদীপের কথা কী যেন বলছিলেন। পরে জানুকা আমায় প্রশ্ন করে, প্রদীপ কোথায় পাব?

আমি বলেছি, চিন্তা করবেন না। আমি এনে দোব। প্রাসাদে তো কোন প্রদীপের ব্যবহার নেই। সবই দেওয়ালগিরি বা অগ্নিশলাকা। তা আপনি প্রদীপ নিয়ে কী করবেন?

কাজল তৈরি করব। নিজের হাতে তৈরি করা কাজল খুব মনোরম আর শীতল হয়। বাইরের কাজল আমার সহ্য হয় না।

ভট্টরাই বলল, তা এনে দিয়েছ?

হ্যাঁ। একটি পাত্রে সামান্য ঘৃত ও একটি চকমকি পাথরও এনে দিয়েছি সলিতা জ্বালাবার জন্য।

চমৎকার! নিজের হাতে তৈরি কাজলে জানুকাকে নিশ্চয় আরও সুন্দর দেখাবে।

না, ভন্তে। ও মায়া-কাজল তৈরি করতে চায় সম্রাটকে বশ করার জন্য।

ভট্টরাই হেসে বলল, তা বেশ। তোমদেরই বা কী—আমারই বা কী? তোমরা এস এখন।

গুপ্তচর-পরিচারিকারা চলে গেল। ভট্টরাই আবার তার আসনে বসে ভাবতে বসল, প্রদীপ কেন? জানুকা যা বলেছে তা কি সরল অর্থে নেওয়া যায়? বিষয়টি অতীব সন্দেহজনক, কারণ জাষ্কের সঙ্গে কথা বলার সময় এই প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। জাষ্ক মেয়েদের কাজল নিয়ে মাথা ঘামায়—একথা কোনদিন শোনা যায়নি। অতএব, বিষয়টিকে সরল অর্থে নেওয়া সম্ভব নয়। বিষ্কের কথা আবার তার মনে হল। বিষ্ক তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তুমি প্রাসাদের প্রতিরক্ষার কাজে যোগদান করেছ। সব সময় মনে রাখবে সম্রাটের প্রাণ তোমার হাতে। কোন বিষয়কে—কারোর মুখের কথা সরল বিশ্বাসে মেনে নেবে না। বক্তাকে বুঝতে দেবে না তোমার মনের কথা। এখানে অজস্র দেওয়ালগিরির আলো। রাতভোর প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করে। গরিবের কুঁড়ের প্রদীপ এখানে অচল। কাজল তৈরি? প্রাসাদ রমণীদের প্রসাধনিক জিনিস তো কোন কম নেই। সবই উৎকৃষ্ট শ্রেণির। তবে জানুকার হঠাৎ কাজলের কী প্রয়োজন পড়ল? তাছাড়া কোন পরিচারিকাকে আদেশ করলেই তো তারা ঐ কাজল প্রস্তুত করে দিত। নিজের হাতে করার কী অর্থ? হঠাৎ ভট্টরাই চমকে উঠল। প্রদীপের আলো সংকেত হিসাবেও ব্যবহার হতে পারে? কিন্তু কীসের সংকেত? কাকে সংকেত? কোন গুপ্ত-প্রেমিক আসার সংকেত? তবে জানুকা কি তার সঙ্গে নাটক করে গেল? অথচ সে প্রথম প্রহরের ঘণ্টার পর তাকে স্থানান্তরে যেতে নিষেধ করে গেছে।

প্রেমিক এলেও কোন পথে আসবে? তাকে তো তার সামনে দিয়েই সোপানে পা রাখতে হবে। আর আসার পথ কোথায়? বিভ্রান্ত হয়ে উঠল ভট্টরাই।

সমাজ-উৎসবের সন্ধ্যা। নাগরিকদের সবাই মত্ত। কোনও কোনও অঞ্চলে নাটক ও সংগীত পরিবেশন করা হচ্ছিল। নগরের কুঞ্জ, উদ্যান, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে প্রেমিক-প্রেমিকারা আশ্লেষে মত্ত। রতি-রভস স্পন্দনে পুরুষপুরের আকাশ বাতাস বিকৃত। মত্তের দল রাস্তায় হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে। প্রহরীহীন পথঘাট।

জাষ্ক আজ তার নিভৃত কক্ষ ছেড়ে কার্যালয়ের দাওয়ায় বসে প্রহরীদের নিমন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে। তাঁর পরিবর্তিত মূর্তিতে প্রহরীরা সবাই মুগ্ধ। আহারের বিপুল আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কোন বন্ড বলিদান করা হয়নি। প্রশ্ন করলে জাষ্ক রহস্যময় ভাবে হেসে বলছে, বলিদান হবে। আর কিছু সময় অপেক্ষা কর। বলির লগ্ন হলেই আমি জানাব। এখন আহার আর মদ্য গ্রহণ কর খুশি মতো। রাত্রে আমরা এক অভিযানে বার হব। কোথায়? কী জন্য—এসব প্রশ্ন করিস না। যারা নির্দ্বিধায় আমাকে অনুসরণ করবে—তারা প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবে। আমি কথা দিচ্ছি। তাদের কোনও আর্থিক সমস্যা আর থাকবে না।

চপল কিছু প্রহরী নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করল, তবে কি জাষ্ক রাজকীয় কোষ-ভান্ডার লুঠ করবে? করতেও পারে। তবে তিনি যদি সঙ্গে থাকেন তবে আমাদের অসুবিধা কোথায়? আজ রাতে ওখানকার হাতে-গোনা প্রহরীরা মত্ত থাকবে। আমাদের কাজ হাসিল করার কোনও অসুবিধা হবার কথাও নয়।

জাষ্ক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করছিলেন, ঘাতক দলের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। তারা ফিরে এলেই তিনি একটি জ্বলন্ত তির উত্তর পাহাড় লক্ষ্য করে আকাশে ছুঁড়বেন। পাহাড় থেকে নেমে আসবে প্রায় হাজার খানেক বল্খ দেশীয় যোদ্ধা। তাদের এক অংশ নগর তোরণ আক্রমণ করবে। অপর অংশ উত্তরের নগর প্রাচীর অতিক্রম করে নগরে ঢুকে পড়বে। তারপর ঐ বাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলা হবে সৈন্যাবাস, প্রাসাদ আর কোষ-ভান্ডার। কাল প্রভাতে কণিষ্কের ছিন্ন মুণ্ডু হাতে নিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে জনতার সামনে নিজেকে নতুন সম্রাট বলে ঘোষণা করবেন তিনি। অন্যদিকে বাসিষ্ক পুরুষপুরে পা রাখার আগেই হিউ-পিনান তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে হিন্দুকুশ পেরিয়ে পুরুষপুরে পৌঁছে যাবেন। নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে পহ্লব বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধরত

রাজকীয় বাহিনীকে অস্ত্র সংবরণ করতে বলা হবে। নচেৎ পেছন থেকে হিউ-পিনানের বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলবে। ইতিমধ্যে সংবাদ এসে গেছে যে হিউ-পিনান তা-হিয়া থেকে যাত্রা করে গেছেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর বাহিনীর অভিমুখ কাশগড়-খোটান-ইয়ারকন্দ থেকে ঘুরিয়ে পুরুষপুরের দিকেই এগিয়ে আসবেন। কণিষ্কের জন্য তার দুঃখ হল—মণিকার পুত্রীর সঙ্গে তিনি এক শয্যায় শোওয়ার সুযোগও আর পাবেন না! মণিকার পুত্রীকেও হত্যা করার আদেশ তিনি দিয়েছেন।

একদল প্রহরী এসে জাষ্কের চিন্তার বিঘ্ন ঘটাল।—ষণ্ড বলিদান কখন হবে, প্রভু?

বিরক্ত জাষ্ক বলল, প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তা মাংসের তো অভাব নেই এখানে। গেল না যত পারিস! ষন্ড মাংস না হয় কালই খাবি!

প্রহরীরা জাষ্কের বিরক্তি উৎপাদন করা সমীচীন মনে না করে চলে গেল আহার-ঘরে। এই বিশাল ঘরটি সম্প্রতি তিনি তৈরি করিয়েছেন—প্রহরী-নিবাস হিসাবে।

সেনা-নিবাসে বসেছিলেন গুণবর্ধন আর নীলাকার। ক'জন গূঢ়পুরুষ ছোটাছুটি করছিল নানান সংবাদ নিয়ে। একজন গূঢ়পুরুষ সংবাদ নিয়ে এল, সোরোডান সম্রাটের আদেশনামা দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং হিউ-পিনানকে বন্দি করেছেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপন প্রচারের ফলে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ থেকেছে। হিউ-পিনানপন্থীরা বাধা দিতে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। হিন্দুকুশের পার্বত্যপথ সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে এই পরিবর্তনের কথা পুরুষপুরে না পৌঁছায়। বরং একজন গূঢ়পুরুষকে পাঠানো হয়েছে জাষ্কের কাছে। বলা হয়েছে, আগামী কালই হিউ-পিনান হিন্দুকুশ অতিক্রম করবে। সেনাবাহিনীর তা-হিয়ায় ফিরে যাবার কথাও গোপন করা হয়েছে। অপর দিকে মন্ত্রী পরিষদ তথা ইউনাস-ভার্গব আর দুবলের প্ররোচনায় যে চল্লিশ সহস্র সেনা নিম্নসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়েছিল—তারা পথে বিভক্ত হয়ে গেছে। মাত্র দশ সহস্র সেনা নিম্নসিন্ধুর দিকে এগিয়ে গেছে। অপরদিকে সৌরাষ্ট্র আর নিম্নসিন্ধু অঞ্চলের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি থেকে আরও তিরিশ সহস্র সেনা ঐ দশ সহস্রের সঙ্গে মিলিত হবে। পুরুষপুরের সেই উদ্বৃত্ত তিরিশ সহস্র সেনা ফিরে এসে আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে উত্তর পাহাড়ের পাদদেশে গোপন ভাবে অবস্থান করছে। এছাড়াও কিছু সেনা যেমন নগর তোরণে এবং নগরের উত্তর প্রাচীর বরাবর

রাখা হয়েছে—ঠিক তেমনি আরাও কিছু সেনা গোপনে মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব এবং দুবলের প্রাসাদও ঘিরে রেখেছে। এই ষড়যন্ত্রে তাঁদের জড়িত থাকার প্রমাণ গূঢ়পুরুষ বিভাগ ইতিমধ্যেই হস্তগত করেছে। জাষ্কের কার্যালয়ের ওপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। গুপ্তভাবে অবস্থান করছে প্রায় হাজার খানেক সেনা। সৈন্যাবাস এখন সেনাশূন্য। প্রাসাদের জন্য সেরকম কোন সেনা ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, প্রাসাদের বাইরে বিভিন্ন স্থানে প্রহরী দেবার জন্য প্রাসাদের নিজস্ব কিছু বাহিনী রয়েছে। তাছাড়া, রাস্তায় গুপ্তভাবে অবস্থান করা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেনাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনও বাহিনীরই প্রাসাদে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু গুণবর্ধন আর নীলাকার যে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেননি তা হচ্ছে কুবার তীর। ঐ দিকে অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক প্রহরী ছিল। এও দেখা হয়নি যে উৎসবের দিনে কত প্রহরী সঠিক ভাবে কার্যক্ষম রয়েছে। কুবার দিক থেকে সহজেই রাজ-উদ্যানে প্রবেশ এবং উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রাসাদ পর্যন্ত এগিয়ে আসা সম্ভব—যদি না উদ্যানের প্রহরীরা সতর্ক থাকে। জাষ্ক নিতান্ত বুদ্ধিহীন নন। তার বুদ্ধি যদি সত্যই কিছু কম থাকে—তবে তা পূরণ করে দেবার মত তিনজন কূটনীতিকও রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন মন্ত্রীত্রয় ইউনাস, ভার্গব আর দুবল। তাঁরা প্রকাশ্য নন—অপ্রকাশ্যেই জাষ্ককে পরিচালিত করছেন। বুদ্ধি জোগাচ্ছেন। তাদের বুদ্ধি অনুসারে দশজন বল্ব দেশীয় ঘাতক কুবা নদীর পথ অবলম্বন করেছিল। নিপুণ হত্যাকারীদের পক্ষে নদী ঘাটের অসতর্ক পাঁচজন প্রহরীকে হত্যা করে উদ্যানের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে উদ্যানের প্রহরী ছাউনির কাছে পৌঁছে যাওয়ার খুব একটা অসুবিধা ঘটলনা। ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছে তারা অপেক্ষা করে রইল কখন রাজপ্রাসাদের পেটা ঘড়িতে প্রথম প্রহর ঘোষিত হবে।

কার্যালয়ে একাই বসেছিল ভট্টরাই। তার মনের মধ্যে বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ, গুণবর্ধন, নীলাকার আর মহামিশ্রের সব পরিকল্পনাই সে জেনেছে। তাই সে অলসভাবে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। সকালে সম্রাটের সঙ্গে অলিন্দে দেখা কমলিকার সেই মূর্তিটি যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল এই অলসতার সুযোগে। আয়ত চোখ—তীক্ষ্ণ অথচ একটু চাপা নাসা। কুঞ্চিত কেশদাম। মর্মরশুভ্র গাত্র বর্ণ। পীন পয়োধর! রক্তাভ ছোট দু'টি ঠোঁট। ভ্রমরের মতো ক্ষীণ কটি—প্রশস্ত নিতম্বদেশ। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। এই কমলিকাকে সে কখনও দেখেনি! তার চোখে সে সুন্দর ছিল—কিন্তু এত সুন্দর! একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ভট্টরাইয়ের বুক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে জানুকা আর বল্লভীর মুখচ্ছবি—দেহ ভঙ্গিমাও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেমন যেন লালসায় ভরা। কমলিকার শান্তশ্রী তাদের মধ্যে অনুপস্থিত! তারা কেমন যেন অশ্লীল!

না। যদি তাদের মহোৎসবের কথা সত্যও হয়—ভট্টরাই সেখানে অংশ নেবে না। সে খেলার বস্তু হতে পারে না। জানুকা সত্যই যদি তাকে আত্মনিবেদন করত—তাহলে সে তা বিবেচনা করে দেখত কমলিকার সম্রাজ্ঞী হয়ে যাবার পর—কমলিকার সম্মতি নিয়েই। কমলিকা নিশ্চয় বাধা দিত না। কিন্তু কুৎসিৎ যৌনাচারে আসক্তা এক নারীকে সে কখনই জীবনসঙ্গিনী করতে পারে না বা তার খেলার সামগ্রী হতে চায় না। প্রথম প্রহরের ঘণ্টার পর জানুকা তাকে না ডাকা পর্যন্ত এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে বলেছে। অন্যথা হলে—তাদের মহোৎসব নষ্ট হয়ে গেলে সে নাকি ভীষণ প্রতিশোধ নেবে। হঠাৎ ভট্টরাইয়ের মনে হল, এক রাতের ব্যবধানে জানুকা এত শক্তি আহরণ করবে কোথা থেকে? অবশ্য, সে জানে না যে ভট্টরাই এই পদে তার পিতা ইউনাসের কৃপায় বসে নি। স্বয়ং সম্রাট তাকে নিয়োগ করেছেন। হঠাৎ এক শিরশিরানির ভাব ভট্টরাইয়ের মেরুদন্ড বেয়ে নামা শুরু করল। জাষ্ক তো নেহাত মূর্খের মতোই হিউ-পিনানের ষড়যন্ত্রের ভাগিদার হয়ে সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু জানুকা বা বল্লভীরাও কি জাষ্কের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে? তাদের পিতৃগৃহে জাষ্কের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে। গুপ্তচর পরিচারিকারা জানিয়েছে সমাজ-উৎসব কথাটি উচ্চারিত হয়েছে। প্রদীপ! কী করতে চায় জাষ্ক? সম্রাটকে হত্যা? সেই দু'জন সন্দেহজনক শ্রমণের কথা মনে পড়ে গেল। সংখ্যায় তারা দশজন। নীলাকারের লোকজন সেখানে উপস্থিত হবার আগেই তারা সঙ্ঘারাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সবাই ভুলে গেছে তাদের কথা। অন্তত গুণবর্ধন, নীলাকার আর মহামিশ্রের পরিকল্পনায় তাদের নাম নেই। কোথায় গেল তারা? বল্খের পথে? তবে কেন এসেছিল তারা? বৌদ্ধ সম্মেলন? হঠাৎই যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল ভট্টরাই।

রাজপ্রাসাদের পেটা ঘড়িতে প্রথম প্রহর ঘোষিত হল। বসে বসে সেই শব্দ শুনল ভট্টরাই। সে কি বসে বসে জানুকার যৌনচারের ডাকের অপেক্ষা করবে? সুন্দরী, ধনী, ক্ষমতাশালী পিতার কন্যাদের যৌনসুখ দিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করবে? এ সুযোগ কারই বা হয়? অতএব...!—না। প্রবল বেগে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভট্টরাই। প্রাসাদ উৎসবের প্রভাবে আচ্ছন্ন। শত্রুপক্ষ বার বার এই দিনের কথা উচ্চারণ করেছে। ভট্টরাইয়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় বলল, ঘাতকেরা যদি আসে উদ্যান পথেই আসবে। সামনে দিয়ে প্রবেশের সুযোগ নেই।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভট্টরাই কার্যালয় থেকে বেরিয়ে উদ্যানের দিকে গেল। ওখানকার রক্ষীদের আজ বিশেষ সতর্কভাবে থাকতে হবে।

উদ্যানের ছোট দ্বারটি ঠেলে সন্তর্পণে পা রাখল ভট্টরাই। কোষ থেকে

অসি বার করে সে হাতের মুঠোয় নিল। ছায়া ছায়া অন্ধকার। ঝিল্লির শব্দ! এর মধ্যে যদি ঘাতকেরা লুকিয়ে থাকে! প্রহরীরা কী করছে? তাদের ছাউনি অন্ধকার। কোন আলো নেই—কেন? তারা গেল কোথায়? নাকি মদ্যের প্রভাবে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে? ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ভট্টরাই। একবার দেখা প্রয়োজন। এত করে সাবধান করে দেওয়ার পরেও যদি তারা ঘুমিয়ে পড়ে বা আলো নিভিয়ে বসে থাকে—তা হবে ঘোরতর অন্যায়। কোন ক্ষমা প্রদর্শন না করে তাদের কর্ম থেকে বিদায় দিতেই হবে। পা বাড়াল ভট্টরাই। কিন্তু বাধা পেয়ে চমকে উঠল সে। নিচু হয়ে দেখল এক রক্ষীর মৃতদেহ। কে হত্যা করল? সেই ঘাতকের। কি ঢুকে পড়েছে! ভট্টরাইয়ের শরীরে দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল। উদ্যানের গাছে গাছে যেন কিসের ফিস-ফিসানি। রহস্যময়! ভয়াল! অদূরে এক অস্পষ্ট খস-খসানির শব্দে ভট্টরাইয়ের দৃষ্টি প্রাসাদের বাতায়ন গুলির দিকে গেল। একটি বাতায়নে প্রদীপের কম্পিত শিখার আন্দোলন। মুহূর্তের জন্য দেখা গিয়ে নিভে গেল। কেই ঐ রমণী—জানুকা? সে দেখতে পেল—বাতায়ন থেকে নিচ পর্যন্ত একটি রজ্জু ঝুলছে। কালো কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢাকা দুটি লোক সেই দড়ি ধরে ওঠবার চেষ্টা করছে।—এরাই প্রথম—নাকি আরও কেউ উঠেছে? কতজন এরা? চকিতে ভট্টরাইয়ের মনে হল, ওপরে সম্রাট রয়েছেন। কমলিকা রয়েছে।—না। কারোকে ডাকার সময় এখন নেই। এখনই তাকে ওপরে ছুটতে হবে। ঘাতকেরা হত্যা লীলা শুরু করে দিয়েছে কি-না কে জানে? ঊর্ধশ্বাসে ভট্টরাই সোপান বেয়ে উঠে সোপানের মাথায় গিয়ে শ্বাস নিল। প্রশস্ত এবং দীর্ঘ অলিন্দ পথের শুরু। আলোয় উজ্জ্বল। শেষ মাথায় সম্রাটের কক্ষ। রক্ষিণীরা বদ্ধ কপাটের দিকে মুখ করে গল্পে মত্ত। একটু নিশ্চিত হল ভট্টরাই। ঘাতকেরা এখনও সম্রাট পর্যন্ত এগোয়নি। কিন্তু কার ঘরে তারা ঢুকেছে? নিশ্চয় জানুকা! কমলিকার ঘর কোনটি? তার জানা উচিত ছিল। আজ কারোর মৃত্যুর সম্ভবনা না থাকলে অন্তত দুজনের সম্ভাবনা আছে। এক কমলিকা, দুই সম্রাটের। জানুকার কথাগুলির অর্থ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন। তাকে নিচে কার্যালয় বসিয়ে রেখে হত্যাগুলি নিরুপদ্রপে ঘটানো হত। দেরি করলে জানুকা বা বল্লভীই কমলিকার ঘর দেখিয়ে দেবে। সম্রাটের ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে ঘাতকদের এখনও কিছু দেরি আছে। ওখানে ছ-জন রক্ষিণীও পাহারায় রয়েছে। ততক্ষণে কমলিকাকে উদ্ধার করে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাকে কোথায় পাবে? কোন ঘরে?

অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ভট্টরাই অলিন্দের বাঁ দিকের এক কপাটে ধাক্কা দিল। নিদ্রাজড়িত আলুথালু বেশে এক প্রাসাদ-রমণী কপাট খুলেই ভট্টরাইকে দেখে লজ্জা পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কপাট বন্ধ করার চেষ্টা করতেই ভট্টরাই তাকে বাধা দিয়ে বলল, দেবী! কমলিকার ঘর কোনটি?

দুটো ঘর পরে। কিন্তু আপনি...? এভাবে...?

শত ধাক্কাধাক্কিতেও মহামিশ্রের কণ্ঠস্বর ছাড়া এ কপাট আর খুলবেন না।

চকিতে ভট্টরাই দুটি ঘরের পরের ঘরটির কপাটে আবার ধাক্কা দিল। কমলিকার উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সে সঙ্গে সঙ্গে শয্যা থেকে উঠে এসে কপাট খুলে অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার ভট্ট—তলোয়ার হাতে তুমি!

ঠিক সেই মুহূর্তে বিপরীতে জানুকার ঘরের কপাট খোলার শব্দ হতেই ভট্টরাই কমলিকাকে হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। অসাবধানতা-বশত তার বাম হাত কমলিকার বক্ষ স্পর্শ করল। কমলিকা পড়ে যাচ্ছিল। বাঁ হাতেই ভট্টরাই তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে—পা দিয়ে ঠেলে সাবধানে কপাট বন্ধ করে দিল।

ভট্টরাইয়ের যুগপৎ স্পর্শে এক সহজাত রোমাঞ্চে মুহূর্তের জন্য কমলিকার শরীরের রক্ত প্রবাহ দ্রুত হয়ে উঠেই থেমে গেল। সে ভট্টরাইয়ের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে চাপা স্বরে চিৎকার করে উঠল, একি দুর্বিনীত ব্যবহার! সম্রাট শুনলে...!

ভট্টরাই কমলিকার কথায় কান না দিয়ে তাকে ছেড়ে দিযে কপাটটি সামান্য ফাঁক করল। দেখল দুজন কালো পোষাক পরা আততায়ী জানুকার পাশের ঘরের কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে। জানুকার ঘরের কপাট সামান্য ফাঁক। সেখানে চিৎকার-চেঁচামেচি একটু পরেই আর্তনাদ ভেসে এল! জানুকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দুবল বা আমার বাবা মন্ত্রী ইউনাস শুনলে তোমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে!

জড়িত একাধিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ওদের বলার জন্য তোমরা বেঁচে থাকলে তো!

ভট্টরাই বুঝতে পারল, সেখানে একাধিক ঘাতক ঢুকেছে এবং একাধিক প্রাসাদ-রমণীও রয়েছে। ঘাতকরা আগে ধর্ষণ করবে, তারপর অন্য কাজে হাত দেবে। আশ্চর্যের বিষয় ঘাতক দুটির ধাক্কাধাক্কিতেও দূরের রক্ষিণীদের কোনও ভাবান্তর ঘটছে না। তারা তখনও গল্প-গুজবে মত্ত। হয়ত রসসিক্ত কিছু আলোচনা হচ্ছে! ভট্টরাই ঘাতকদের এই অসাবধানতার সুযোগ নিতে চাইল। পরক্ষণেই সে কমলিকারে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল। চাপা স্বরে ভট্টরাই বলল, তুমি পালাও। নিচে গিয়ে যেকোন ভাবে রক্ষীদের সংবাদ দাও। সম্রাট আক্রান্ত!

এ কী বলছ, ভট্ট!

যাও। দেরি কোর না।

তোমায় একা ছেড়ে আমি যাব না।

ছিঃ! বুঝতে পারছ না, সম্রাটের প্রাণ সংশয়। ঘাতকরা কতজন আমি

জানি না। বাইরের ঐ দুজন আমাদের দিকে আসছে। বাকিরা বোধহয় জানুকার ঘরে ধর্ষণে মত্ত। তারাও বেরিয়ে আসবে। তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। যাও।

কমলিকা যাবার সুযোগ পেল না। অলিন্দের একটি থামে সে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তার সামনে তলোয়ার হাতে ভট্টরাই। ভট্টরাইয়ের পিঠ কমলিকার পীনোদ্ধত বক্ষদেশ যেন পিষে রেখেছে। ভয়—ভীতি আর অদ্ভুত রোমাঞ্চে যেন ভাসছিল কমলিকা। ভট্টরাইয়ের এই স্পর্শ কি সে কখনও কামনা করেনি? ভেতর ভেতর গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল কমলিকা।

ঘাতকদুটির একজন বলল, এই তো আর একটা! আয়, আগে এটাকে ভোগ করি। ঘাতক দুজন ভুল করল। তারা হয়ত ভাগ দেবার ভয়ে জানুকার ঘরে উপস্থিত সাথীদের ডাকল না। আরও একটি ভুল, তারা তরুণ ভট্টরাইকে চিনত না। তারা আঘাত হানার আগেই বিদ্যুতের মতো ঝলসিয়ে উঠল ভট্টরাইয়ের তরবারি। কোনও কিছু বোঝবার আগেই ঘাতক দুজন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চাপা স্বরে ভট্টরাই আবার বলে উঠল, কমলিকা যাও। এখুনি। আমার একটি কর্তব্য ছিল তোমায় বাঁচানো। এবার সম্রাটকে বাঁচাতে হবে। তাতে আমার জীবন যায়—যাবে।

কমলিকা যেন মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ এক নতুন চোখে সে দেখছিল ভট্টরাইকে। প্রকৃতপক্ষে বীর ভট্টরাইকে সে এই প্রথম আবিষ্কার করল। এতকাল সে এক সুসভ্য-সুবিনয়ী ভট্টরাই নামে এক সামান্য সেনাকে দেখে এসেছে। আজ দেখল এক কর্তব্যনিষ্ঠ বীরকে।—কিন্তু তোমাকে একলা রেখে...!

যাও! এবার ভট্টরাই কমলিকাকে সোপানের দিকে ঠেলে দিল।

জানুকার ঘরে থাকা কোন ঘাতকের সম্ভবত কিছু সন্দেহ হয়েছিল। সে কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই ভট্টরাইকে দেখেতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভট্টরাই সম্রাটের ঘরের দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতেই সে চিৎকার করে রক্ষিণীদের বলতে থাকল, সম্রাটের কক্ষে ঢুকে পড়। এখুনি!

রক্ষিণীরা মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হলেও পেছনে ছুটে আসা আটজন ঘাতককে দেখে তারা বুঝে নিতে পারল—সম্রাট আক্রান্ত হতে চলেছেন। ভট্টরাই কক্ষের ভেতরে পা রেখেই চিৎকার করে উঠল, কপাট বন্ধ কর। দু-পাশে সার বদ্ধ হয়ে দাঁড়াও।

সত্যার আজ রাত-কর্তব্য ছিল। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কোন রকমে বলল, ভট্টরাই...এ কী ব্যবহার? কী চাও তুমি?

ভট্টরাই বলল, দেবী আপনি সম্রাটের শয্যার অপর পারে গিয়ে আত্মগোপন

করুন। ভয়ানক কিছু ঘটতে চলেছে।

সম্রাট কণিষ্ক ঘুমোচ্ছিলেন। চিৎকার চেঁচামেচিতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনিও প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে গর্জন করলেন, এ কী ধৃষ্টতা, ভট্টরাই! সম্রাটের শয়নকক্ষে অস্ত্র হাতে এইভাবে প্রবেশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তোমায় মৃত্যুদণ্ড দোব। বেরিয়ে যাও।

ভট্টরাই সম্রাটের কথা গ্রাহ্য না করে ইশারায় তাঁকে চুপ করতে বলে কপাটের দিকে কান পাতল। কপাটের গায়ে ততক্ষণে ধাক্কা দেওয়া শুরু হয়ে গেছে—তা ক্রমে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

সম্রাট আপনি আক্রান্ত। ঘাতকের দল কপাট ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। আপনি বিচলিত হবেন না। আপনার হৃৎপিন্ড দুর্বল। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, ভট্টরাই জীবিত থাকতে কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

সম্রাট হতবাক হয়ে শয্যায় বসে রইলেন।

কপাটেরও পর চাপ ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। কপাটের দুপাশে তিনজন করে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষিণীদের ভট্টরাই আদেশ দিল, তোমরা তোমাদের বল্লম প্রস্তুত রাখ। কপাট ভেঙ্গে যে মুহূর্তে তারা প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের অস্ত্র চালনা কররে। কথা শেষ করে ভট্টরাই কপাট থেকে একটু পিছু হটে তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত রইল।—আমার অনুমান, ওরা আটজন হবে। দুটোকে আমি অলিন্দে হত্যা করে এসেছি।

সত্যই কপাট এক সময় ভেঙ্গে পড়ল। হুড়মুড় করে আটজন ঘাতক ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে চারজন বল্লম বিদ্ধ হল। এরপর কক্ষের মধ্যে সম্রাট আর সত্যার সামনে দুরন্ত এক লড়াই শুরু হয়ে গেল। ভট্টরাইয়ের কোন দিকে তাকাবার ফুরসুৎ ছিল না। দুরন্ত গতিতে সে যেন সারা ঘর কর্ষণ করে ফেলছিল। দেখতে দেখতে চারজন ঘাতকের মধ্যে দুজন তার তলোয়ারের আঘাতে ভূমি শয্যা নিল। বল্লমের আঘাতে আহত চারজন ঘাতকের মধ্যে দুজন রক্ষিণীদের ওপর প্রত্যাঘাত হানল, দুজন রক্ষিনী লুটিয়ে পড়ল। ঘরের ভেতর স্বল্প পরিসরে তাদের বল্লম চালনায় অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু আহত ঘাতকদের মধ্যে কেউই বাঁচল না। ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ঘুরে বেড়ানো ভট্টরাইয়ের তলোয়ার আর রক্ষিণীদের বল্লম তাদের নিহত করল।

দুজন ঘাতক এখনও সুস্থ এবং তারা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। ঘাতকেরা নি:সন্দেহে অসিদক্ষ। রক্ষিণীদের অসুবিধা হচ্ছিল আত্মরক্ষায়। ভট্টরাই তাদের সরে যেতে বলল। তারাও আহত। রক্ত ঝরছে।

দুই ঘাতকের পথ রোধ করে দাঁড়াল ভট্টরাই। ভট্টরাই নিজের মনে স্বীকার

করতে বাধ্য হল যে এরা অতীব দক্ষ যোদ্ধা! সুতরাং খুব সতর্কতার সঙ্গে এদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। দু'জনেই যুগপৎ আক্রমণ করেছিল ভট্টরাইকে। ভট্টরাই একজনকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল প্রবেশ পথের দিকে। অন্যজন সরে সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ সত্যা চিৎকার করে উঠল, ভট্টরাই। সম্রাট...!

মুহূর্তের জন্য ভট্টরাই পিছু ফিরে দেখল, অপর ঘাতকটি ছুটে যাচ্ছে অরক্ষিত সম্রাটের দিকে। সকলেই আতঙ্কিত হয়ে দেখল ঘাতকটির তলোয়ার প্রায় সম্রাটের ওপর নামতে চলেছে। যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল ভট্টরাই। চিৎকার করে সে তার বাড়িয়ে ধরা তলোয়ারটি নিয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে পাখির মতো উড়ে গেল। ভট্টরাইয়ের তলোয়ার ঘাতকটির পিঠে আমূলে বসে গেল। কিন্তু ভট্টরাই ভারসাম্য রাখতে পারল না। ঘাতকটির সঙ্গে সেও মাটিতে পড়ে গেল। মাথায় কক্ষের শিলাময় কঠিন মেঝের আঘাতে জ্ঞান হারাল। শেষ ঘাতকটি আহত রক্ষিণীদের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে সম্রাটের দিকে এগোবার চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু সেই মুহূর্তে অঙ্গরক্ষকেরা—প্রাসাদ প্রহরীরা, মহামিশ্র ও গুণবর্ধনের সঙ্গে কমলিকা উদভ্রান্তের মতো কক্ষে প্রবেশ করল। অঙ্গরক্ষকেরা শেষ ঘাতকটিকে ঘিরে ফেলল।

কমলিকা যেন তার সব বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল—উত্তেজনায় আর এইসব মৃতদেহ দেখে। মেঝের ওপর পড়ে থাকা ভট্টরাইকে দেখে সে উন্মাদের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ভুলে গেল ঘরভর্তি মানুষের কথা—সম্রাটের কথা, নিজের পদমর্যাদার কথা।—একটু দেরি হয়ে গেল ভট্টরাই! হায়! তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না।

সকলের মনে হল কমলিকার এই আর্তনাদ যেন মর্মভেদী!

জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিল ভট্টরাই। প্রথমে ঝাপসা—তারপর স্পষ্ট ভাবে সে কমলিকাকে তার বুকের ওপর পড়ে ক্রন্দন করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, কমলিকা কি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছে! কমলিকাকে সে সরিয়ে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। অস্ত্রাঘাতে সে সামান্য আহতও হয়েছে। সম্রাটকে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, সম্রাট! এবার আদেশ দিন, জাষ্ককে নিয়ে আসি।

সম্রাটের ভাবান্তর আর কেউ সেভাবে খেয়াল না করলেও মহামিশ্র করেছিলেন। বিষয়টিকে একটু লঘু করার জন্য তিনি বলে উঠলেন, সম্রাট! আজ ভট্টরাই আর কমলিকার যৌথ উদ্যোগেই আমরা ভীষণ এক বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

সম্রাট মনের ভাব গোপন করেই বললেন,—দেখলাম। এরা পুরস্কার যোগ্য!

মহামিশ্র কিন্তু সম্রাটের কণ্ঠের শীতলতার আভাষ পেলেন।

সম্রাট প্রসাঙ্গন্তরে গিয়ে বললেন, অন্য সব সংবাদ কী?

জাষ্ক সংকেত না জানানো পর্যন্ত তারা সম্ভবত পাহাড় থেকে নামবে না। সে এখনও তার কার্যালয়ে এইসব ঘাতকদের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাহলে গুণবর্ধন! তুমি ভট্টরাই আর আমার অঙ্গরক্ষকদের নিয়ে গিয়ে বিষয়টির একটি নিষ্পত্তি কর। জাষ্কের দেওয়া কথা অনুসারে আজই সমাজ-উৎসবের রাত্রি।

গুণবর্ধন বললেন, চিন্তা করবেন না সম্রাট। বিশ্রাম নিন। আমি দেখছি।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মহামিশ্র। বললেন, সত্যা আর কমলিকা, সম্রাটকে নিয়ে অন্য এক কক্ষে যাও। তারপর এক দেহরক্ষীকে বললেন, তুমি আচার্য চরককে একবার ডেকে আন। সম্রাটকে এই মুহূর্তে একবার পরীক্ষা করা দরকার। তিনি সম্রাটকে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করেন নি। আজকের এই উত্তেজনা...

সম্রাট ক্ষীণভাবে বাধা দিলেন, আবার আচার্যকে কেন?

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট বাধা দেবেন না।

সম্রাট উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পাশের ঘরে যাবার জন্য। হঠাৎ বললেন, সত্যা আর কমলিকা বিশ্রাম নিক। সত্যি ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। অন্য কারোকে ডাক। নয়ত পরিচারিকাদের।

মহামিশ্র বললেন, তাই হবে সম্রাট। তবে দেখতে হবে, প্রাসাদ-রমণীদের মধ্যে ক-জন জীবিত বা সুস্থ আছে।

কেন? বিস্মিত হলেন সম্রাট।

ঘাতকেরা তাদের ধর্ষণ এবং হত্যা করেছে। কারণ, এই ষড়যন্ত্রে ইউনাসের কন্যা এবং অন্যান্য ক'জন প্রাসাদ-রমণীও জড়িত। অপ্রত্যক্ষভাবে ভট্টরাইয়ের উপস্থিতি কয়েকজনের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে!

আর্তনাদ করে উঠল সত্যা আর কমলিকা। জানুকার ঘরে হৈ-চৈ এর কথা কমলিকার মনে পড়ল।

সম্রাট যেন কেমন ভেঙ্গে পড়লেন। কমলিকার একবার মনে হল, সে সম্রাটের দেহভার নিজের ওপর নেয়। কিন্তু তার আর সাহস হল না। সম্রাটের কাছ থেকে সে যে এই মুহূর্তে শত যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে তা উপলব্ধি করতে তার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

নিচে নেমে সবাই দেখল যে গুপ্তচর প্রধান নীলাকার মহামিশ্রের কার্যালয়ে বসে কয়েকজন গুপ্তচরের কাছ থেকে তাদের প্রতিবেদন নিচ্ছেন। গুণবর্ধনকে দেখে তিনি বললেন, ওপরের সংবাদ?

শুভ। কিন্তু হতাহত হয়েছে কয়েকজন। দশজন ঘাতকের মধ্যে ভট্টরাই বোধহয় সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য এই বন্দী ঘাতকটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে! একে আপনি প্রহরা দিয়ে সেনা-বন্দীশালায় নিয়ে যান। কাল প্রভাতে এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আর হ্যাঁ, বন্দীশালায় যেন স্থানাভাব না ঘটে। কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষও সেখানে আর রাতেই আশ্রয় নেবেন।

নীলাকার হাসলেন।—বুঝেছি। তারপর কয়েক প্রহরীকে বললেন, বন্দীটিকে সাবধানে নিয়ে যাও। রজ্জুবদ্ধ বন্দীটি চলে গেলে গুণবর্ধন বললেন, আপনার চরদের এখনই কয়েকটি কাজ করতে হবে। তারা ইউনাস, ভার্গব আর দুবলের গৃহে গিয়ে জানাক, সম্রাট নিহত হয়েছেন। জাষ্ক কার্যালয়ে অপেক্ষা করছেন। জাষ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁরা গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেই পথিমধ্যে যেন তাদের বন্দি করা হয়। আর একজন গুপ্তচর যাক জাষ্কের কাছে। তাকেও জানাক, সম্রাট ঘাতকদের হাতে নিহত হয়েছেন।

যদি প্রশ্ন করে ঘাতকরা কোথায়? তারা সংবাদ দিল না কেন? উত্তর হবে, ঘাতক মিউ-সিনান—অর্থাৎ বন্দি ঘাতকটি জানিয়েছে যে তারা এখন আসতে পারবে না। প্রাসাদ-রমণীদের নিয়ে তারা মহোৎসবে ব্যস্ত! যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে তাদের সময় কাটাতে হয়েছে। এখন প্রভাত পর্যন্ত তারা আনন্দ-ফূর্তি করবে।

নীলাকার বললেন, চমৎকার উত্তর। জাষ্ক বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে।

চারজন গূঢ়পুরুষ প্রসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল তাদের অশ্বে।

ভট্টরাই বলল, আমার আর একটা কথা আছে। সামান্য এই অভিযানে সেনাপতির যাবার প্রয়োজন নেই। জাষ্কের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া বাকি আছে। সে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সে ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞীকেও আজ হত্যা করতে চেয়েছিল। সে আমার এক ভিখারি চরকে হত্যা করেছিল।

গুণবর্ধন বললেন, তুমি পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তাকে জীবিত আনতে হবে। মরবার সুযোগ সে যেন না পায়।

আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি। সম্রাটের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে তার প্রকাশ্য বিচার হওয়া প্রয়োজন। তাই হবে। অঙ্গরক্ষকেরা আমার সঙ্গে চলুক। পথিমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা সেনাদের আমি জুটিয়ে নোব!

ভট্টরাই অঙ্গরক্ষকদের নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নীলাকারের চরটি ঘোড়া নিয়ে সোজা কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল।

জাষ্ক ঘাতকদের সাফল্যের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। চরটিকে ঘোড়া থেকে নামতেই কর্কশ ভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন, তুই কে?

চরটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই চিৎকার করে বলে উঠল, সম্রাট জাষ্কের জয় হোক! সম্রাট জাষ্ক দীর্ঘজীবি হোন। কণিষ্ক নিহত হয়েছে!

উপস্থিত সব প্রহরীদের মধ্যে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়তেই গুঞ্জন উঠল। সম্রাট কণিষ্ক নিহত! কে হত্যা করল? কিন্তু জোর গলায় কেউ প্রশ্নটি চর কিংবা জাষ্ককে করতে সাহসী হল না।

জাষ্ক কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলেন, তুই কে? কে পাঠিয়েছে?

আজ্ঞে আমি প্রাসাদেরই লোক। মিউ-সিনান আমাকে পাঠিয়েছে।

জাষ্ক একটু হোঁচট খেলেন। মিউ-সিনানের নাম তো কারোর জানার কথা নয়। তবু তিনি না দমে বললেন, ওরা সব কোথায়?

ওনারা আজ রাতে ফিরবেন না। প্রাসাদ-রমণীদের নিয়ে আজ রাতভোর ওনারা মহোৎসব করবেন। অনেক দিন তারা দেশছাড়া এবং উপবাসী।

জাষ্ক আর সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না। তাঁর প্রশ্নবাণ থামতেই চরটি আবার বলে উঠল, সম্রাট জাষ্ক দীর্ঘজীবি হোন।

প্রহরী দলের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠল, সম্রাট জাষ্ক দীর্ঘজীবি হোন।

জাষ্ক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দাওয়ার ধারে একটি বিশাল ধনু আর তিনটি বড় ধরনের তির রাখা ছিল। তিরগুলোর মাথায় জড়ানো ছিল তৈল নিষিক্ত কার্পাস বস্ত্র। তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, খরতান। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? তিরগুলো ছোঁড়। দেরি হয়ে গেছে।

খরতান নামে একটি বলশালী প্রহরী ছুটে এসে ধনুকটি তুলে নিল। একটি জ্বলন্ত মশাল থেকে তিরগুলি জ্বালিয়ে নিয়ে এক এক করে উত্তর পাহাড় লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। তিরগুলি নগরের উত্তর প্রাচীর পার হতে পারবে না ঠিকই—তবে উত্তর পাহাড়ের আত্মগোপনকারী বল্খ সেনাদের চোখে পড়বে। জ্বলন্ত তিরের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা গেল পাহাড়ের মাথায় সার-সার মশাল জ্বলে উঠছে এবং সেগুলি যেন নিচে নেমে আসছে দ্রুত গতিতে।

জাষ্ক গর্জন করে উঠলেন—প্রহরীরা সার দিয়ে দাঁড়াও। আমাদের সেনারা পাহাড় থেকে ছুটে আসছে। তারা নগরের অধিকার নেবে। আমরা অধিকার করব রাজপ্রাসাদ আর সেনানিবাস। এই মুহূর্ত থেকে আমি সম্রাট! আমার আদেশ যে না পালন করবে তার মৃত্যুদন্ড।

চরটি বলল, জোর দিয়ে বল, সম্রাট জাষ্ক দীর্ঘজীবি হোন!

জাষ্ক চরটির প্রতি প্রসন্ন হলেন। বললেন, কাল রাজসভায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর। তোমার পদোন্নতি ঘটাব।

সম্রাটের প্রতি আমি আজীবন অনুগত থাকব।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যেতে থাকল। উল্লসিত হয়ে উঠল জাষ্ক।—বাহিনী নগরে প্রবেশ করেছে। বলছি না। তোমরা সার বেঁধে দাঁড়াও। সেনাদের মতো সার বেঁধে তৈরি হও। নতুন সম্রাটের আদেশ!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রহরীরা সারবদ্ধ হতে থাকল। সম্রাট নিহত! তাদেরও সেরকম হলে নিহত হবার বাধা কোথায়?

হঠাৎ জাষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। আগত বাহিনী সরাসরি কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার পরিবর্তে দু-ভাগ হয়ে কার্যালয়টিকে ঘিরে ফেলল। কেবল মাত্র মুখে কালো কাপড় চাপা দিয়ে এক অশ্বারোহী ধীর ভাবে প্রাঙ্গণে এসে ঢুকল।

জাষ্ক আতঙ্কিত হয়ে দেখল, এই সেনাটি বল্খের সেনা নয়।—তুই কে? ওরাই বা কারা?

অশ্বারোহীটি চিৎকার করে উঠল, সম্রাট কণিষ্ক দীর্ঘজীবি হোন!

সম্রাট কণিষ্ক তো মৃত! জাষ্ক নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন। প্রহরীরা বিভ্রান্ত হয়ে বলল।

জাষ্ক ঘাতক বাহিনী পাঠিয়েছিল। দশজনের সেই দলের একমাত্র জীবিত মিউ-সিনান বন্দি। যণ্ডরূপী সম্রাট জীবিত!

এবার প্রহরীবাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল।—তুমি কে?

আমি প্রাসাদ প্রতিরক্ষার নতুন অধিকর্তা—মন্ত্রী মহামিশ্রের সহকারী ভট্টরাই। তোমরা এবং তোমাদের প্রভুও আমাকে চিনবেন। আমি নগর-তোরণের সেনা ছিলাম। ভট্টরাই তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিল।

খরতান এগিয়ে এল তলোয়ার হাতে।

শান্তভাবে ভট্টরাই বলল, আত্মসমর্পণ কর, জাষ্ক।

জাষ্ক আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, হত্যা কর, খরতান।

ভট্টরাই বলল, বাইরে আমার বাহিনী অপেক্ষা করছে। তোমার কার্যালয় ঘিরে ফেলেছে।

তার আগে তুই তো মর। খরতান, হত্যা কর।

খরতান এগিয়ে আসতেই ঘোড়া নিয়ে ঘুরল ভট্টরাই। তার চকিত আঘাতে খরতানের মুণ্ডু ছিটকে পড়ল মাটিতে।

সারবদ্ধ প্রহরীদের মধ্যে সভয় গুঞ্জন। এই খরতানকে দিয়ে জাষ্ক তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছেন। বেশির ভাগ প্রহরীরাই খুশি। তারা চেঁচিয়ে উঠল, সম্রাট কণিষ্ক দীর্ঘজীবি হোন! জাষ্ক নিপাত যাক।

জাষ্ক বুঝতে পারলেন, তাঁর বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটে গেছে। তিনি পিছু হটে পালাবার পথ খুঁজলেন। কিন্তু ভট্টরাই তাঁর পথরোধ করে তার খোলা তলোয়ার জাষ্কের বুকে ঠেকাল।—পালাবার পথ সব বন্ধ!

আমায় হত্যা কর।

না। সম্রাট কণিষ্ক এভাবে হত্যা করেন না। তিনি বিচার করে সর্বসমক্ষে মৃত্যুদন্ড দেন। তোকে বিচার সভায় তোলা হবে। নানান অভিযোগ ছাড়াও তোর বিরুদ্ধে সম্রাটকে হত্যা করার চেষ্টা এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ রয়েছে। এই শত শত প্রহরীরা সাক্ষ্য দেবে।

জাষ্ক যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, বেশ। চল। আমায় কোথায় নিয়ে যাবি? কুই-সাং গোষ্ঠী এর প্রতিশোধ নেবে তোর ওপর।

ভট্টরাই হাসল।—আপাতত তোর ঘরে চল। ভাবী সম্রাজ্ঞীর রত্নগুলি তো উদ্ধার করি।

না। ঐ রত্ন আমি দোব না।

ভট্টরাই তলোয়ার দিয়ে জাষ্কের বুকে চাপ দিল।—চল!

শেষপর্যন্ত ভট্টরাই রত্নপূর্ণ থলিটি উদ্ধার করে জাষ্ককে নিয়ে বাইরে এল। থলিকাটি সে উঁচু করে তুলে ধরে সবাইকে দেখিয়ে বলল, এরই মধ্যে রয়েছে ভাবী সম্রাজ্ঞীর লুঠ হওয়া রত্ন! এই রত্নের জন্য জাষ্ক হত্যা করেছে তিনজনকে। আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এই রত্ন হস্তগত করার পর থেকেই তার সম্রাট হবার সখ হয়। সম্রাট হওয়া অত সহজ নয়। তার জন্য শক্তি ছাড়াও প্রয়োজন প্রখর বুদ্ধি। ক্রূরতার সঙ্গে চাই ঔদার্য! ক্রূরতা ছাড়া তোর কোন গুণটি আছে, জাষ্ক? এরপর ভট্টরাই প্রহরীদের আদেশ করল, একে নিয়ে চল কারাগারে।

প্রহরীরা জাষ্ককে বাঁধার ব্যাপারে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জাষ্ক তখনও গর্জন করে যচ্ছে।—আমার সেনারা পাহাড় থেকে নামছে। রাজধানীর অধিকার নিয়ে নেবে সামান্য পরে। তখন দেখব, এদের—তোদের কটার মুণ্ডু ঘাড়ে থাকে!

আবার ভট্টরাই তীব্রভাবে হেসে উঠল, উত্তর পাহাড়ের তোর কত সেনা ছিল, জাষ্ক? দু-হাজার, পাঁচ-হাজার? তাদের ঘিরে ফেলেছে কত সেনা জানিস—তিরিশ হাজার। একটু পরেই দেখতে পাবি, ঐ বস্ত্র সেনার কতজনের ঘাড়ে মুণ্ডু থাকে। তোর সামনেই সেগুলি কাটা হবে খরতানের মতো। শেষে তোরটাও। একটু থেমে ভট্টরাই বলল, অনেক হয়েছে। এবার চল। আমার ঘুম পাচ্ছে!

পরদিন প্রভাতে পুরুষপুরের জনসাধারণ উত্তাল হয়ে উঠে রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে এল সম্রাটকে দেখবার জন্য। জাষ্ক এবং তাঁর সহযোগী ইউনাস, ভার্গব, দুবল আর হিউ-পিনানের রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার এবং সম্রাটকে হত্যা করার প্রচেষ্টার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে—সত্যই সম্রাট জীবিত তো?

সম্রাটের নিজেকে ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত লাগছিল। তিনি শুয়েছিলেন। চরক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আবার ঔষধী দিয়ে গেছেন। সম্রাট আজ প্রাসাদ-রমণীদের সেবা নিতে কৌশলে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, ওদের মানসিক অবস্থা ভাল নেই। চার-চারজন সঙ্গী ধর্ষিতা এবং নিহত হয়েছে—জানুকা, বল্লভী, পদ্মা আর সুগতা! ওদের আজ ডেকো না, মহামিশ্র।

মহামিশ্রের পক্ষে প্রকৃত কারণটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। তিনি লক্ষ করেছেন যে গতরাত থেকেই সম্রাট প্রাদাদ রমণীদের সম্পর্কে শীতলতা প্রকাশ করেছেন। এর একটিমাত্র কারণ, কমলিকার বুদ্ধিহীন আচরণ! মহামিশ্র জানেন না, কমলিকার ভবিষ্যৎ কী? সম্রাজ্ঞী হওয়া তো দূরের কথা—তার প্রাণদন্ড না হয়ে যায়!

সম্রাটের নতুন কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহামিশ্র। সম্রাট বললেন, আমি আমার পূর্বতন কক্ষে আর ফিরে যেতে চাই না, মহামিশ্র। এই কক্ষটিও যথেষ্ট সুন্দর—তবে একটু ছোট। তা হোক। আমি এখানেই থাকব।

ও কক্ষে কেন নয়—জানতে পারি কি সম্রাট?

ওখানকার মৃতদেহগুলি—রক্তের দাগ আমাকে ঘুমোতে দেবে না, মহামিশ্র।

এবারও মহামিশ্র যা বোঝার তা বুঝে নিলেন। রণক্ষেত্রে সম্রাট নিজের হাতে কত শত মানুষকে হত্যা করেছেন—নররক্তে স্নান করেছেন! তাই সম্রাটের ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে সম্রাট ভট্টরাইয়ের অচেতন দেহের ওপর কমলিকার সেই বিলাপ ভুলতে পারছেন না। সম্রাটের হিমশীতল সেই দৃষ্টি এখনও তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে!

প্রসঙ্গান্তরে গেলেন সম্রাট।—অন্য সব সংবাদ কী?

সোরোডান বন্দী হিউ-পিনানকে নিয়ে পুরুষপুরের পথে বেরিয়ে পড়েছে। উত্তর পাহাড়ে বল্খ দেশীয় প্রায় হাজার দুয়েক সেনা নিহত হয়েছে। পুরুষপুরের আংশিক সেনা, সৌরাষ্ট্র আর নিম্নসিন্ধুর সামরিক ঘাঁটির সেনাদের মিলিত আক্রমণে পহ্লব বিদ্রোহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। পহ্লব ক্ষত্রপকেও বন্দী করে পুরুষপুরে আনা হচ্ছে। নগরে জাষ্ক ও তাঁর সহযোগী তিন মন্ত্রী ইউনাস, ভার্গব আর দুবলও সৈন্য-কারাগারে রয়েছে।

নগর পরিচালক পদ তো শূন্য রাখা যায় না, মহামিশ্র।

জানি। তবে বর্তমানে নগর কার্যালয়ের ভার দেওয়া হয়েছে উপসেনাপতি সোনাপতকে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার জায়গায় বসিয়ে সোনাপতকে বাহিনীতে ফিরিয়ে আনা হবে। আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন।

সম্রাট চেষ্টা করেও তাঁর দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারলেন না, আর সুস্থ! কবে যে আচার্যের হাত থেকে মুক্তি পাব!

বাইরের জনতার কোলাহলের শব্দ সম্রাটের কক্ষ পর্যন্ত প্লাবিত করছিল। মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আপনার একবার দর্শন দেওয়া উচিত। আপনি যে জীবিত তা জানানোর বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ শত্রুরা হয়ত মিথ্যা প্রচার করে অনর্থ বাধাবে। জাষ্ক বা ইউনাসেরা হীনবল হয়ে গেছে তা ভাববার কোন কারণ নেই।

সম্রাট বললেন, তুমি সব সময়েই উচিত পরামর্শ দাও, মহামিশ্র। চল, তোমার পরামর্শ আজও আমি অগ্রাহ্য করব না।

মহামিশ্র বুঝলেন, সম্রাট তাকে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করলেন। কারণ, 'প্রাসাদ-রমণী' পরিকল্পনা মূলত তাঁরই! সেই পরিকল্পনা এমন ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে তিনিই দায়ী! কমলিকা তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে এসেছিল। কমলিকার ওপর ভীষণ রাগ হল মহামিশ্রের। সে নিজে তো ডুবলই। উপরন্তু সম্রাটের চোখে তাঁকেও হেয় প্রতিপন্ন করল! কিন্তু কী ঘটল? ভট্টরাইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল—সেকথা তিনি জানতেন। কমলিকা বা ভট্টরাই এক প্রাসাদে থাকলেও একে অন্যের সঙ্গে যে যোগাযোগ করত—তার কোন প্রমাণ নেই। বরং জানতেন, জানুকা আর বল্লভী মাঝে মধ্যেই ভট্টরাইয়ের সঙ্গে দেখা করছিল। ভট্টরাই বা কমলিকা কেউই কারোর কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেনি। তবে হঠাৎ কী হল? তাঁর মনে হল, মুনি-ঋষিরা সত্য কথাই বলে গেছেন, মেয়েদের মনের তল পাওয়া মুশকিল!

সম্রাট মহামিশ্রের হাত ধরে বাতায়নে এসে দাঁড়ালেন। জীবিত সম্রাটকে দেখে জনতা জয়ধ্বনিতে ভেঙ্গে পড়ল—সম্রাট কণিষ্ক দীর্ঘজীবি হোন! ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুদন্ড চাই।

সম্রাট হাত নেড়ে জনতাকে অভিবাদন জানালেন।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট শারীরিক ভাবে এখনও সুস্থ নন। সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু গতরাত্রের অভিঘাতে তিনি আবার একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য আচার্য চরক বলেছেন যে আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই সম্রাট রাজসভা চালাবার মতো সুস্থ হয়ে উঠবেন। তখন তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করে উপযুক্ত দণ্ড দেবেন। আপনারা এখন শান্ত মনে গৃহে বা কর্মস্থলে ফিরে যান। শত্রুরা এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আপনারা তাদের ওপর লক্ষ্য রাখবেন।

বলুন, জয় সম্রাট কণিষ্কের জয়! সম্রাট কণিষ্ক দীর্ঘজীবি হোন!

জনতা গগন ভেদী স্বরে চিৎকার করে উঠল, জয় সম্রাট কণিষ্কের জয়! সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন!

সম্রাট কক্ষে ফিরে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। তাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছিল।

মহামিশ্র ইচ্ছে করেই প্রশ্ন করলেন, সম্রাট কি অসুস্থ বোধ করছেন?

না, ভাবছি—সামনের এই বিচার আমার মনের ওপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করবে। আশ্চর্য! ছদ্মবেশী শত্রুদের আমি চিনতে পারিনি।

মহামিশ্র বললেন, দীর্ঘ বিচারের প্রয়োজন হবে না, সম্রাট। কয়েকজন রাজসাক্ষী হবে। তাছাড়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের হাতে। প্রয়োজনে, আপনাকে কঠোর হতে হবে। ভগবান বুদ্ধের পূজা করা আর শাসন পরিচালনা করা দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। সম্রাট অশোক রাজ্যে প্রাণী হত্যা বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড রোধ করেননি। সিংহাসনে বসে তিনি হয়ে যেতেন কঠোর প্রশাসক!

কণিষ্ক বললেন, সম্রাট অশোক—অশোকই!

অপরাহ্নে অশ্বঘোষ, বসুমিত্র আর সংঘরক্ষিত এসে দেখা করলেন সম্রাটের সঙ্গে। মহাযান বিচারধারা প্রসারের সম্পর্কে সম্রাটের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। আচার্য চরকও এলেন। সম্রাটকে পরীক্ষা করে ঔষধী দিলেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কাকে বুঝিয়ে দোব এসব ঔষধী? কমলিকা কোথায়?

সম্রাটকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে মহামিশ্র বললেন, আচার্য! প্রাসাদ রমণীরা ক্লান্ত ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তারা চোখের সামনে নরহত্যা দেখেছে। দেখেছে তাদের চারজন সাথীর ক্ষতবিক্ষত ধর্ষিত দেহ! তাঁরা মানসিক ভাবে সুস্থ না হয়ে ওঠা অবধি সম্রাট তাদের সেবার কজে নিযুক্ত করতে চান না।

অশ্বঘোষ বললেন, কিন্তু ভাবী সম্রাজ্ঞীর তো আসা উচিত ছিল।

এবারও মহামিশ্র উত্তর দিলেন, তিনি সবচেয়ে বেশি বিধ্বস্ত। সম্রাট তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন।

অশ্বঘোষ বললেন, ভালই করেছেন, সম্রাট। তবে বিবাহ নিশ্চয় পিছিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলজনক ক্রিয়াকর্ম কেমন করে হতে পারে?

মহামিশ্রই বললেন, যথার্থ কথাই বলেছেন। সম্রাট চান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে! কথা শেষ করে মহামিশ্র সম্রাটের দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখলেন, সম্রাটের চোখে কৃতজ্ঞতা! মহামিশ্র বুঝলেন, তাঁর অনুমান নির্ভুল। কমলিকার আচরণ সমস্ত পরিস্থিতি পরিবর্তিত করে দিয়েছে। এ কী ভুল করল কমলিকা! সম্রাটের মনের কোন তল খুঁজে

পাচ্ছেন না মহামিশ্র। সেইজন্যই তাঁর দুশ্চিন্তা!

সংঘরক্ষিত আর বসুমিত্র এক সময় বললেন, শুনলাম, ভট্টরাই নামে এক তরুণ সেনানীই নাকি সম্রাটের প্রাণ বাঁচিয়েছেন?

সম্রাট এবার বললেন, এ সত্য! অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতির সেই যুবক। এই প্রাসাদ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল সে। সেও নিজে কিছুটা আহত। বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে।

অশ্বঘোষ বললেন, সম্রাট আপনি ভাগ্যবান। মহামিশ্র, গুণবর্ধন, নীলাকায়, ভট্টরাইয়ের মতো মানুষকে আপনি পাশে পেয়েছেন। এরা সম্রাটে নিবেদিত প্রাণ!

মহামিশ্র বললেন, এ আমাদের কর্তব্য!

ঘটনার চারদিন পরেই রাজপ্রাসাদে এক পরিবর্তন ঘটল। সম্রাট বললেন, আর প্রাসাদ-রমণীদের প্রয়োজন নেই। তারা গৃহে ফিরে গিয়ে নিজেদের জীবন বেছে নিক। চারজন ধর্ষিতা এবং মৃত প্রাসাদ-রমণীদের জন্য তিনি ভীষণ দুঃখিত। সম্রাট এই মুহূর্তে বিবাহের কথা চিন্তা করছেন না। তাই, ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞীর পক্ষেও এই প্রাসাদে বাস করা শোভনীয় নয়। তার অন্য আশ্রয় না থাকার জন্য তাকে আচার্য চরকের আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চরক তাকে কন্যাজ্ঞান করেন। ভট্টরাইয়ের মস্তিষ্কের আঘাত গুরুতর। আচার্য চরক তাকে দেখছেন। তাকে দীর্ঘদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হল। ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার সাঙ্গ হলে তিনি এসব বিষয়ে পুনরায় মনোনিবেশ করবেন।

রাজাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মহামিশ্রের স্বভাব নয়। তিনি সমস্ত বিষয়টি এবার পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছিলেন যে সম্রাট কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখলেন। জাষ্ক—হিউ-পিনানদের বিচার পর্ব সমাপ্ত হতেই তিনি ওদের দুজনকে নিয়ে পড়বেন। তাঁকেও এই বিষয়ে জড়িত করলে তিনি অবাক হবেন না।

পঞ্চম দিনে সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ষষ্ঠদিন থেকেই তিনি রাজসভায় যাবেন এবং বিচারপর্ব শুরু করবেন।

আচার্য চরক মৃদু প্রতিবাদ করলেও, সম্রাট তাঁকে কথা দিয়েছেন যে অধিক মানসিক চাপ তিনি নেবেন না। বিচার খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। সাক্ষ্য-সাক্ষী সবই প্রস্তুত। ক্ষুব্ধ চরক বলেছেন, অগত্যা! তবে, সম্রাট স্মরণে রাখবেন, অগণিত প্রজা যেন পিতৃহীন না হয়। আমরা অন্য কোন পিতার কথা চিন্তাও করতে পারছি না।

কণিষ্ক আশ্বস্ত করলেন আচার্যকে।—চিন্তা করবেন না। আপনি তো সকাল সন্ধ্যায় আমাকে দেখে যাবেন। আমাকে এবার রাজধর্ম পালন করতে হবে।

বিলম্বিত বিচার—অবিচারের নামান্তর।

চরক আর বাধা দেননি। সম্রাটের পরিবর্তন তাঁরও চোখে ধরা পড়ছিল। প্রকৃত কারণ তিনি অবশ্য উপলব্ধি করতে পারেননি।

সমাজ-উৎসব রাতের ঘটনা এখন প্রায় মাসাধিক কাল পূর্বের ঘটনা। কমলিকা চরকের আশ্রমে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে। সর্বদাই যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে। এখনও সে তার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে উঠতে পারেনি—কেন সে ঐদিন ভট্টরাইয়ের সঙ্গে অমন আচরণ করল? কী করে সম্রাটের বিশাল অস্তিত্ব চাপা পড়ে গেল ভট্টরাইয়ের ছায়ায়। ভট্টরাই-ই কী তাহলে গোপন পথে তার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মগোপন করেছিল? তার স্পর্শ—তার সেই বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তিই কি তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছিল? তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলেন সম্রাট? কে সত্য—সম্রাট না ভট্টরাই? সম্রাটের প্রতি ভালবাসা—কি নেহাৎ আবেগই ছিল? তার সঙ্গে কি প্রচ্ছন্ন ভাবে জড়িয়ে ছিল সম্রাজ্ঞী হবার লোভ? জানুকাদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় কি আবেগের বৃদ্ধি ঘটেছিল? তার কল্পনার বীরপুরুষ কি সম্রাটের মতো বয়স্ক ছিল—না কি ভট্টরাইয়ের মতো তারুণ্যে ভরা ছিল? কমলিকার আরও মনে হল, মহামিশ্র—আচার্যের স্তুতি তার মধ্যে ইন্ধনের কাজ করেছিল। তাছাড়া এক নারী হিসাবে সম্রাটের ঐ নিঃসঙ্গ জীবন নিশ্চয় তাকে সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। সত্য-মিথ্যার আবর্তে জর্জরিত হয় কমলিকা। আচার্য বলেন, অমন বিমর্ষ হয়ে থেকো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার দেওয়া অর্থে শ্রীবৃদ্ধি পাওয়া আশ্রমের কাজে নিজেকে একটু নিয়োগ কর। শান্তি পাবে। সম্রাট একটু সুস্থির হয়ে বসলেই তোমার জীবনে এই বিরহ যন্ত্রণা অতীত হয়ে যাবে। সম্রাট বিবাহের দিন স্থির করবেন। তুমিও হবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। উজ্জ্বল তোমার ভবিষ্যৎ!

মনে মনে হাসে কমলিকা। এই বৃদ্ধ জানেন না যে তার আর সম্রাটের মধ্যে কী ঘটে গেছে! সম্রাটের শীতল দৃষ্টি সে সেই রাতেই অনুভব করেছে। সম্রাট ভদ্রমানুষ। তাই হয়ত প্রকাশ্যে তাকে অপমান করেননি। তাঁর হৃদয় ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু সে আবার সম্রাটকে 'স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা'র জগতে ফিরিয়ে দিয়েছে। মানবিক বিচারে এ এক ধরনের অমার্জনীয় বিশ্বাসভঙ্গ করা। শাস্তি তার প্রাপ্য। প্রতিহিংসার রক্ত সম্রাটের শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুদ্ধের প্রভাবে। কিন্তু কমলিকা বুদ্ধের চেয়েও প্রভাবশালী হয়ে উঠে এক নিমিষে সম্রাটের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে তৃণাঞ্চলের সেই বর্বর-নৃশংস ইউ-চি রক্তের প্রভাব। কমলিকা বিশ্বাস করে না যে সম্রাট তাকে আর ভট্টরাইকে ক্ষমা

করবেন। তিনি খুব সহজেই ভুলে যাবেন, .তাঁর জীবন রক্ষার পিছনে ভট্টরাই ও তার অবদান কতুটুকু! এই বিশ্বাস তার আরও দৃঢ় হয়েছে, কারণ, তার আর ভট্টরাইয়ের নিরাপত্তার জন্যই নাকি চারজন করে সেনাকে প্রহরায় রাখা হয়েছে দিবারাত্রি। সত্য হচ্ছে, সম্রাট তাকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। কই—ঐ সেনারা কি কমলিকাকে আশ্রমের বাইরে পা রাখতে দেবে? সে বন্দি—বন্দি ভট্টরাইও।

ভট্টরাই সুস্থ হয়ে এলেও এখনও শয্যাশায়ী। শয্যাশায়ী না থেকে তার করণীয়ই বা কি আছে? সম্রাট তার নিরাপত্তার জন্য প্রহরী বসিয়ে রেখেছেন। আচার্যের মুখে সে শুনেছে—আশ্রমেও নাকি প্রহরা রয়েছে। আসলে সম্রাট তাদের বন্দি করে রেখেছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের পর তাদের বিচার করবেন। সে সম্রাজ্ঞীকে ভালবাসে—হ্যাঁ ভালবাসে। সেই তার অপরাধ। সে যে জীবনপণ করে তার প্রেমিকার সঙ্গে সম্রাটেরও জীবনরক্ষা করেছে—এই উপকারের কথা ইউ-চি রক্তে চাপা পড়ে যাবে নিশ্চয়। সেদিন কমলিকার দেহের স্পর্শ—তার বক্ষদেশের নরম স্পর্শ যেন তাকে এখনও জড়িয়ে রেখেছে। আসুক মৃত্যু। তবু সে জেনে যাবে, কমলিকা তাকে ভালবসে। সম্রাটের বৈভবকে নয়—কমলিকা ভালবাসে ভট্টরাই নামে এক সাধারণ সেনাকে। কমলিকা তার প্রেমিকের জন্য অস্বীকার করতে পারে সম্রাটের ভয়াল ভ্রূকুটি। তবু সে অস্বীকার করবে না যে, তার দেহের ওপর সর্বসমক্ষে কমলিকার ক্রন্দনে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ত্বরিৎগতিতে কমলিকাকে সরিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। জাল্কের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা তুলে এক প্রকার পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। নিজের আঘাতের কথা মনে ছিল না। সম্রাট বুদ্ধিমান। সর্বসমক্ষে তিনি উপকারীকে অপমান করেন নি। হয়ত তিনি ভীষণ এক প্রতিশোধ নেবার জন্য সময় নিয়েছেন। না—মৃত্যুকে সে ভয় করে না। সে এক যোদ্ধা। সে তার ভালবাসার-ধনের দেহের স্পর্শ পেয়েছে, তার ভালবাসা কান্না হয়ে তার ওপর ঝরে পড়েছে! আর কি চাই তার? রত্ন? না। তুচ্ছ রত্নগুলো সে ফিরিয়ে দিয়েছে কমলিকাকে। রত্নের চেয়ে মহামূল্য যে ভালবাসা—সেই ভালবাসা তাকে দান করেছে কমলিকা।

শয্যায় পাশ ফিরল ভট্টরাই।

আজ মাসাধিক কালের পর সম্রাট রাজসভায় পা রেখেছেন। পাশে পাশে হেঁটে এসেছেন মহামিশ্র। তাঁর মনে হয়েছে—সম্রাটের ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগের মত সহজ আর নরম নন সম্রাট। গাম্ভীর্য তাকে

ঘিরে রেখেছে। তাঁকেও ভাবনাচিন্তা করে সংযত হয়ে কথা বলতে হচ্ছে।

সম্রাট আজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করবেন। সম্রাট যে প্রলম্বিত বিচারের মধ্যে যাবেন না এ বিষয় মহামিশ্র নিশ্চিত। প্রতিশোধ নেবার হিংস্ররূপের ছায়া তিনি দেখতে পেয়েছেন সম্রাটের মধ্যে। প্রতিক্ষেত্রেই তার মনে হচ্ছে এ বৌদ্ধ কণিষ্ক নয়—অশ্বঘোষের ললিত উপদেশ তাঁকে স্পর্শ করেনি। এক ভয়ঙ্কর রক্ত লোলুপ শ্বাপদ জেগে ওঠার অপেক্ষায়।

রাজসভা আজ পরিপূর্ণ। বাইরেও অজস্র জনতা। সবায়ের জয়ধ্বনির মধ্যে সম্রাট সিংহাসনে বসে হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। সভা শান্ত হলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহামিশ্রকে তিনি সভার কাজ শুরু করার কথা বললেন।—শুরু হোক সভার কাজ।

ছোটখাট কয়েকটি মিমাংসার কাজ বাকি ছিল। সম্রাট তাঁর অভিমত জানিয়ে সে সবের মিমাংসা করে দিয়ে বললেন, ষড়যন্ত্রকারীদের উপস্থিত করা হোক।

সভায় এক সূচিভেদ্য নীরবতা ঘনিয়ে এল। প্রহরীরা এক-এক করে বন্দি হিউ-পিনান, জাষ্ক, ইউনাস, ভার্গব, দুবল, ক্ষত্রপ সাকটনীকে উপস্থিত করাল।

মহামিশ্র বললেন, সমাজ-উৎসবের রাত্রির কথা আপনারা সবাই জানেন। সম্রাটকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করার এক ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের মূল নায়কেরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এদের সকলকেই বন্দি করা হয়েছে। কারাগারে এখন রয়েছে এদের অজস্র আজ্ঞাবাহী কর্মচারি। কেউ লোভে —আবার কেউ ভীত হয়ে এদের আজ্ঞাপালনে বাধ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজসাক্ষীও হয়েছে। ফলে, যেটুকু অস্বচ্ছতা ছিল, এখন তা সব দূর হয়ে দিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি এবার এক এক করে অভিযোগগুলো জানাচ্ছি।

হিউ-পিনান আর জাষ্ক : রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক। সম্রাটকে ঘাতকের সাহায্যে হত্যা করার পরিকল্পনা। হিউ-পিনান কাশগড়-খোটান-ইয়ারকন্দের বদলে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে পুরুষপুরে আসতে চেয়েছিল। পুরুষপুর অধিকার করার জন্য সুকৌশলে সে প্রায় দু-হাজার সেনা পাঠিয়েছিল। ভেবেছিল নগর অরক্ষিত! জাষ্কের বিরুদ্ধে হত্যা, রত্ন-লুণ্ঠন প্রভৃতি একাধিক অভিযোগও রয়েছে। সে নিজেকে পুরুষপুরের সম্রাট বলে প্রচার করছিল।

ইউনাস, ভার্গব ও দুবল : এরা হিউ-পিনান আর জাষ্কের সহযোগী। তারা তাদের বুদ্ধি, প্রভাব এবং অর্থ দিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করেছিল। এরা এত নীচ যে নিজেদের কন্যাদেরও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার করে তুলেছিল। পরিণামে তাদের কন্যারা ধর্ষিতা ও নিহত হয় ঘাতকদের হাতে। সম্রাট তাদের

মৃত্যুর জন্য অতীব লজ্জিত ও দুঃখিত।

তিন মন্ত্রীর আরও একটি অপরাধ তারা মন্ত্রী পরিষদকে বাধ্য করে পুরুষপুর শূন্য করে সমস্ত সেনা ক্ষত্রপ সাকটনীর বিরুদ্ধে পাঠাতে। সেনাপতি গুণবর্ধন আর গুপ্তচর প্রধানের কৌশলে সেই রাত্রে পুরুষপুর এক গণহত্যার হাত থেকে মুক্তি পায়।

ক্ষত্রপ সাকটনী : সে ইউনাস, ভার্গব আর দুবলের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করে। এই ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল যখন ঐ তিন মন্ত্রী নিম্নসিন্ধুর বন্দরগুলিতে শ্রমিক বিদ্রোহ দমন করতে যায়।

সংক্ষিপ্তভাবে মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অভিযোগগুলি হচ্ছে এই রকমই। ষড়যন্ত্রীরা এখন তাদের অপরাধ স্বীকার করতে পারে অথবা নাও পারে কিংবা একে অন্যকে দোষারোপ করতে পারে। কিন্তু তাতে তাদের পাপস্খলন হয় না। তরবারীর আগা চেপে ধরে কাড়াকাড়ি করতে গেলে—হাত কেটে রক্তারক্তি হবে এ কথা সবায়ের জানা। আর এরা কেউ শিশুও নয়।

বন্দিরা সবাই নীরব রইল। হঠাৎ হিউ-পিনান বলল, কণিষ্ক জেনে রেখ সারা সাম্রাজ্যে আমার লোক ছড়িয়ে আছে। তারা তোমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট বলছেন, এ কথা তিনি জানেন। তাই তার আর জাষ্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্রাটকে একটু অপেক্ষা করতে হল।

সম্রাট এবার মহামিশ্রকে বললেন, এবার দণ্ডগুলি পাঠ কর।

মহামিশ্র বললেন, সভাসদগণ আর বন্দিরা—সকলে মনযোগ দিয়ে শুনুন। ইউ-পিনান, জাষ্ক, ইউনাস, ভার্গব আর দুবলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। এই আদেশ কাল প্রভাতেই কার্যকরী করা হবে।

ক্ষত্রপ সাকটনীকে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য লঘু শাস্তি দেওয়া হল। তাকে পদচ্যুত করে পার্থিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হল। শর্ত, সে কখনই আর ভারতে পা রাখার দুঃসাহস করবে না। পার্থিয়ার ক্ষত্রপকেও সেইরকম আদেশ দেওয়া হবে।

জীবিত ঘাতকটিকে দশ বছরের সশ্রম কারাবাস দেওয়া হল। সে খনি অঞ্চলে কাজ করবে।

বল্খের সেনাদের মহাক্ষত্রপ সোরোডানের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিচারের জন্য। সোরোডান যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

নগর প্রহরীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে স্বপদে বহাল রাখা হল। বিনাগ আর জনাগকে মুক্ত করে দেওয়া হল।

হিউ-পিনান গর্জন করে উঠলেন, এ বিচার নয়। অবিচার। সম্রাট বিচার

এবং দণ্ডদান আগেই করে রেখেছেন!

সম্রাট বিরক্তি প্রকাশ করলেন। মহামিশ্র সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বন্দিদের নিয়ে যাও।

সম্রাট কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলেন কিনা তা একমাত্র সম্রাটই বলতে পারেন। তিনিই বলতে পারেন—ওদের দুজনকে নিয়ে তার পরিকল্পনা কী? মহামিশ্রের সাহস হয়নি সম্রাটকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে। কিন্তু কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের প্রসঙ্গ আচম্বিতেই সামনে এসে গেল।

সেদিন প্রভাতে রাজপ্রাসাদের সামনে এক বিশাল শোভাযাত্রা এসে থামল। শোভাযাত্রাকারীদের দাবি সুবিচারক সম্রাটের কলঙ্ক ঘটছে। সম্রাট ভট্টরাই আর বিশ্বাসহন্তা ভাবী সম্রাজ্ঞীর অপরাধের বিচার করছেন না। ভাবী সম্রাজ্ঞী যে আচরণ করেছেন সম্রাট এবং অন্যান্যদের সামনে, তাতে সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের মর্যাদা হানি ঘটেছে। ঐ রমণী বিশ্বাসহন্তা। তার এবং তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে সম্রাটের এখনই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত—ঐ নারীকে বিবাহ করা তো দূরের কথা!

শোভাযাত্রাকারীরা মহামিশ্রের হাতে তাদের দাবিপত্র পেশ করে ফিরে গেছে। সম্রাট সব শুনেও নিঃশ্চুপ।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সারা পুরুষপুরেই শোভাযাত্রা বেরোতে লাগল ভট্টরাই আর কমলিকার বিরুদ্ধে। সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের সম্মানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের বিচার চাই।

সন্দেহ নেই যে পুরুষপুরের আপামর জনসাধারণ এই দাবির স্বপক্ষে মতদান করেছেন।

সম্রাট সেদিন মহামিশ্রকে প্রশ্ন করলেন, ঐ ঘটনার কথা কেমন করে জন সমক্ষে চলে গেল?

মহামিশ্র বললেন, বলা সম্ভব নয়, সম্রাট। সেখানে আমি, আপনি ছাড়াও প্রচুর লোক উপস্থিত ছিল।

সম্রাট চিন্তিতভাবে বললেন, তা বটে। আমারও বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। এর একটি নিষ্পত্তির প্রয়োজন।

মহামিশ্র নীরব রইলেন। কিন্তু পরদিন সকালেই তিনি শুনতে পেলেন যে গতরাত্রেই কমলিকা আর ভট্টরাইকে প্রাসাদ কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে। সংবাদটি শুনে তিনি বিচলিত হলেও অবাক হলেন না। বরং সম্রাট যে দু'টি তরুণ জীবনের দ্রুত মিমাংসা করতে উদ্যোগী হয়েছেন—এতেই তিনি খুশি। কমলিকা যে অপরাধ করেছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের যৌথ প্রচেষ্টাতেই

তো তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছে।—এও তো সত্য। সম্রাট তো নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সম্রাটের তুলনায় তিনি এক সাধারণ মানুষ। বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্রাটকে তিনি কেমন করে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন? মহামিশ্র একবার স্থির করলেন, তিনি কারাগারে ওদের সঙ্গে দেখা করবেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, না। তা উচিত হবে না। হয়ত সম্রাট তাঁর পরীক্ষা নেবার জন্য ওদের প্রাসাদ কারাগারে নিয়ে এসেছেন! তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা তো কমলিকা ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে তুলে দিয়েছে!

যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবেই মহামিশ্র সম্রাটের ঘরে প্রবেশ করলেন।

সম্রাট আজ একটু স্বাভাবিক। বললেন, সোরোডানের বার্তা তো দেখেছ? সে চৈনিক সম্রাটের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে সেনা সাজাচ্ছে। রেশম-পথের অধিকার আবার কুষাণ অধিকারে আনতে হবে। নচেৎ এই সাম্রাজ্যের ধনলক্ষ্মী রুষ্ট হবেন। রোম ও অন্যান্য যবনদেশি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ব্যহত হবে।

মহামিশ্র বললেন, আমি ভাবছি, সম্রাট—একাজ আমাদের আগেই করা উচিত ছিল। হিউ-পিনানের জন্য তা সম্ভব হয়নি অবশ্য।

কিন্তু আরও একটি সংবাদের কথা কী জানো?

কী কথা সম্রাট? মহামিশ্র একটু বিব্রত হয়ে গেলেন।

সোরোডান আমাকে উপস্থিত থাকতে বলেছে।

আপনি যাবেন! অসম্ভব, সম্রাট। আপনার যাওয়া উচিত হবে না।

কেন?

আপনি এখনও যথেষ্ট সুস্থ নন।

সম্রাট হাসলেন, শরীরের অজুহাত আর কতদিন দোব মহামিশ্র? জীবন-মৃত্যু তো আছেই। কিন্তু না গেলে আমার সাম্রাজ্য যদি না থাকে?

থাকবে সম্রাট। আপনার যোগ্য পুত্র রয়েছে। ভবিষ্যতে এই সাম্রাজ্য তো তাকেই দেখতে হবে!

তা হয় না, মহামিশ্র। সোরোডানকে তো তুমি জানই। সে যখন বলেছে আমাকে প্রয়োজন, তখন ভাবনাচিন্তা করেই বলেছে। তুমি বা বাসিষ্ক হলে—তোমাদেরই উপস্থিত হতে বলত।

মহামিশ্র একটু নীরব থাকার পর বললেন, কালই তো যুবরাজ আসছেন।

হ্যাঁ। আমিই তাকে কিছুদিন আগে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। অনেকদিন তাকে দেখিনি! তুমিই তো সে বার্তা পাঠিয়েছিলে!

মনে পড়েছে, সম্রাট! লজ্জিতভাবে মহামিশ্র বললেন।—ভালই হয়েছে। বাসিস্ককে সব বুঝিয়ে দিয়ে যান। আপনি না ফেরা পর্যন্ত সে যেন এই

পুরুষপুরেই অধিষ্ঠান করে। পুরুষপুর শূন্য রাখা উচিত হবে না।

সম্রাট বললেন, আমিও তাই ভাবছি। সাম্রাজ্যের সব তথ্য বাসিষ্কের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে। তুমি রইলে, নীলাকার রইল—আমার চিন্তা কী?

গুণবর্ধনের জায়গায় কে দায়িত্ব পালন করবে?

কেন সোনাপত।

সে তো এখন নগরের দায়িত্বে—জাষ্কের পদে!

আমি চিন্তা করে রেখেছি। দেখ তোমার পছন্দ হয় কিনা। সোনাপত সেনাপতি। বিষ্ক উপসেনাপতি। তার একটা পদোন্নতি হওয়ার প্রয়োজন। তার সাম্প্রতিক অবদান কম নয়।

মহামিশ্র বলতে গেলেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যার অবদান—সেই ভট্টরাইকে রাতের অন্ধকারে আপনি কারাগারে নিয়ে এসেছেন! তার কী অপরাধ? কমলিকার আচরণের জন্য সে কেন দায়ী হবে? কিন্তু ভট্টরাইয়ের কথা মহামিশ্র উচ্চারণ করতে পারলেন না। তিনি পরিবর্তে বললেন, আপনার সিদ্ধান্ত যথাযথ। তবে নগরাধ্যক্ষের পদের জন্য আমাদের আজ থেকেই এক উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করতে হবে। সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য লোক অবশ্যই রয়েছে।

সম্রাট বললেন, ঠিক আছে। খোঁজ কর। এখনও তিন-চারদিন সময় আছে হাতে। তার মধ্যে নিশ্চয় কাউকে পেয়ে যাবে।

তাই হবে, সম্রাট। আজ কি রাজসভায় যাবেন?

নিশ্চয় যাব। যুদ্ধ যাত্রার দিন পর্যন্ত যাব সম্ভব হলে। বাসিষ্কের ওপর কোন পুরোন সমস্যা ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। কী বল?

মহামিশ্র বুঝলেন না, পুরোন সমস্যা বলতে সম্রাট কী বলতে চাইছেন। তবু তিনি সম্রাটকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, নিশ্চয় সম্রাট। পুরানোর জের কেন টানবেন যুবরাজ?

সম্রাট হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, পুরোনো জের বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি, বুঝেছ?

মহামিশ্র বিব্রতভাবে বললেন, না, সম্রাট! রাজস্ব সমস্যাটি কী?

না। আমি যাত্রা করার আগেই কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের বিচার সমাধা করে দণ্ডদান করে যাব।

মহামিশ্র বললেন, সেটাই উচিত হবে, সম্রাট। যুবরাজ তো এই বিষয়ে কিছুই জানেন না।

সম্রাট বললেন, আমি প্রস্তুত হচ্ছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

মহামিশ্র কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মাথায় তখন একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বিচার এবং দন্ড। তিনি একবার ভাবলেন, ওদের হয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন কি না? পরমুহূর্তেই ভাবলেন, তা সম্ভব নয়। কমলিকা অপরাধ করেছে। বিশ্বাসহন্তার কাজ করেছে ঠিকই। তার তো দন্ড পাওয়াই উচিত। সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের মুখ জনসমক্ষে কালিমালিপ্ত করেছে। সম্রাট যদি সুস্থ থাকতেন—হয়ত তখনই তার মুণ্ডচ্ছেদ করলেও অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু ভট্টরাইয়ের দন্ড হলে তিনি প্রতিবাদ জানাবেন—তাতে সম্রাট তাকে যে দন্ড দেবার দেবেন। অন্তত বিবেকের কাছে তিনি মুক্ত থাকবেন।

বাসিষ্ক পুরুষপুরে এসে গেছে। সে সব ঘটনা শুনেছে। ভট্টরাইয়ের কথাও তার কানে গেছে। তাই কারাগারে কমলিকা আর ভট্টরাইকে দেখে সে অবাক হয়েছে। কৌতুহলের বশে মহামিশ্রের সামনেই সে কণিষ্ককে প্রশ্ন করেছে, বাবা! কমলিকাকে না হয় সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের মুখ কলিমালিপ্ত করার অভিযোগে কারাগারে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভট্টরাই?

কণিষ্ক বাসিষ্ককে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, পুত্র এটা আমার বিষয়। পরশু যুদ্ধযাত্রা করার আগে— সম্ভবত আগামী কালই ওদের বিচার করে দণ্ড দান করে যাব। তোমাকে বিব্রত হতে হবে না।

আজই সেই বিচার সভা। আজও রাজসভা পূর্ণ। সভার বাইরেও অগণিত জনতা সম্রাটের বিচার দেখতে উপস্থিত হয়েছেন। কণিষ্ক রাজসভায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সভাগৃহ উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাল। কিন্তু সভার বাইরের জনতার মধ্য থেকে ধ্বনি উঠল : সাম্রাজ্যের মুখ—সম্রাটের মুখ কালিমালিপ্তকারীদের মৃত্যুদন্ড চাই। মৃত্যুদন্ড চাই।

সম্রাট বিরক্ত হলেন। মহামিশ্রকে বললেন, মহামিশ্র! তুমি সভার দায়িত্বে থাকা মুখ্য সেনানীকে আদেশ কর—সে যেন বাইরে গিয়ে জনতাকে কোলাহল বন্ধ করতে বলে। সে যেন বলে, বিচার করবেন সম্রাট। দন্ড ঘোষণা করবেনও সম্রাট। তিনি এই বিশৃঙ্খলা পছন্দ করছেন না। প্রয়োজনে সেনারা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

মহামিশ্রের কথামতো—এক ঝাঁক সেনা মুখ্য সেনানীর নেতৃত্বে বাইরে ছুটে গেল। দেখা গেল অচিরেই সব কোলাহল শান্ত হয়ে গেছে।

সম্রাট আদেশ করলেন, বন্দিদের উপস্থিত করা হোক

রক্ষীরা বন্দিদের উপস্থিত করল। সভায় গুঞ্জন শুরু হল। মহামিশ্র আশা করেছিলেন, ভট্টরাই না হোক—কমলিকা অন্তত নত শিরে আসবে। সম্রাট হয়ত

করুণা পরবশ হবেন। কিন্তু উন্নত শিরে কমলিকাকে প্রবেশ করতে দেখে তিনি প্রমাদ গুণলেন। ভাবলেন, সম্রাট এমনিতেই রুষ্ট হয়ে আছেন। এখন কমলিকার শারীরিক ভাষা তাঁর ক্রোধে ঘৃতাহুতির সঞ্চার করবে।

বন্দিরা একটু দূরত্ব রেখে পাশাপাশি দাঁড়াল। মহামিশ্র লক্ষ্য করলেন, বন্দিরা সুস্থ সবল রয়েছে। অর্থাৎ বন্দীশালায় কোন অত্যাচার চালানো হয়নি। তাই যেন তিনি একটু স্বস্তি পেলেন।

সম্রাট হাত তুলে সবাইকে গুঞ্জন থামাতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সভায় এক অদ্ভুত নীরবতা ঘনিয়ে এল। সম্রাট নিজেই সেই নীরবতা ভাঙলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে বন্দিদের প্রশ্ন করলেন, বল তোমরা দোষী না নির্দোষী?

কমলিকাই উত্তর দিল, নির্দোষী।

মহামিশ্র আবারও শংকিত হয়ে পড়লেন। হাল্কা দন্ডের সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দিল কমলিকা। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, বন্দিনী—ক্ষমা প্রার্থনা কর। সম্রাট হয়ত বিবেচনা করবেন।

দীপ্ত ভঙ্গিতে কমলিকা বলে উঠল, ভন্তে মহামিশ্র। আমি জানি, আপনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের কঠোর দণ্ডের কথা ভেবে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন। কিন্তু জানতে চাই—আমাদের অপরাধ কী? আমরা সম্রাটকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, হত্যা করতে নয়। সম্রাটকে রক্ষা করার জন্য—ষড়যন্ত্রের নায়ককে বন্দী করার জন্য ভট্টরাই তার জীবন পণ করেছিল। আহত হয়েও সে ছুটে গিয়েছিল নগর কার্যালয়ে এবং সফল হয়। এমনকি আমার হৃত রত্নগুলিও উদ্ধার করে। আমি বরং ভট্টরাইকে একলা ফেলে রেখে অঙ্গরক্ষকদের ডাকতে যেতে চাইনি। ভট্টরাই জোর করে আমায় পাঠায়। সেই কর্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষটিকে যদি আমি রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি—তার জন্য সমবেদনা জানানো—দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলা কি আমার পক্ষে অন্যায়? আমি কি মানবতা—কৃতজ্ঞতা বোধহীন একটি প্রাণী? যে মানুষটি দু-দুবার আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও কি অপরাধ? সম্রাটের সঙ্গে আমার মৃত্যু ছিল অবধারিত। ঘাতকেরা জানুকার ঘরে মহোৎসব মত্ত না হলে আমার এবং অন্যান্য প্রাসাদ-রমণীরা কেউ নারকীয় অত্যাচার এবং মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেত না। সম্রাটের সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধও কি নেই?

মহামিশ্র গর্জন করে উঠলেন।—কমলিকা! তুমি কাকে কী বলছ তা কি তোমার খেয়াল আছে? তুমি তোমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছ।

দীপ্তভাবে কমলিকা বলল, যে সম্রাট উপকারীর উপকার ভুলে রাতের অন্ধকারে তাদের বন্দী করেন—কারাগারে পাঠান, সেই সম্রাটের প্রতি আমার

শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। আর মৃত্যু? সম্রাট মৃত্যু ছাড়া আর কী দিতে পারেন? আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

মহামিশ্র সম্রাটের হয়েই বললেন, তোমার সঙ্গে সম্রাটের বাগদান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই রাতেই অজস্র মানুষ আর সম্রাটের চোখের সামনে তোমার আচরণ অতীব নিন্দনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তুমি সম্রাটের সঙ্গে বিশ্বাসহন্তার কাজ করে সম্রাটকে কালিমা লিপ্ত করেছ।

কমলিকাও যেন সমান তেজে গর্জন করে উঠল। সে বলল, আমি এই অভিযোগ অস্বীকার করছি। ঐ পরিস্থিতিতে এক মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের যা করণীয় ছিল—তাই করেছি মাত্র। আর বাগদান? বাগদানই কি সমাজবন্ধন—বিবাহ? বাগদানের পরই কি স্ত্রী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাসের অধিকারী হতে পারে? ক্ষমা করবেন, আমি বলতে চাইছি, ঐ রাত্রে সম্রাট যদি নিহত হতেন. আর আমি জীবিত থাকতাম—তাহলে কি আমি সম্রাজ্ঞী বলে বিবেচিত হতাম? আমাকে কি এক পতিহারার জীবন যাপন করতে হোত? এ সমাজে কি বাগদানের পর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবাহ সম্পাদিত হয়? সম্রাট কি বিবাহের দিন স্থির করেছিলেন? দিন-রাত্রির ব্যবধানে মানুষের জীবনে কত কী ঘটে যেতে পারে—সত্য—মিথ্যা হয়ে যেতে পারে—মিথ্যা—সত্য! বাগদানই যদি বিবাহের একমাত্র শর্ত হোত—তাহলে ধর্মসম্মত ভাবে বিবাহের কী প্রয়োজন?

মহামিশ্রের ক্ষমতা ছিলনা কমলিকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তিনি অসহায়ভাবে সম্রাটের দিকে তাকালেন। সম্রাট নীরব। ভাবলেশহীন। অগত্যা মহামিশ্র আবার বলে উঠলেন, তুমি জানতে, সম্রাট অসুস্থ। ঐ সময়ে তোমার আচরণ সম্রাটের হৃদয়ে কী প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল—তা কি তুমি অনুমান করতে পার?

কমলিকা এবার বিনয়ের সঙ্গে বলল, পারি। সম্রাট যেন আমায় ক্ষমা করেন। সেই সময় আমি আমার মনের অধিকারে ছিলাম। আমার বাস্তবজ্ঞান তখন ছিল না। আমি উপস্থিত কাউকে তখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

মহামিশ্র যেন এবার কমলিকাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেলেন, তুমি সম্রাটকে প্রলোভিত করেছিলে। তাই সম্রাট বারোজন প্রাসাদ-রমণীদের মধ্য থেকে তোমাকেই বেছে নেন। তুমি অর্থ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষায় একাজ করেছ।

না। প্রতিবাদ করে উঠল কমলিকা।—সম্রাট সাক্ষী। তিনি কি আমার মধ্যে কোনদিন কোন অসংবৃত আচরণ লক্ষ করেছেন? সম্রাট আমাকে রাজ্য, বন্দর শুল্কের অংশ—অনেক কিছুই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সব অস্বীকার করে শুধুমাত্র মানুষ কণিষ্ককে চেয়েছিলাম।

আর তুমি সেই সম্রাটের ভালবাসাকে পদদলিত করলে!

ক্ষমা করবেন। আমি আমার নিজের মনকে জানতাম না। চিনতাম না। কে জানে নিজের মনকে—মনের গভীরে যে সত্য চাপা থাকে তার হদিশ ক'জন পায়? আমার কল্পনায় এক বীরমূর্তি ভেসে বেড়াত। ভট্টরাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ সামান্য হলেও তার ঐ সুদর্শন-মার্জিত মূর্তি আমার মনের গভীরে বাসা বেঁধে ফেলেছিল। আমি তা টেরও পাইনি। তাকে বন্ধু বলেই নেবার চেষ্টা করছিলাম। প্রেমিক হিসাবে তাকে নিতে পারিনি, কারণ, আমাদের মধ্যে ছিল সামাজিক বৈসাম্য! ভট্টরাইও নিশ্চয় আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সামান্য দু'দিনের আলাপেই সে আমাকে তা বুঝতে দেয়নি তার পরিশীলিত ব্যবহারে। অন্যদিকে আচার্য চরক এবং মহামিশ্র আমাকে রাজরানি হবার যোগ্য বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। আমি স্বাধীন জীবন শুরু করার জন্য মহামিশ্রের কাছে এক নিরাপত্তাযুক্ত কর্ম প্রার্থনা করেছিলাম। মহামিশ্র মূল্যবোধের মানুষ। তিনি কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা তিনি রাখতে মহাবিহারের উদ্বোধনের দিন সম্রাটের সঙ্গে কৌশলে পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ প্রথম কোন সম্রাট আমার দেখে মৃদু হাসলেন। সভাগৃহেই আমি সম্রাটের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যাই। তাঁর মৃদু হাসিতে মোহিত হয়ে গেলাম। এর পরের ইতিহাস তো আপনারা জানেন। আমি কায়মনোবাক্যে সম্রাটের সেবা করতে শুরু করলাম। আমার চাওয়ার কিছু ছিলনা। ছিল শুধু মাত্র ঐ বীরপুরুষটিকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর সঙ্গে আমি আমার কল্পলোকের বীরপুরুষটির অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলাম। ভট্টরাই সম্রাটের বিশালত্বে চাপা পড়ে গেল। ভেবেছিলাম, সে বুঝি মারা গেছে। কিন্তু যায় নি। তা বুঝতে পারলাম ঐ ভয়ংকর রাত্রে। আমাকে আর সম্রাটকে বাঁচাতে ছুটে এল—ভট্টরাই। প্রথমটায় তাকে ভুল বুঝলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম। ক্ষণিকের জন্য হলেও তার দেহের সঙ্গে আমার দেহের স্পর্শ ঘটল। আশ্চর্য! আমার দৈহিক কম্পনের মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম আমার মনকে। ভট্টরাই মরেনি। আমার মনের গভীরে ঘুমোচ্ছিল। আমার দৈহিক রোমাঞ্চ সেই বোধকে মুহূর্তের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল। সে আমাকে বারবার ঠেলে পাঠাতে চাইছিল। কিন্তু আমি অনড় ছিলাম। মৃত্যুর মুখে তাকে একলা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। তবু সে আমাকে জোর করে ঠেলে পাঠায়। আমি ছুটে যাই অঙ্গরক্ষকদের কাছে। তাদের কেউ সেনাপতিকে সংবাদ দেয়। পরম এক উৎকণ্ঠা নিয়ে সকলের সঙ্গে আমিও সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করি—কিন্তু রক্তাপ্লুত অচেতন ভট্টরাইকে দেখে আমার সমস্ত চৈতন্যের বিলুপ্তি ঘটে। আমি ভেঙে পড়ি। ঈশ্বর সাক্ষী! বুদ্ধ সাক্ষী! আমি সম্রাটের সঙ্গে কোন প্রতারণা করিনি। যেটুকু তাঁর সেবা করেছি—তা হৃদয় দিয়েই করেছি। আমার কাছে তখন সম্রাটই সত্য ছিলেন। ভট্টরাইরূপী প্রবল শক্তিধর সত্য তখনও আত্মপ্রকাশ

করেনি। সত্যকে আমি জানতে পারিনি। এ আমার অপরাধ নয়! একটু থেমে কমলিকা আবার বলল, সম্রাট আমাদের দন্ড দিলে একত্রে মৃত্যুদন্ড দিন। যাতে আমরা অন্তত জানতে পারি, জীবনের পাড়ে না হলেও মৃত্যুর পাড়ে আমরা একত্রে দাঁড়াতে পেরেছি।

কমলিকার আবেগপূর্ণ ভাষণে সদস্যরা—বাইরের জনতাও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নীরব রইল। সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা। সম্রাট এবার কী দন্ড ঘোষণা করেন তা শোনার জন্য।

সম্রাট হঠাৎ উচ্চৈ:স্বরে হেসে উঠলেন সবাইকে বিস্মিত করে। তারপর মুখ্য সেনানীটিকে বললেন অপর দু-জন বন্দীকে নিয়ে এস।

অপর দুজন বন্দী! সম্রাট এই দুই বন্দীর বিচার শেষ না করেই আবার অন্য দু'জন কোন বন্দীদের নিয়ে আসছেন? সভায় গুঞ্জন উঠল।

অচিরেই ভয়ালদর্শন রজ্জুবদ্ধ দুই বন্দীকে উপস্থিত করা হল। অনেকেই তাদের চিনতে পারল, জাষ্কের সহযোগী। নগরের কুখ্যাত ব্যক্তি। এদের সঙ্গে এই দুই বন্দীর কী সম্পর্ক? মহামিশ্রও বিস্মিত হলেন।

সম্রাট এবার দু'জন বন্দীকে প্রশ্ন করলেন।— তোমরা এই দুই বন্দীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে?

বন্দীরা নীরব রইল।

গর্জন করে উঠলেন সম্রাট, উত্তর দাও, হ্যাঁ কি না?

হ্যাঁ, সম্রাট।

কেন?

জাষ্কের মৃত্যুতে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম।

অপরাধ স্বীকার করছ? অনুতপ্ত?

হ্যাঁ, সম্রাট!

ঠিক আছে। তোমাদের তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম। এদের নিয়ে যাও।

খুশি হয়ে বন্দীরা সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে রক্ষীদের সঙ্গে চলে গেল।

সম্রাট এবার হঠাৎই যেন সহজ হয়ে উঠলেন। তার গাম্ভীর্য ঝরে পড়ল। তিনি কমলিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, সম্রাট অকৃতজ্ঞ নয়, মণিকার পুত্রী। নগরের শোভাযাত্রার কোলাহল বন্ধ করতে, অপর দিকে ঘাতকদের হাতে তোমাদের মৃত্যুকে ঠেকাতে আমাকে তোমাদের কারাগারে নিয়ে আসতে হয়। এর থেকে নিরাপদ স্থান আর কোথায়?

মহামিশ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, সম্রাট!

সম্রাট বাধা দিয়ে বললেন, না, মহামিশ্র। বিচার সম্পূর্ণ। তবে এখনও

দন্ড দান বাকি রয়েছে। তার আগে আমি বলি, মণিকার পুত্রী যা বলেছে তা সর্বৈব সত্য। অস্বীকার করব না। প্রথমে আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজের মনকে বোঝার জন্য সময় চাইছিলাম। তাই আমি দু'জনকে নিজের নিজের জায়গায় পাঠিয়ে নিজে চিন্তা করতে আর ওরাও চিন্তা করুক—এই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে জাষ্ক আর ইউনাসের লোকেরা এই দু'জনকে তাদের ব্যর্থতার কারণ বলে চিহ্নিত করে প্রচার অভিযান শুরু করে। প্রচার অভিযানে আমি প্রভাবিত হইনি। কিন্তু প্রভাবিত হলাম যখন নীলাকার জানাল ওদের হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাই ভাবলাম, বিচার তো আমায় করতেই হবে তবে কেন তাদের নিরাপত্তার জন্য কারাগারে এনে রাখব না? মহামিশ্রও আমায় ভুল বুঝেছে। অবশ্য তার কোন দোষ নেই। সে এই পরিকল্পনার কথা জানত না, আমি জানাইনি।

সম্রাট একটু থামলেন। এরপর বললেন, আমি দিনের পর দিন নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এসেছি, এদের দন্ডদান করতেই হবে।

সভায় আবার নীরবতা ঘনাল।

সম্রাট বললেন, আমি পুত্র বাসিষ্ককে নির্দেশ দিচ্ছি সে যেন আগামী পরশুদিনের মধ্যে কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের বিবাহ সম্পাদন করে। না—বাগদান নয়। বিবাহ! মহামিশ্র! তুমি না সোনাপতের পরিবর্ত খুঁজছিলে? পেয়েছ?

হ্যাঁ, সম্রাট!

কে?

ভট্টরাই।

উত্তম! আমি ভট্টরাইকে নগরাধ্যক্ষের পদে বসাব। সোনাপত সেনাপতির পদে বসবে।

মহামিশ্র বললেন, সম্রাট! আমরা আর এক জনের কথা ভুলে যাচ্ছি।

কে সে?

তোরণাধ্যক্ষ বিষ্ক!

সম্রাট বললেন, কেন? আমি বলিনি? উপসেনাপতির পদে কাল থেকেই যোগ দেবে বিষ্ক। সহ-তোরণাধ্যক্ষ হিসাবে যে রয়েছে—তাকে অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ কর। সেনাবাহিনী থেকে অন্য একজনকে পাঠাও তার জায়গায়। হয়েছে?

চমৎকার হয়েছে, সম্রাট!

বিষ্ক—কমলিকা আর ভট্টরাইয়ের বিচার দেখতে চায়নি। তাই আসেনি। এলে অবশ্য সম্রাটের ওপর তার জমে থাকা বিদ্বেষ এখনই সরে যেত।

সম্রাট কণিষ্ক এবার উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় চাইলেন।—আপনাদের অনেকের সঙ্গে কাল প্রভাতে হয়ত দেখা হবে না। কারণ, কালই

আমি যাত্রা করব।

সবাই বলে উঠল, সম্রাট আপনি বিজয়ী হয়ে ফিরবেন।

কমলিকা আর ভট্টরাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক প্রবল লজ্জা তাদের গ্রাস করে রেখেছিল। সম্রাট তাদের অবাক করে দিয়েছেন।

ভট্টরাই বলল, কমলিকা! সকালে আর আমরা সুযোগ পাব না। চল, এখনই ক্ষমা চেয়ে নিই।

কমলিকা আর ভট্টরাই সম্রাটের সামনে এসে নতজানু হয়ে বসল, সম্রাট আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

সম্রাট বললেন, ওঠ। কর্তব্যনিষ্ঠ থেকো। মণিকার পুত্রীকে সুখী কোর। তারুণ্যের জয় হোক। আমি পড়ন্ত বেলার সূর্য! সম্রাটের মুখে মৃদু হাসি।—আসি।

কমলিকা এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার লজ্জা সরিয়ে সে বলল—সম্রাট!

বল, মণিকার পুত্রী।

আপনার না গেলেই কি নয়?

কেন?

আর কেউ না জানুক, আমি আর আচার্য তো জানি আপনার কী অবস্থা! পাহাড় পার করার ধকল, যুদ্ধের চাপ—আপনার সহ্য হবে না!

সম্রাটের হাসিটা যেন অপরাহ্নর বেলায় বিদায়ী সূর্যের মতো বিষণ্ণ বলে মনে হল। তিনি বললেন, তা আর হয় না, মণিকার পুত্রী। যেতে আমাকে হবেই। এই নিয়ে আর প্রশ্ন কোর না। কুষাণ সাম্রাজ্যকে সেবা কোর। সুখী থেকো।

সম্রাট কথা দিন পায়ে হেঁটে পাহাড়, পর্বত পার হবেন না। অশ্ব অচল হলে ডুলি ব্যবহার করবেন!

প্রত্যুত্তরে সম্রাট মৃদু হেসে আর দাঁড়ালেন না। মহামিশ্রের সঙ্গে অঙ্গরক্ষক পরিবৃত হয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কমলিকা সম্রাটের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হল, সম্রাট যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। তার বুক যেন এক অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মন হু হু করে উঠল।—সে কি ভুল করেছে? অন্যায় করেছে? এক মানসিক দ্বন্দ্বে যেন ডুবে গেল কমলিকা। সম্রাটকেও কি সে ভালবেসেছিল? একই সঙ্গে দুজনকে ভালবাসা কি সম্ভব? নিজেকে প্রশ্ন করল সে? কেন নয়? এক পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে—তাহলে এক নারী পারবে না কেন?

ভট্টরাই লক্ষ্য করছিল কমলিকাকে। এক সময়ে সে বলল, সম্রাটের জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে, কমলিকা? তোমার মনকে আমি চিনেছি। আসলে তুমি

সকলের জন্য কষ্ট পাও। প্রাসাদে একটিও প্রাসাদ-রমণী নেই। সম্রাট পরিচারক-পরিচারিকাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের জীবনে এমনটা কি হওয়া উচিত ছিল? তাঁর এক সামান্য অঙ্গুলী হেলনে সুন্দরী রমণীতে ভরে যেতে পারত ঐ প্রাসাদ। কিন্তু বুদ্ধভক্ত সম্রাট জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছেন। জাগতিক ভোগ-বিলাসের কামনা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন এতদিনে। তাই তো এত সহজে তিনি আমাদের ক্ষমা করলেন। আমাদের ভালবাসাকে মর্যাদা দিলেন। হাজার হাজার বছর পরেও সম্রাট কণিষ্কের মতো আর কেউ ফিরে আসবে না! আমি নিশ্চিত!

কমলিকা অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি সত্য কথাই বলেছ, ভট্টরাই।

সম্রাট কণিষ্ক পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের পুরোভাগে সেনাপতি গুণবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে পামির লক্ষ করে এগিয়ে চলেছেন পার্বত্য পথে। চতুর্দিকে পাহাড়-পর্বত —তাদের বরফে আচ্ছাদিত শৃঙ্গ। গভীর জঙ্গল। কোথাও আবার পাহাড় ভেদ করে জঙ্গলকে চিরে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। পাখ-পাখালিদের ডাকে আচ্ছন্ন বনভূমি। ওপরে সুনীল আকাশ। এই পার্বত্য ভূমির মধ্যেই ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে মঠ-চৈত্য-গুম্ফা। প্রভু বুদ্ধের সাধনায় মহাযানপন্থীদের কণ্ঠের সেই ত্রিশরণ মন্ত্রের আবৃত্তি ভেসে আসছে বাতাসে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। সম্রাট একান্ত মনে তা শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছিলেন।

পুরুষপুর থেকে যাত্রা করার সময় সম্রাট কণিষ্ককে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা অবাক হয়েছিলেন—সম্রাট তারুণ্যে টগবগ করছিলেন। এ যেন বৌদ্ধদীক্ষা পূর্বের কণিষ্ক! সেই ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার হাতে! এই শরীরী ভাষা নিয়েই তিনি সেদিন পা রেখেছিলেন পুরুষপুরে। সে অনেক বছর হয়ে গেল। তিনি অনেক ধীর-স্থির হয়ে এসেছিলেন। উচ্চৈ:স্বরে কথা কম বলতেন। এক গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে ফেলেছিলেন। সেদিন সকালে তাঁর সেই স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখেই তিনি উচ্চকণ্ঠে সৈন্যদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সম্রাট যেন এতকাল ঘুমিয়ে ছিলেন। আবার জেগে উঠেছেন। দর্শকেরা তাই কণিষ্ককে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। আশ্চর্য হয়েছিল কমলিকা আর ভট্টরাই। সম্রাট অপরাহ্নের সূর্য ঠিকই। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মধ্যাহ্নের তেজ যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল। এই সম্রাটকে তারা কখনও দেখেনি!

পামির যত এগিয়ে আসছিল সম্রাট যেন ততই স্মৃতির মধ্যে ডুব দিচ্ছিলেন। ভাবেন, এই তো সেই পামির! এই সুউচ্চ পামির অতিক্রম করেই তিনি সেদিন ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। কশ্যপপুরা ইত্যাদি অধিকার করতে করতে এগিয়ে

ছিলেন পূর্ব দিকে, শ্রাবস্তী, বারাণসী, মথুরা জয় করে প্রায় এগিয়ে গিয়েছিলেন পাটলিপুত্রের কাছাকাছি। মথুরায় অবস্থান কালে ধর্মহীন সম্রাট ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন বৌদ্ধধর্মের দিকে। শুনেছিলেন, পাটলিপুত্রে বাস করেন অশ্বঘোষ নামে এক মহাপন্ডিত। এর মধ্যে মারা গেলেন কুষাণ সম্রাট দ্বিতীয় কুজুল কদফিস। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারীও হলেন তিনি। শাসনভার মহাক্ষত্রপ খারপল্লানের এবং ক্ষত্রপ বনস্পরের হাতে দিয়ে তিনি ফিরে চললেন পুরুষপুরে। অনেক অনুনয়-বিনয়—পাটলিপুত্র আক্রমণ করার ভীতি প্রদর্শন করে তিনি শেষপর্যন্ত সহযাত্রী করলেন পন্ডিত অশ্বঘোষকে। বাসিস্ক তখন শিশু। পুরুষপুরকেই তিনি রাজধানী হিসাবে স্থির করে বসবাস করা শুরু করলেন। বল্খের শাসনভার রইল হিউ-পিনানের হাতে। অশ্বঘোষের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে যুগপৎ নিজেকে বুদ্ধের সেবায় নিয়োজিত করলেন। এরই মধ্যে জীবনে ঘটে গেল কত ঘটনা! ষড়যন্ত্র—পত্নীর মৃত্যু—মহাবিহার—মহাস্তুপ নির্মাণ—চতুর্থ বৌদ্ধ সংহতি—প্রাসাদ-রমণী উপাখ্যান—তারপর চৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা!

সম্রাট সুউচ্চ পামির মালভূমির দিকে তাকালেন। ওপরে অবস্থান করছে সোরোডান তার বল্খের বাহিনী নিয়ে। সম্রাট পামির অতিক্রম করে তার সঙ্গে মিলিত হবেন। সম্রাট ভাবলেন, এই সেই পামির! কত বছর পর তিনি আবার পা রাখছেন পামিরের বুকে। সেদিন যখন তিনি পামির অতিক্রম করে ভারতে ঢুকেছিলেন, তখন তাঁর চোখে ছিল জয়ের নেশা। আজ আবার তিনি পামির পার হবেন। কিন্তু আজ তার চোখে প্রতিরক্ষার চিন্তা। সাম্রাজ্য অটুট রাখার চিন্তা। রক্তের মূল্যে একদিন যে সাম্রাজ্য তিনি অধিকার করেছিলেন—বিনা যুদ্ধে তিনি তা হারাতে প্রস্তুত নন। উত্তরাধিকারী হিসাবে বাসিষ্কের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে সবকিছু। পরের দায়িত্ব বাসিষ্কের।

পামিরের পাদদেশে সম্রাটের সঙ্গে সমগ্র বাহিনী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গুণবর্ধন সম্রাটকে ডাকলেন, কিছু চিন্তা করেছেন কি, সম্রাট?

কণিষ্ক বললেন, হ্যাঁ, গুণবর্ধন। একদিন আমি এই পথেই ঢুকে ছিলাম তোমাদের দেশে।

গুণবর্ধন বললেন, সম্রাট! এদেশ তো এখন আপনারও!

হ্যাঁ গুণবর্ধন! এদেশকে আমি ভালবেসে ফেলেছি— তাই বল্খের তা-হিয়ায় আর ফিরে যাইনি। পারস্য সম্রাট বা যবনদের মতো আমি নিজের দেশে থেকে এদেশ শাসন করার চেষ্টা করিনি। এটিই আমার দেশ!

গুণবর্ধন বললেন, সম্রাট! হাজার হাজার বছর পরেও ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে সম্রাট অশোকের পরেই স্মরণ করবে। অন্তত বুদ্ধের ধর্ম যতদিন

জীবিত থাকবে—ততদিন আপনিও থাকবেন!

সম্রাট হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল, কমলিকা কি তাঁকে মনে রাখবে?

গুণবর্ধন আবার সম্রাটের চিন্তাকে বাধা দিলেন।—সম্রাট! আজই কি পামির অতিক্রম করবেন? সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে এখনও দেরি আছে।

তাই কর। যতটা পারি উঠি। প্রভাতে না হয় বাকি পথটুকু পার হওয়া যাবে।

গুণবর্ধন বললেন, সম্রাট! কিছু দূর যাবার পর আমাদের পায়ে হাঁটতে হবে। ঘোড়াগুলিকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি...!

সম্রাট রহস্যময় ভাবে বললেন, এখন তো এগোন যাক! তিনি চিন্তা করলেন, পামির অতিক্রম যদি করতেও পারেন—তারপরেই আসবে রণক্ষেত্র! অস্ত্রের ঝনঝনা—আর্তনাদ—রক্তস্রোত! এরপর...? সম্রাটের মনে পড়ে গেল মণিকার পুত্রীর শেষ আবেদন। পায়ে হেঁটে পাহাড়-পর্বত পার হতে সে নিষেধ করেছে। বলেছে, অশ্ব অচল হলে ডুলি ব্যবহার করতে।

সম্রাট মনে মনে বললেন, তোমার ঐকান্তিকতায় আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি না। জানি, তুমি আমার জন্য উৎকণ্ঠিত। কিন্তু আর কী লাভ কমলিকা? আমার বর্ণহীন হয়ে আসা জীবনে তুমি হঠাৎই রঙের প্রলেপ বুলিয়েছিলে। আমি নতুন করে তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। ভোগ করতে চেয়েছিলাম এই জীবন—এই পৃথিবী। কিন্তু লোভীর মতো চাইতে গিয়ে ভুল করলাম। ভুলে গেলাম অশ্বঘোষেরা অনুমোদন করলেও বুদ্ধ করবেন না। জীবনে নারী-ভোগ আমি কম করিনি। তাই বুদ্ধ হয়ত চাইলেন, আমার ভোগের আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তি ঘটুক। কারণ, আমি এখন বিদায়ী সূর্য। ভট্টরাই উদিত—ভোরের সূর্য! আমার জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে শিঘ্রই। অন্ধকারেও ফুল ফোটে—কিন্তু তা বর্ণহীন। তোমার নবীন যৌবনকে বর্ণহীন করার অধিকার আমার নেই। তুমি বর্ণময় হয়ে ওঠ। তুমি ঠিকই বলেছিলে, হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা সত্যকে কি সবাই জানতে পারে? পারে—যখন সেই সত্য অনুকূল বাতাসে নিজে থেকেই জেগে ওঠে! বুদ্ধ তোমার সহায়। তাই হয়ত অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার আগে তোমার হৃদয়ে সেই সত্য জেগে উঠেছিল। কিন্তু ভট্টরাইয়ের অচেতন দেহের ওপর উপুড় হয়ে তোমার সেই বিলাপ আমার শরীরে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইউ-চিরা তাদের সেই বর্বর জীবনে কখনও তাদের নারীকে অপরের কণ্ঠলগ্না হতে দেখা পছন্দ করে না। আমিও অভ্যাস বশে তরবারির জন্য পাশে হাত বাড়িয়ে ছিলাম। বুদ্ধ বোধহয় সেদিন আমাকে এক পাপ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমার মনের গভীরে কে যেন বলে উঠল, কণিষ্ক! ক্রোধ পরিহার

কর। সত্যকে মেনে নাও। বাস্তবকে মেনে নাও। ধীর-স্থির ভাবে কয়েকদিন ধরে বিষয়টির পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও। হঠাৎই আমার মনের চোখ খুলে গেল। মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা এক সত্যকে আমি জানতে পারলাম তোমার মতোই। দেহজ কামনা নয়। ভালবাসা। তোমাকে আমি ভালবাসি, কমলিকা। পরক্ষণেই আমার মনে হল, তোমার মতো এক রমণীকে এই পৃথিবীর কে না ভালবাসবে? তাই ভট্টরাইও তোমাকে ভালবেসে কিছু অন্যায় করেনি। তোমার জীবনে তার উদয় ঘটেছে আমার আগে। আমি পরে। তাই ভট্টরাইয়ের দাবিই অগ্রগণ্য। এটাই সঠিক বিচার। তুমি সুগন্ধে ভরা এক লাল-গোলাপ। পারস্যের লাল গোলাপ আমি ভালবাসি বলেই সেই গোলাপকে দলে-মুচড়ে দেবার অধিকার কি আমার আছে? হ্যাঁ—বর্বর ইউ-চি কণিষ্কের হয়ত ছিল। বুদ্ধভক্ত কণিষ্কের তা নেই। কমলিকা, আমি এখন ক্রোধমুক্ত, যৌন-হিংসা মুক্ত কণিষ্ক। কিন্তু মুক্ত হতে পারিনি অভিমান থেকে। সেই বুকভরা অভিমান নিয়েই আমি তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করেই পায়ে হেঁটে পামিরে উঠব। ডুলি ব্যবহার করব না। আমার নির্বাণ যদি পামিরের উত্তুঙ্গ ভূমিতেই ঘটে—সেই নির্বাণকে আমি সাদরে বরণ করব। যদি ব্যর্থ হই তবে রয়েছে রণক্ষেত্র। বুদ্ধ সেখানে নিশ্চয় আমাকে কোলে স্থান দেবেন। আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন। একথা কেউ না বুঝলেও—তুমি ছাড়া অন্তত আর দুজন জানে। এক, মহামিশ্র। দুই, আচার্য চরক। তাদের চোখে আমি জল দেখেছি। তারা আমায় আসতে দিতে চাননি।

সম্রাট এগিয়ে চললেন পাথর ডিঙিয়ে সবুজ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। মনে মনে তিনি আবার বললেন, কমলিকা! আর আমাদের দেখা হবে না!

সেদিন এক ভূকম্পন সারা সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিল। তার অভিঘাত পুরুষপুরেও পৌঁছল। সারা সাম্রাজ্যে বিলাপের রোল উঠল : সম্রাট কণিষ্ক আর নেই! পামির অতিক্রম করার সময় তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎই!

গৃহের দাওয়ায় বিষণ্ণ হয়ে বসে ছিল কমলিকা। ভট্টরাই কার্যালয় থেকে উত্তেজিত ভাবে ছুটে এসে বলল, শুনেছ? সম্রাট আর নেই!

কান্নাভরা গলায় কমলিকা বলল, জানি। সম্রাট আত্মহত্যা করেছেন!

❀ ❀ ❀